Pathfinder

মাসুদ রানা

সর্পলতা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

NAEEM



মাসুদ রানা

সর্পলতা

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা ৩৭৫

সর্পলতা

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-7375-4
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭
রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব
বিদেশি ছবি অবলম্বনে
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
মোবাইল: ০১১-৯০-৪৯০০৩০
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail. sebaprok@citechco.net
Website. www.Boi-Mela.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
Masud Rana-375
SHARPOLATA
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

পঞ্চাশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? *বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ *বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা . *প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর *নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যুআলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ *রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি*কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া *টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা*মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা*মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা *সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর *নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা*বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল *শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য*প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেল আবিব*ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী*বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা *রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন*হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ *কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন *সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল।

এক

ইন্দোনেশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগর।

তেলুক সেন্দ্রাওয়াসি উপসাগরের উত্তর প্রান্ত। ইরিয়ান জায়া দ্বীপপুঞ্জের ছোট একটা দ্বীপ; লম্বায় মাত্র বারো কিলোমিটার, চওড়ায় তার অর্ধেকেরও কম। নাম কুরুড্ডু।

পুব দিগন্তে ক্ষীণ লালচে আভা ফুটছে। শুরু হতে যাচ্ছে নতুন একটা দিন।

তিনদিক ঘেরা খুব ছোট একটা খাঁড়ি।

খাঁড়ির কিনারায় নিশ্ছিদ্র রেইনফরেস্ট সবুজ পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচিলের শুধু এক জায়গায় একটা ফাঁক। ওখানে, সাগরের পানিতে, কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সরু জেটিটা।

পুরানো হয়ে যাওয়ায় জেটির অবস্থা এখন নড়বড়ে। তবে গাছপালা কেটে পরিষ্কার রাখা হয়েছে ওটার আশপাশ।

খাঁড়ির কিনারায়, জেটির পাশে, ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছু আদিবাসী লোকজন। প্রায় সবাই তারা অর্ধ-নগ্ন, কেউ কেউ শুধু ল্যাঙট পরে আছে। পেশল ও কালো শরীরে কাদামাটি লেগে আছে। কারও মুখে টু-শব্দ নেই, ওখানে দাঁড়িয়ে খাঁড়ির পানির দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে সবাই। বিস্ময়ে বিমূঢ়।

মাথা নাড়ল কয়েকজন বৃদ্ধ। তাদের পাকা চুলগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছে বাতাস; চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ।

তরুণ-তরুণীরা মাঝেমধ্যে ঠোঁট কামড়াচ্ছে, ভারসাম্য রক্ষা করছে শরীরের ওজন এক পা থেকে আরেক পায়ে চাপিয়ে। সাগরের পানি থেকে চোখ সরাতে পারছে না কেউ।

তবে ওরা কেউ পানি দেখছে না, দেখছে পানির তলা থেকে উঠে আসা উদ্ভিদজাতীয় কী যেন। বাড়ছে ওগুলো, ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলছে খাঁড়ির পানি। দু'টো-চারটে নয়, অসংখ্য।

এমনকী ভোরের ম্লান আলোতেও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা, গজাচ্ছে ওগুলো। বেশ দ্রুত, মাছ বা সাপের চলার মত অতটা নয়, তবে খালি চোখে দেখতে পাওয়ার মত যথেষ্ট।

খাঁড়িটাকে ক্রমশ ভরাট করে তুলছে অদ্ভুতদর্শন সামুদ্রিক আগাছা। সরু লিকলিকে ডাঁটা; বাড়ন্ত ডাঁটা থেকে গজাচ্ছে আরও ডাঁটা, সেগুলোর গা থেকে আরও। প্রতিটি শাখা-প্রশাখা থেকে গজাচ্ছে চারকোনা আকৃতির, আধ ইঞ্চি পাতা। একটার গা থেকে এতই দ্রুত জন্মাচ্ছে আরেকটা যে, সারফেসের কাছে ইতিমধ্যেই পুরু হয়ে উঠেছে ওগুলোর স্তর। প্রবীণদের একজন মাথা চুলকে মন্তব্য করল, 'আরেকটু পর আমরা বোধহয় সাগরের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতে পারব।'

কথাটা শুনে শিউরে উঠল কয়েকজন, ক্রুসচিহ্ন আঁকল বুকে। কুরুড়ু দ্বীপে আদিবাসীদের প্রায় সবাই ধর্মান্তরিত খ্রিশ্চান। এমন দৃশ্যের কথা জীবনে শোনেনি ওরা কেউ।

এই সময় দেখা গেল এগিয়ে আসছেন একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক। ধবধবে সাদা চুল; পরনে খাকি ট্রাউজার, শার্টের উপর বুশ জ্যাকেট–বহু বছর নোনা পানি আর রোদ লাগায় রঙ হারিয়ে ফেলেছে। একই রকম কাপড় পরা আদিবাসী এক তরুণ পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে তাঁকে।

'দেখুন, ফাদার, নিজের চোখে দেখুন!' ইন্দোনেশীয় ভাষায় বলল তরুণ, কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা।

আদিবাসী লোকগুলো সরে পথ করে দিল, চোখে-মুখে ভক্তি

ও প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

আদিবাসী বৃদ্ধের পিছনে পৌঁছালেন ফাদার।

'দেখুন, ফাদার,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল আদিবাসী বৃদ্ধ। 'দেখে বলুন কী ব্যাপার।'

শান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন উইলিয়াম লিন্ডসে। জাতিতে ডাচ তিনি, তবে ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক, পঞ্চাশ বছর ধরে এই দ্বীপে একা পড়ে আছেন। আদিবাসীদের মধ্যে খ্রিশ্চান ধর্ম প্রচার করতে সুদূর সেই নেদারল্যান্ড থেকে এখানে এসেছিলেন, তখন ইরিয়ান জায়ার নাম ছিল ডাচ নিউ গিনি।

দ্বীপের একটু ভিতর দিকে একটা লাইটহাউস আছে, তবে সেটার কেয়ারটেকার বছরে মাত্র কয়েকটা দিন ইরিয়ান জায়ার রাজধানী জায়াপুরা থেকে আসে, তার বদলে বিনা বেতনে স্বেচ্ছায় ডিউটি দেন ফাদার লিন্ডসে।

'কী ওগুলো?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'পানিতে জঙ্গল জন্মাচ্ছে। একটু পর হাঁটা যাবে ওই আগাছার ওপর দিয়ে। কাল এখানে কিছুই ছিল না। আজ খাঁড়ি প্রায় ভরে গেছে। মাত্র এক রাতে।'

'না, তা সম্ভব নয়।'

'সত্যি সম্ভব নয়, কিন্তু চোখ তো আর মিথ্যেকথা বলছে না।'

লম্বা ককেশিয়ান পানির দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেলেন: সরু খাঁড়ির আলোকিত হয়ে আসা সারফেসে দ্রুত এবং নীরবে পুরু হয়ে জন্মাচ্ছে অচেনা এক জাতের লতাগুল্ম, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে ধরা পড়ে ওগুলোর নড়াচড়া ও বিস্তার। বাড়ার গতি এত বেশি, ওগুলো যেন উদ্ভিদ নয়, জ্যান্ত কোনও প্রাণী। মূল ডাঁটা থেকে শাখা বেরোচ্ছে, সেগুলো থেকে বেরোচ্ছে আরও নতুন প্রশাখা। দেখতে ঠিক যেন সরু লিকলিকে সবুজ সাপ; সমস্ত ডাঁটার গায়ে খানিক পরপর একটা করে ছোট আকারের

চৌকো ফুল।

প্রকাণ্ড একটা সামুদ্রিক দানব যেন জ্যান্ত হয়ে উঠছে, মাথা তুলছে গোটা খাঁড়ির সারফেসে।

তারপর ভেসে ওঠা মাছ দেখা গেল। সব যে মরে ভেসে উঠছে তা নয়, কিছু কিছু ভেসে ওঠার পরও লাফালাফি করল, তবে বেশিক্ষণ নয়।

আগাছায় ঢাকা খাঁড়ির সারফেসে উঠে আসছে মাছগুলো। এখানে সেখানে হাজার হাজার রূপালি মাছ ভোরের আলোয় চকচক করছে। মরা কাঁকড়া আর চিংড়িও উঠে আসছে সামুদ্রিক সর্পলতার নীচ থেকে।

তারপর দেখা গেল একটা বিড়াল, দুটো কুকুর আর কয়েকটা ইঁদুরের ধূসর শরীর। পিলে চমকে গেল সবার।

'ফাদার!' হাত তুলে ডানদিকে দেখাল আদিবাসী বৃদ্ধ।

সেদিকে তাকালেন ফাদার লিন্ডসে। খাঁড়ির পাড়ের একটা গর্ত থেকে বড় একটা ছুঁচো বেরিয়েছে। তীরে লোকজনের ভিড় দেখে আতঙ্কে অস্থির হয়ে পালাবার চেষ্টা করছে ওটা। বারকয়েক পা পিছলাল, তারপর দিশে হারিয়ে লাফ দিল সোজা পানিতে; অদ্ভুত লতাগুলোর মাঝখান দিয়ে সাঁতরাতে শুরু করল।

পাঁচ ফুটের মত সাঁতরাল বাদামী রঙের ছুঁচোটা। আরও এগোচ্ছে। দশ ফুট। তারপর হঠাৎ চিঁ-চিঁ করে ডেকে উঠে চিত্ হয়ে গেল, অনবরত পা ছুঁড়ছে আকাশের দিকে। তবে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এল ওটা।

মরা মাছ খেতে চারদিক থেকে উড়ে এল পাখির ঝাঁক। গাংচিলই বেশি, আর সাদা বক। দেখতে দেখতে একেবারে মচ্ছব লেগে গেল।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে আদিবাসী বৃদ্ধ বলল, 'এরকম জ্যান্ত লতা কখনও দেখিনি আমরা, বাপ-দাদাদের মুখে

শুনিওনি। আপনি কী বলেন, ফাদার? এ-সব কীসের আলামত?'

কয়েকটা সাদা বককে কাত হয়ে পড়ে যেতে দেখলেন ফাদার লিন্ডসে। তাঁর অপলক চোখে সন্ত্রস্ত একটা ভাব ফুটে উঠল। তারপর দেখলেন ছুঁচোটা আর নড়ছে না, মারা গেছে।

মরে ভেসে ওঠা মাছ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে গাংচিল আর বকও। সন্দেহ নেই ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে সবগুলো।

'সবাই খাঁড়ি ছেড়ে সরে যাও!' গলা চড়িয়ে বললেন ফাদার।

ছেলে-বুড়ো সবাইকে খেদিয়ে গ্রামের দিকে ফিরিয়ে আনছেন ফাদার উইলিয়াম লিন্ডসে। জঙ্গলের গভীরে ঢুকে অদৃশ্য হওয়ার আগে ঘাড় ফিরিয়ে অপার্থিব দৃশ্যটার দিকে আরেকবার তাকালেন তিনি। ঠাণ্ডা শিরশিরে অনুভূতি হলো শিরদাঁড়ায়। তারপর সবার পিছু নিয়ে লাইটহাউসের দিকে এগোলেন তিনি।

খাঁড়ির কিনারা থেকে মাত্র পাঁচশো গজ দূরে ওটা। ওই লাইটহাউসের চারপাশে বিশ-বাইশটা কুঁড়ে তৈরি করে বসবাস করে আদিবাসীরা।

লাইটহাউসে সরকারী রেডিও আছে। আবহাওয়া দপ্তরের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ার স্বাস্থ্য ও পুলিশ বিভাগকে এখানকার বিপদ সম্পর্কে রিপোর্ট করবেন তিনি।

ছোট্ট খাঁড়ির কিনারা থেকে সবাই চলে যাওয়ার পর পরিবেশটা নীরব হয়ে গেল। তবে সেই নীরবতা ভাঙছে অদ্ভুত খসখসে একটা শব্দ: পানিতে দ্রুত সরু ডাঁটা ও ছোট্ট পাতা গজাবার আওয়াজ। বিরতি নেই, সারাক্ষণ খসখস করছে নরম সামুদ্রিক লতা; একটা থেকে আরেকটা গজাচ্ছে, শাখা থেকে বেরুচ্ছে আরও শাখা, উপরের স্তরকে সরিয়ে মাথাচাড়া দিচ্ছে নীচের স্তর, প্রতি মুহূর্তে পুরু হচ্ছে আরও। সর্পলতার এই অবাধ উত্থান পানির সারফেসকে যেন আরও উপরে তুলে দিচ্ছে।

তারপর জলমগ্ন জঙ্গলের ভিতর থেকে উঠে এল কয়েকজন মানুষ। তাদের শরীর কালো ওয়েট-সুটে ঢাকা। এক এক করে দশজন পা রাখল ডাঙায়। দৃঢ় পায়ে লাইটহাউসের দিকে এগোল সবাই।

দুই

প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার দূরে। মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ।

সাবলীল ভঙ্গিতে দ্রুত সাঁতরে এসে জলমগ্ন প্রবাল গুহার গাঢ় ছায়ার ভিতর ঢুকল ডাইভার, এবড়োখেবড়ো দেয়ালে হেলান দিয়ে স্থির হলো। অত্যন্ত সাবধানী মেয়ে সে, রিফ-এর ধারালো কিনারা থেকে এয়ার হোসটা দূরে সরিয়ে রেখেছে। যে-কোনও বিপদ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত তার হাতে ধরা স্পিয়ারগান।

স্বচ্ছ নীল পানির ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে রঙচঙে মাছ। মাথার উপর সাগরের সারফেস অনেকটা উঁচুতে বলে হালকা নীল ও ম্লান দেখাচ্ছে। অপেক্ষা করছে মেয়েটা। উত্তেজিত সে, সামান্য হাঁপাচ্ছে। মেদহীন অ্যাথলেটিক কাঠামো, তবে যৌবন তার অঢেল সম্ভার দিয়ে সাজিয়েছে সেটাকে।

লোকটা এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিধ্বস্ত হওয়া একটা আমেরিকান ল্যান্ডিং ক্রাফট-এর কোণ ঘুরে। প্রবালে ঢাকা পড়ে আছে সেটা। ধীরে ধীরে, সাবধানে এগোচ্ছে ও; এক হাতে ধরা স্পিয়ার গান, ফেস মাস্কের পিছন থেকে তল্লাশি চালাচ্ছে মায়াময় একজোড়া চোখ। পেশিবহুল. বলিষ্ঠ কাঠামো লোকটার;

দীর্ঘদেহী, আকর্ষণীয় সুপুরুষ।

গুহার মুখে থেমে মেয়েটিকে হাত-ইশারায় ডাকল লোকটা।

মাথা নাড়ল মেয়েটি। যাবে না। এক হাতের আঙুল নেড়ে সাংকেতিক ভাষায় বলল: পৃথিবীতে কেউ নেই, শুধু তুমি আর আমি!

হাসল লোকটা। ভাইজারের স্বচ্ছ আবরণের ওপাশে মেয়েটির মুখেও হাসি।

দু'পাশে দু'হাত তুলল যুবক। মাথা ঝাঁকিয়ে ডাকল আবার। উড়ে গিয়ে ওর বুকে বুক ঠেকাল যুবতী—জড়িয়ে ধরল দুজন দুজনকে।

সারফেসের অনেক নীচে ম্লান নীলচে আলোয় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থাকল ওরা; চুমো খাওয়ার ভঙ্গি করল। ডাইভিং মাস্কের পিছনে চকচক করছে দু'জোড়া ব্যগ্র চোখ। খুব কাছে আসতে চায় ওরা—বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম দুর্ধর্ষ স্পাই মেজর [অব.] মাসুদ রানা, এবং ইন্দোনেশিয়ান ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম সেরা এজেন্ট, একই পদমর্যাদার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার উর্বশী দাশা।

হাত তুলে রোদ লাগা পানির সারফেস আর ওদের বোটের ছায়া দেখাল রানা।

মাস্কের ভিতর ঝিলিক দিয়ে উঠল উর্বশীর চোখ।

আরও একটি মুহূর্ত জোড়া লেগে থাকল ওরা, দৃষ্টিতে পরস্পরকে একান্তভাবে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

হঠাৎ ওদের চারপাশ অন্ধকার হয়ে এল।

উপরে তাকাল রানা।

পানির সারফেস আর ওদের দুজনের মাঝখানে ঝুলে আছে প্রকাণ্ড একটা ছায়া। কালো মেঘের মত। ক্রমশ ওদের দিকে নেমে আসছে সেটা। তবে এখনও অনেক উপরে।

চট্ করে পরস্পরের দিকে তাকাল দুই ডাইভার। ব্যস্ত

ভঙ্গিতে আঙুল নেড়ে সাংকেতিক ভাষায় জানতে চাইল উর্বশী:

'হাঙর নাকি?'

একই ভাষায় জবাব দিল রানা, 'এত বড় হাঙর হয়?'

'তিমি?'

'অসম্ভব নয়।' অন্ধকার হয়ে আসা নিজেদের চারপাশটা ইঙ্গিতে দেখাল রানা।

'আমাদের আরও নীচে নেমে যাওয়া উচিত।'

জবাবে মাথা ঝাঁকাল রানা।

সাগরের তলায় নেমে এসে রিফের গায়ে গুড়ি মেরে থাকল ওরা। প্রায় সরাসরি ওদের মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে লম্বা ছায়াটা।

না হাঙর ওটা, না তিমি।

'সাবমেরিন?' সংকেত দিল উর্বশী।

'এমন সাবমেরিন আমি কখনও দেখিনি,' রানার জবাব।

'তাই তো, আমিও না!'

জিনিসটা সাবমেরিনের চেয়ে অনেক ছোট, দেখতেও অন্যরকম। লম্বা-চওড়ায় প্রায় সমান, খুব ভারী আর বেঢপ, কিনারায় জানালা আছে। গতি মন্থর, তবে একেবারে কম নয়।

উর্বশী সংকেত দিল। 'মনে হয় ডিপ-ডাইভিং সাবমারসিবল, নুমার নয়তো?'

রানা ভাবছে, গভীর জলে কাজ করবার উপযোগী কোনও সাবমারসিবল হতে পারে ওটা। প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'নুমার হলে আমি চিনতাম।'

'নুমা ছাড়া আর কে? অন্য কোনও গবেষণা প্রতিষ্ঠান?'

'কী জানি।'

রিফের গায়ের কাছে গুড়ি মেরে অদ্ভুতদর্শন সাবমারসিবলটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওরা। ওদের মাথার উপর দিয়ে খোলা সাগরের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে ওটা। সমান গতিতে এগোচ্ছে,

যাচ্ছে উত্তর-পুব দিকে। অস্পষ্ট হতে হতে এক সময় হারিয়ে গেল।

হাত তুলে পানির সারফেস দেখাল রানা, তারপর সাংকেতিক ভাষায় জানাল, 'নুমাকে রিপোর্ট করা দরকার।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল উর্বশী দাশা। দুজন একসঙ্গে উপরে উঠতে শুরু করল। একটু পরেই স্থির হয়ে গেল ওরা।

দূরে মিলিয়ে যাওয়া সাবমারসিবলের দিক থেকে পাঁচজন ডাইভার আসছে। পরনে ওয়েট সুঁট, মুখে মাস্ক, হাতে স্পিয়ার গান। কিন্তু ওদের কারও পিঠে কোনও এয়ারট্যাংক নেই!

সময় নষ্ট করেনি রানা।

দেরি করেনি উর্বশীও।

ডিগবাজি খেয়ে দ্রুত ফিন চালিয়ে সাগরের তলায়, ছায়ার ভিতর নেমে এসেছে ওরা।

রানা সংকেত দিল, 'রিফের ভেতরে!'

ধারালো প্রবালের তৈরি সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল ওরা। অসংখ্য সুড়ঙ্গ নিয়ে এটা একটা গোলকধাঁধা।

লাফ দিয়ে রিফের কিম্ভুতকিমাকার ছায়ার ভিতর ঢুকছে রানা, এই সময় প্রবালের গায়ে গাঁথল প্রথম স্পিয়ারটা, ওর পায়ের ঠিক এক ইঞ্চি পিছনে।

দ্বিতীয় স্পিয়ার উর্বশীর এয়ার ট্যাংকের সামান্য একটু রঙ তুলে নিয়ে গেল, নীলচে পানির ভিতর প্রতিধ্বনি তুলল ধাতব ঝঙ্কার।

প্রথম বাঁকটা ঘুরল ওরা, রিফের গভীরে ঢুকে পড়ছে। তৃতীয় স্পিয়ার উর্বশীর ঊরু ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঘসা খেয়েছে, তাতে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে পড়ল। আধ সেকেন্ড দেরি করে ফেলায় কাছাকাছি চলে আসা লোকটাকে ফাঁকি দিতে পারেনি সে।

'থেমো না,' সংকেত দিল রানা। প্রবালের এবড়োখেবড়ো একটা স্তম্ভকে ঘুরে এল ও, দশ সেকেন্ড পর একটা ডিগবাজি খেয়ে ফেলে আসা পথের দিকে মুখ করে দাঁড়াল, দেখল দ্রুত ওকে পাশ কাটাচ্ছে উর্বশী।

আক্রমণকারীদের সামনের লোকটা দ্রুতবেগে স্তম্ভ ঘুরল। রানাকে দেখতে এক পলক দেরি করে ফেলেছে। ফায়ার করল, কিন্তু ট্রিগার টেপার সময় রানার স্পিয়ার তার গলায় বিঁধে গেল।

গ্যাস-প্রপেলড্ সিও-টু গান ব্যবহার করছে রানা, প্লাস্টিক-বর্শাটা কর্ড দিয়ে বাঁধা নয়, আগায় ইস্পাতের ফলা রয়েছে।

ঝাঁকি খেল লোকটার হাত, শক্তিশালী এয়ার-প্রপেলড্ স্পিয়ার রানার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

আহত লোকটার গলা থেকে হু-হু করে রক্ত বেরুচ্ছে। ধীরে ধীরে নিথর হয়ে গেল সে। লাশটা অলস ভঙ্গিতে পানিতে ভাসছে, ভাঙা একটা পুতুলের মত, উঠে যাচ্ছে সারফেসের দিকে।

প্রবালের ধারালো পিলার, ঝুরি, স্তূপ আর ধাপের মাঝখানে রয়েছে লাশটা। ওটার পিছনে পৌঁছাল তার সঙ্গীরা।

ঘুরে উর্বশীর পিছু নিল রানা। গোলকধাঁধা ও রিফ থেকে ফাঁকা পানিতে বেরিয়ে আসছে, বাকি চারজন প্রায় ধরে ফেলল ওকে।

প্রথম লোকটাকে ঘায়েল করল উর্বশী।

হাত-পা ছুঁড়ছে লোকটা, হারপুনে গাঁথা মাছের মত নিঃশব্দে মোচড় খাচ্ছে শরীর, পিঠ থেকে এক ফুট বেরিয়ে আছে উর্বশীর স্পিয়ার।

বাকি তিনজন দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে আড়াল নিচ্ছে রিফে, রানার স্পিয়ার একজনকে সামান্য আহত করল।

'ল্যান্ডিং বার্জ!' ঘুরে সংকেত দিল রানা। দ্রুত সাঁতার কেটে প্রবালে মোড়া মার্কিন ল্যান্ডিং ক্রাফটটার দিকে এগোচ্ছে দুজন।

জাহাজটার পিছনে আড়াল নিয়ে ফেলে আসা পথের দিকে

তাকাল রানা। তিন প্রতিপক্ষ তির্যক একটা পথ ধরে দ্রুত পালাচ্ছে, আহত লোকটা পিছনে রেখে যাচ্ছে রক্তের সরু একটা ট্রেইল।

উর্বশীর দিকে তাকাল রানা, তারপর দ্রুত উপরদিকে আঙুল দেখিয়ে সংকেত দিল। 'যাও। আমি পরে আসছি।' মাথা নাড়ল উর্বশী। ওকে একা ফেলে যাবে না।

'পায়ের কী অবস্থা?' ইঙ্গিতে জানতে চাইল রানা।

সংকেত দিল উর্বশী, 'ওটা কোনও সমস্যা নয়।'

মাস্কের পিছনে নিঃশব্দে হাসল রানা, তারপর দুজন একসঙ্গে অদৃশ্যমান মূর্তিগুলোর দিকে সাঁতরাতে শুরু করল।

লোকগুলোর কাঠামো আর রক্তের ট্রেইল অস্পষ্ট হলেও, পিছু নিতে ওদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। রিফ ছাড়িয়ে আরও গভীর পানিতে চলে যাচ্ছে ওরা, যতই এগোচ্ছে ততই সামনে চলে আসছে মহাসাগরের গাঢ় নীল গভীরতা।

সাগরের তলা ঘেঁষে এগোচ্ছে ওরা, রিফের শেষ অংশের উত্থান-পতনের সঙ্গে তাল রেখে সাঁতরাচ্ছে। প্রতিপক্ষ ডাইভাররা রয়েছে বেশ খানিকটা সামনে, উপরদিকে। কীভাবে যেন এয়ার ট্যাংক ছাড়াই শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাচ্ছে তারা।

রানা ভাবল, লোকগুলো কি ভয়ে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না? নাকি ভাবছে কেউ পিছু নিলে ওদের কিছু আসে যায় না? 'ওরা সাবমারসিবলে ফিরছে?' সংকেতে জিজ্ঞেস করল ও।

'খুব সম্ভব। ওটা থেকেই যদি এসে থাকে।'

'ট্যাংকে বাতাস কতটুকু?'

'মিনিট পনের চলবে,' জানাল উর্বশী। 'তবে ফিরতেও সময় লাগবে আমাদের।'

'প্রথমে সারফেসে উঠতে পারি, তারপর বোটে ফিরব।'

এই সময় আবছাভাবে ওটাকে দেখতে পেল ওরা, গভীর হয়ে আসা সাগরে গাঢ় একটা কালো আকৃতি।

বেঢপ সেই সাবমারসিবল।

উঁচু-নিচু মেঝের একটু উপরে যেন চুপচাপ বিশ্রাম নিচ্ছে ওটা, ঠিক পিছনেই খাদের কিনারা–যেখান থেকে অকস্মাৎ শুরু হয়েছে সামুদ্রিক গভীরতার গাঢ় কালো বিস্তার।

শুধু নীরব নয়, একচুল নড়ছেও না ওটা।

রানার মনে হলো ঝুলে থাকা আকৃতিটার কাছাকাছি পৌঁছে প্রতিপক্ষ ডাইভাররা যেন আগের চেয়ে দ্রুত সাঁতরাচ্ছে।

'চলো, ব্যাটাদের ধরি!'

রানার সংকেত পরিষ্কার দেখতে পেল উর্বশী। সাঁতারের গতি বাড়িয়ে দিয়ে তার সঙ্গে অচেনা আততায়ীদের পিছু নিল সে-ও।

কিন্তু হঠাৎ তাদেরকে হতভম্ব করে দিয়ে তিন আক্রমণকারী সাঁতার বন্ধ করল, অথচ তারপরও আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে পানির ভিতর দিয়ে সাবমারসিবলের দিকে এগোচ্ছে ওরা–যেন একটা সাবমেরিনের ইস্পাতের গা লক্ষ্য করে ছুটে যাচ্ছে তিনটে টর্পেডো।

সাবমারসিবলের হ্যাচ খুলে গেল। বোধহয় চোখের পলকও পড়ল না, লোকগুলো ওটার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ডাইভ!' দ্রুত, জরুরি ভঙ্গিতে সংকেত দিল রানা।

উর্বশীকে দ্বিতীয়বার বলার দরকার হলো না। একসঙ্গে ডাইভ দিয়ে সাগরের তলায় নামছে ওরা, ছড়িয়ে থাকা পাথরের পিছনে আড়াল নেবে।

মাত্র কয়েক ফুট এগোতে পারল ওরা। তারপর চমকে উঠে অনুভব করল কী যেন আসর করেছে ওদের উপর। যেন ধাক্কা খেয়েছে অদৃশ্য কোনও শক্তির দেয়ালে। তারপর শুরু হলো আশ্চর্য এক অমোঘ আকর্ষণ। কীসে যেন টানছে ওদেরকে সাবমারসিবলটার দিকে, চেষ্টা করেও বাধা দিতে পারছে না, সরে যেতে পারছে না। আটকে গেছে ওরা। না পারছে উপরে উঠতে,

না পারছে নীচে নামতে।

নিজেদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কালো, নীরব সাবমারসিবলটার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ওরা।

তিন

চলতে শুরু করেছে সামনের জলযান। অদৃশ্য শক্তিটা অমোঘ টানে গভীর সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে রানা আর উর্বশীকে। ছটফট করছে ওরা, কিন্তু আশ্চর্য ওই আকর্ষণ এড়ানোর কোনও উপায় দেখছে না।

রানার পাশে উন্মত্তের মত নিজের শরীরটাকে মোচড়াচ্ছে উর্বশী, তারই ফাঁকে সংকেতে জানতে চাইল: 'কী এটা?'

মাস্কের ভিতর তার চোখে ভয়ের ছায়া খেলা করতে দেখল রানা। বলল, 'কোনও ধরনের ফোর্স ফিল্ড!'

'সে তো সায়েন্স-ফিকশন।

'এক্ষেত্রে নয়।'

যতভাবেই মোচড় খাক, ডিগবাজি দিক, হাত-পা ছুঁড়ুক বা আর কিছু করুক, অদৃশ্য শক্তির প্রভাব থেকে নিজেদেরকে ওরা মুক্ত করতে পারছে না।

বৃথা চেষ্টা, বুঝতে পেরে এক সময় শান্ত হলো রানা। ভাবছে কী করা যায়।

ওর দিকে তাকিয়ে ছিল উর্বশী। বলল, 'আমরা কি হাল ছেড়ে দেব?'

'না,' সংকেত দিল রানা। 'এসো।' সোজা সাবমারসিবলটার দিকে সাঁতরাচ্ছে ও। সরে যাওয়া যখন যাচ্ছেই না, কাছে গিয়ে দেখা যাক কোনও লাভ হয় কি না।

রানার পিছু নিল উর্বশী, সে-ও নিজেকে অদৃশ্য শক্তির হাতে সমর্পণ করে এগিয়ে চলল সামনে।

নীরব সাবমারসিবলের দিকে ক্রমবর্ধমান গতিতে এগোচ্ছে ওরা। ওটার প্রতিটি জানলা যেন একেকটা অন্ধ চোখ। হাতঘড়ি দেখা ছাড়া আর কিছু করবার নেই যেন ওদের।

দূরত্ব আর যখন পঞ্চাশ গজের মত, হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়। একটা বর্শা বের করল তূণ থেকে। ওটা হাত থেকে ছুটে যাচ্ছিল, থাবা দিয়ে ধরে পরাল স্পিয়ারগানে, তারপর সামনের গাঢ় ছায়ার দিকে তাক করে টিপে দিল ট্রিগার।

স্বাভাবিক গতির চেয়ে তিনগুণ বেগে ছুটে গিয়ে আঘাত করল বর্শাটা সাবমারসিবলের গায়ে। কোনও রকম ভ্রূক্ষেপ নেই যেন, অবিচলিত গতিতে এগোচ্ছে ওটা সামনের দিকে; টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকেও।

রানাকে হাসতে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে জানতে চাইল উর্বশী, ব্যাপার কী।

'অক্সিজেন ট্যাঙ্ক!' বলল রানা সাঙ্কেতিক ভাষায়।

'অক্সিজেন?' বলল উর্বশী। 'আর চলবে দশ মিনিট। এখন কী করা উচিত?'

'মুক্ত হবার চেষ্টা।'

'কীভাবে?'

অনেক নীচে হারিয়ে গেছে সাগরের তলা। বহুদূর সরে এসেছে ওরা রিফ থেকে। হিসেব কষে দেখল রানা খুব বেশি গভীরে চলে আসেনি ওরা, এখনও চেষ্টা করলে হয়তো উপরে পৌঁছানো অসম্ভব নয়। উর্বশীর দিকে ফিরল।

'ট্যাঙ্কটা খুলে, ছেড়ে দিতে হবে।'

কথা শুনে চমকে উঠল উর্বশী। 'তা হলে? তা হলে ওপরে উঠব কী করে?'

'বড় করে দম নিয়ে,' বলতে বলতে হার্নেস খুলে পিঠের অক্সিজেন ট্যাঙ্কটা সামনে আনল রানা, শক্ত করে ধরে রেখেছে। 'এটাকে বিসর্জন দিতে হবে এবার।'

'ওটা ছাড়া আমরা সারফেসে উঠতে পারব?' জানতে চাইল উর্বশী, যদিও রানা কী বলতে চায় বুঝে ফেলেছে।

'পারতেই হবে। যতটা পারো বাতাস ভরো ফুসফুসে।'

প্রথমেই বেল্টের সঙ্গে আটকানো সীসাগুলো খুলে ছেড়ে দিল, তারপর বুক ভরে শ্বাস নিল ওরা, নিঃশ্বাস ফেলল; তারপর লম্বা ও গভীর করে টান দিয়ে ভরে নিল ফুসফুস। এবার পিঠ থেকে খুলে আনা ট্যাঙ্ক ছেড়ে দিল। ছুটে চলে গেল ওগুলো সাবমারসিবলের দিকে। মুহূর্তে আকর্ষণমুক্ত হলো ওরা।

যত জোরে পারা যায় পা ছুঁড়ে উপরে উঠছে দুজন। অদৃশ্য শক্তি প্লাস্টিকের স্পিয়ারগুলোকে টানছে না, টানছে শুধু স্টিলের তৈরি ফলাগুলোকে, তবে সেটা তেমন জোরালো নয়; সেই টান অগ্রাহ্য করে উপরে উঠতে ওদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।

এয়ার ট্যাংকগুলো ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল সাবমারসিবলের গায়ে। ওদের চোখের সামনে থেকে দ্রুত আবছা হতে হতে নীল গভীরে হারিয়ে গেল বেঢপ জলযানটা।

রানা আর উর্বশী থামছে না, অনবরত পা ছুঁড়ে উঠে যাচ্ছে উপরে। বুকের বাতাস অমূল্য, একটু একটু করে ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে ওরা।

এক সময় মনে হলো অক্সিজেনের অভাবে না মারা যায়।

হাল ছেড়ে দেওয়ার আগে আধবোজা চোখে রানার দিকে একবার তাকাল উর্বশী। ওর অবস্থা বুঝতে পেরে চোখ রাঙাল রানা, যেন বলতে চাইল এত কাছে এসে হার মানবে কেন! একটা হাত ভরে দিল ওর বগলের নীচে।

উর্বশী দেখল, সারাক্ষণ ওর উপর নজর রাখছে রানা। নতুন শক্তি অনুভব করল ও, ফুসফুসের ব্যথাটাকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করছে। চোখ বুজল, প্রবল ইচ্ছেশক্তি খাটিয়ে পা নাড়ছে।

খানিক পর–আহ্, কী শান্তি! পানির উপর মাথা তুলে হাঁপাতে লাগল দুজন, বাতাসের সঙ্গে পানিও গিলে ফেলছে–পরোয়া নেই।

চোখাচোখি হতে ক্লান্ত হাসি দেখা গেল উর্বশীর মুখে। 'আহ্, কী আরাম! আসল বাতাস নিতে খুব ভাল লাগছে। ধন্যবাদ, রানা।'

'আমরা কথাও বলতে পারছি,' হেসে উঠে বলল রানা।

ওদের হাসি যেন মধুর সংক্রামক। নীল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে খেলা করছে উজ্জ্বল রোদ, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে ওরা, আর প্রাণ খুলে হাসছে বাচ্চাদের মত।

বেঁচে থাকাটা যে অসম্ভব সুখকর একটা অভিজ্ঞতা, যে-কোনও মারাত্মক বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেই কেবল সেটা ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়।

মাথার উপর মেঘমুক্ত আকাশ। সাগরের লম্বা ঢেউ ছুটে এসে পিঠে তুলে নিচ্ছে দুজনকে, তারপর আবার নামিয়ে দিচ্ছে।

'কী মজা, তাই না, এই বেঁচে থাকাটা? বুকের ভেতর থেকে কার প্রতি যেন উথলে উঠতে চায় কৃতজ্ঞতা–তাই না?' দু'দিন আগেই উর্বশী রানাকে জানিয়েছে–ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই ওর। ভক্তি নেই পূজা-অর্চনায়।

'সম্ভবত ভাগ্যের প্রতি,' বলল রানা। 'তবে শুধু বেঁচে থাকার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে চলবে না–এসো, বেঁচে থাকাটা যে কারণে আপাতত উপভোগ্য লাগছে সেজন্যেও কৃতজ্ঞ হই।'

তার চোখের দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে উর্বশী বলল, 'ও, বুঝেছি–হ্যাঁ, তোমার মত সাহসী, মার্জিত আর শক্তিশালী একজন পুরুষকে বন্ধু হিসাবে পেয়ে সত্যি আমি...

'আমিও ঠিক এ-কথাই বলতে চাই, শুধু কিছু বিশেষণ যোগ

করব। ইন্টেলিজেন্ট, স্ট্রেইটফরওয়ার্ড অ্যান্ড সেক্সি। যে জীবনকে একশোভাগ উপভোগ করতে জানে। আই লাভ ইওর ম্যানার।'

'অ্যান্ড, মোস্ট অভ অল, আই লাভ ইওর ম্যানলিনেস।'

দ্রুতই কাজের প্রসঙ্গে ফিরল রানা। 'সাবমারসিবল। তোমার কী ধারণা, আমরা যে কারণে এখানে এসেছি তার সঙ্গে ওটার সম্পর্ক আছে? নিখোঁজ ডাইভার আর ওই সচল সামুদ্রিক আগাছার সঙ্গে?'

উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে উর্বশীকে। 'হতে পারে, তবে আমি ভাবছি, কোথায় ওটাকে দেখলাম আর কোত্থেকে ওটা এল তাই নিয়ে। জায়গাটা কোয়াজালিয়েন অ্যাটল-এর মার্কিন সামরিক ঘাঁটির বেশ কাছে, আর এসেছে লেগুনের দিক থেকে।'

অ্যাটল মানে একটা লেগুনকে ঘিরে থাকা বৃত্তাকার কোরাল রিফ। কোয়াজালিয়েন অ্যাটল মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে। এখানকার প্রবাল রিফ এক হাজার তিনশো পঞ্চাশ বর্গ-কিলোমিটার লেগুনকে ঘিরে রেখেছে।

১৯৬১ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া এয়ার ফোর্স বেস থেকে ছোঁড়া এক্সপেরিমেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলের টার্গেট হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এই রিফ ও লেগুনকে।

রানা অপেক্ষা করছে, ওর ধারণা, উর্বশী আরও কিছু বলবে।

'চিনা?' অবশেষে জানতে চাইল উর্বশী।

'কী করে, কেন?' প্রশ্ন করল রানা। 'প্রশান্ত মহাসাগরের একই এলাকায় ওদেরও তো ঘাঁটি আছে–সিচোয়ান অ্যাটল-এ। তা ছাড়া, কোয়াযের কাছাকাছি নোঙর ফেলে আছে চিনাদের সার্ভেইলান্স শিপ, সারাক্ষণ কড়া নজর রাখছে মার্কিন ঘাঁটির ওপর। সাবমারসিবলটা কি চিনা সাবমেরিনের মত দেখতে?'

'আমার দেখা কোনও কিছুর মতই নয় ওটা,' বলল উর্বশী। 'কমব্যাট সাব-এর তুলনায় অনেক বেশি মোটা, মন্থরও। আবার যে-কোনও ডিপ-ডাইভিং সাবমারসিবলের তুলনায় অনেক বড়,

গতিও বেশি।'

'কোনও ক্লু নেই কোথায় ওটা তৈরি হয়েছে, কিংবা কোত্থেকে ওটা আসতে পারে।'

'আমিও অন্ধকারে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, প্রবল স্রোত আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলে ওঠা সমুদ্রের এক জায়গায় ভেসে থাকবার জন্য পানিতে অনবরত হাত-পা নাড়তে হচ্ছে ওকে। পরবর্তী ঢেউয়ের মাথায় ওঠার পর চোখ বুলিয়ে চারদিকটা দেখে নিল।

'তুমি জানো, ঠিক কোথায় আছি আমরা?' উর্বশীকে প্রশ্ন করল রানা।

'অ্যাটল থেকে মাইল চারেক উত্তর-পুবে চলে এসেছি,' বলল উর্বশী। 'এখন যদি আমরা পশ্চিম দিকে সাঁতরাই, লেগুনটাকে ঘিরে থাকা যে-কোনও একটা দ্বীপে পৌঁছে যাব।'

'তুমি জানো, কোন্‌দিকটা পশ্চিম?'

'তুমি জানো, আমি একজন সুদক্ষ ন্যাভাল অফিসার, ডিয়ার ব্রাদার,' সহাস্যে বলল ইন্দোনেশিয়ান সুন্দরী।

'পশ্চিমে সাঁতরানোর আজ্ঞা হোক, সিস্টার।'

হেসে উঠল উর্বশী। কবজিতে বাঁধা হাতঘড়ি উল্টে নিয়ে পরল, এখন ওটা একটা ওয়াটার-প্রুফ কমপাস। হেলে পড়া সূর্যটা ঠিক কোথায় আছে দেখে নিয়ে সাঁতার শুরু করল।

উর্বশীর পাশে থাকছে রানা, খোলা প্রশান্ত মহাসাগরের বিরতিহীন ঢেউয়ের উপর দিয়ে সাঁতরে কোয়াজালিয়েন অ্যাটলের দিকে এগোচ্ছে, আর ভাবছে।

ওরা এখানে কেন?

চার

ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি—সংক্ষেপে নুমা। মার্কিন সরকারের স্বায়ত্তশাসিত একটি প্রতিষ্ঠান; সাগর, সামুদ্রিক প্রাণী, সাগরতলের শিলাস্তর, কন্টিনেন্টাল শেল্ফ্, খনিজ পদার্থ, জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হয় ওখানে। খুব কম লোকই জানে যে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি হিসাবেও কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয় নুমাকে।

বিধি-বিধানে বলা আছে নুমার ডিরেক্টর শুধুমাত্র প্রেসিডেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। যাকে খুশি চাকরি দিতে পারবেন তিনি, পারবেন উপদেষ্টা নিয়োগ করতে; তাঁর এ-ধরনের কোনও সিদ্ধান্তে প্রেসিডেন্ট ছাড়া কোনও অবস্থাতেই আর কেউ নাক গলাতে পারবে না।

টাকার অঙ্কে নুমার বাৎসরিক বাজেট পঞ্চাশ হাজার কোটি ছাড়িয়ে যায়।

নুমার ডিরেক্টর-জেনারেল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল [অবসরপ্রাপ্ত] রাহাত খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সূত্রে মাসুদ রানা সম্পর্কে সবই তাঁর জানা। তা ছাড়া, সমুদ্রসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে নিজের মেধা ও সময় দিয়ে নুমাকে প্রায়ই সাহায্য করে রানা। দীর্ঘদিনের গভীর সম্পর্ক, রানা যেমন তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, তিনিও তেমনি ওকে আপন সন্তানের মত ভালবাসেন।

তাঁরই বিশেষ অনুরোধে নুমার একটি অবৈতনিক পদ গ্রহণ করেছে রানা–নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর। যেহেতু কাজটা অবৈতনিক, তাই এ প্রতিষ্ঠানের অনেকের চেয়েই স্বাধীনতা ও সম্মান ওর অনেক বেশি।

কিছুদিন আগে নুমার হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটন থেকে নুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফ-এর সই করা একটা মেসেজ এসেছে ঢাকায় ওর নামে।

মেসেজটা এরকম:

নুমার সার্ভে শিপ ট্রেসপাস বিশেষ একটা কর্মসূচি শেষ করে ভারত মহাসাগর হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছেছে। কিছু মেরামতি কাজের জন্য কোয়াজালিয়েন অ্যাটলে নোঙর ফেলবে, মার্কিন সামরিক ঘাঁটির কাছে।

ট্রেসপাসের বিশেষ কর্মসূচি ছিল বঙ্গোপসাগরের অপেক্ষাকৃত অগভীর এলাকায়, এবং সি লেভেল থেকে পঁচিশ হাজার তিনশো চুয়াল্লিশ ফুট গভীর জাভা ট্রেঞ্চে একটা জরিপ চালানো। ওই দুই এলাকায় যে সোনা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, লোহা আর তামা পাওয়া গেছে তার পরিমাণ, আদৌ উত্তোলন সম্ভব কি না সম্ভব হলে কী রকম খরচ পড়বে ইত্যাদি জানতে চেষ্টা করাই এই জরিপের উদ্দেশ্য ছিল।

জরিপ চালাতে গিয়ে নুমার ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীরা এমন কিছু তথ্য পেয়েছেন, ধারণা করা হচ্ছে: ওই এলাকা সংলগ্ন বেশ কয়েকটি দেশের ভাগ্য নাটকীয়ভাবে বদলে যেতে পারে। তার মধ্যে বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়া অন্যতম।

তথ্যগুলো টপসিক্রেট। তাই ওয়াশিংটন থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির মাধ্যমে রিপোর্টের একটা করে কপি সংশ্লিষ্ট দেশে পাঠানো হবে। তাতে সময় লাগতে পারে কমপক্ষে তিন মাস।

তবে বাংলাদেশের মাসুদ রানা নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর এবং ইন্দোনেশিয়ার উর্বশী দাশা নুমার স্পেশাল

ইন্টেলিজেন্স অফিসার হওয়ায় সরাসরি সার্ভে শিপ ট্রেসপাসে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে তাঁদেরকে। সময় করে আসতে পারলে বেড়ানোও হবে, সেই সঙ্গে টপসিক্রেট রিপোর্টটাও নিয়ে যেতে পারবেন তাঁরা।

প্রশান্ত মহাসাগরেও ঠিক একই ধরনের একটা জরিপ চালানো হবে। তবে সেটা শুরু হবে ট্রেসপাস মেরামতের আগে নয়, অর্থাৎ আরও অন্তত একমাস পর।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, নুমা

জর্জ রেডক্লিফ।

মেসেজটা যথারীতি বিসিআই চিফ রাহাত খানের একটা নোটসহ পেয়েছে রানা। বস্ জানিয়েছেন, 'এই মুহূর্তে তোমার জন্য আমার হাতে জরুরি তেমন কোনও কাজ নেই, তাই ওখানে তোমার যাওয়াই উচিত বলে মনে করি।'

রানার নিজেরও ইচ্ছে হলো, যায়। শুধু যে রিপোর্টটা টানছে ওকে, তা নয়। টানছে আরও দুটো জিনিস।

নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করায় কোয়াজালিয়েন অ্যাটলের ওই আমেরিকান মিলিটারি বেস-এর ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারে না কেউ। নুমার সার্ভে শিপ ট্রেসপাস থেকে ঘাঁটিটা দেখবার একটা সুযোগ হাতছানি দিচ্ছে ওকে। ভাবছে, ভাগ্য প্রসন্ন হলে ভিতরে ঢুকে দেখে নেবে কী দিয়ে আর কীভাবে সাজানো হয়েছে ওটাকে।

কোনও ইনফরমেশন জানা থাকলে কেউ বলতে পারে না কখন সেটা কাজে লেগে যেতে পারে।

আরেকটা আকর্ষণ উর্বশী দাশা। এই অসামান্য সুন্দরী এবং দক্ষ ইন্দোনেশিয়ান ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্টের সঙ্গে আগে কাজ করার সুযোগ হয়নি ওর, তবে প্রশংসা শুনেছে প্রচুর।

কাজেই ছত্রিশ ঘণ্টা পর বেরিয়ে পড়ল রানা।

ঢাকা থেকে বিমানের ফ্লাইটে সিঙ্গাপুর, সেখান থেকে

মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে পাপুয়া নিউ গিনির রাজধানী পোর্ট মর্যবি-তে পৌঁছাল ও।

ওখানে ওর জন্য নুমার একটা হেলিকপ্টার অপেক্ষা করবার কথা, ওকে পৌঁছে দেবে সার্ভে শিপ ট্রেসপাসের ডেকে। কিন্তু কপ্টার নয়, রানা দেখল ওর জন্য নুমার ছোট একটা প্লেন অপেক্ষা করছে।

পাইলট জানাল, তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাসুদ রানাকে কোয়াজ সামরিক ঘাঁটির এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছে দিতে হবে।

পাইলটকে প্রশ্ন করে তেমন কিছু জানা গেল না। রানার প্রশ্নের উত্তরে লোকটা শুধু বলতে পারল, মার্কিন ঘাঁটি থেকে এসওএস পাঠানো হয়েছে ট্রেসপাসে। জরুরি সাহায্যের আবেদন শুনে ফুলস্পিডে কোয়াজ অ্যাটল, অর্থাৎ সুপারসিক্রেট মিলিটারি বেস-এর দিকে চলে গেছে সার্ভে শিপ।

রানাকে জায়গামত নিরাপদেই পৌঁছে দিল পাইলট।

নুমার সার্ভে শিপ ট্রেসপাস যেখানে নোঙর ফেলেছে সেখান থেকে সামরিক ঘাঁটির এয়ারস্ট্রিপ বেশ খানিকটা দূরে। প্লেনের পাইলট রেডিওতে কারও সঙ্গে কথা বলবার পর রানাকে জানাল, 'ঘাঁটির ডক-এ অপেক্ষা করুন, ট্রেসপাস থেকে কেউ নিতে আসছে আপনাকে।'

গাঢ় নীল ক্যাটামারান চালিয়ে ওকে নিতে চলে এল যেন পুরাণে বলা সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ও অনন্তযৌবনা উর্বশী নিজেই। তবে মাসুদ রানার নাম শোনামাত্র ব্যস্ত-ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে সে, ব্যাপারটা সেরকম নয়। সার্ভে শিপে লোকবলের অভাব, তাই নুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফ তাকে অনুরোধ করায় রানাকে নিতে এসেছে।

মেয়েটিকে দেখামাত্র আন্দাজ করতে পারল রানা কে সে উর্বশীর রূপের যেমন কোনও তুলনা নেই, তেমনি তার সপ্রতিভ

চটপটে ভাবটাও দাগ কেটে যায় মনে।

অলস অথচ ঋজু একটা ভঙ্গিতে দাঁড়ানো, বিশেষ একটা ছন্দে হাঁটা, খসখসে অথচ মিষ্টি সুড়সুড়ি দেয়া কণ্ঠস্বর, কথা বলবার সময় মুখের অভিব্যক্তি আর হাত নাড়া–আসলে মেয়েটির উপর থেকে চোখ সরানো কঠিন।

তারপর, আলাপ শুরু হতে রানা বুঝল, নিজের পেশায় যেমন দক্ষ সে, তেমনি প্রখর বুদ্ধিরও অধিকারী।

ট্রেসপাসে ফেরার সময় অকস্মাৎ ঝড়ো বাতাস শুরু হলো, অশান্ত সাগরের উপর দিয়ে ক্যাটামারান চালাতে হিমসিম খেয়ে গেল উর্বশী। বিরাট সব ঢেউয়ের ধাক্কায় বেশ কয়েকবার বোট থেকে ছিটকে পড়বার অবস্থা হলো ওদের। রানা ওর আশ্চর্য দৃঢ় মনোবল লক্ষ করল, মুহূর্তের জন্যও ভয় পাচ্ছে না, কিংবা চিড় ধরছে না নিবিড় মনোযোগে।

দীর্ঘ ত্রিশ মিনিট ধরে চলল রুদ্রমূর্তি প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই। মাঝখানে একবার রানাকে হুইল ধরিয়ে দিয়ে নীচে নেমে ইঞ্জিনের অবস্থা দেখে এল উর্বশী। ফিরে এসে পানি সেঁচল কিছুক্ষণ।

শেষ পর্যন্ত ফণা নামাতে হলো সাগরকেই। রানাকে নিয়ে নিরাপদেই সার্ভে শিপের পাশে ভিড়ল উর্বশী।

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'সুন্দর চালিয়ে নিয়ে এলেন।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল উর্বশী দাশা। 'ইউ আর ওয়েলকাম।'

ট্রেসপাসে রানাকে অভ্যর্থনা জানালেন নুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফ। হাসিখুশি, মিষ্টভাষী ভদ্রলোক, চোখে হর্ন-রিমড্ গ্লাস পরেন।

কুশলাদি বিনিময়ের পর প্রথমেই রানা ওর প্রিয় বন্ধু ববি মুরল্যান্ড আর ল্যারি কিং সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিল।

নুমার একজন বিজ্ঞানী ববি। আর কিং হলো নুমার কমপিউটার উইযার্ড।

রেডক্লিফ জানালেন, এই মুহূর্তে অ্যামাজন নদীর কাছাকাছি

একটা রেইন ফরেস্ট থেকে এক জাতের বিরল মাকড়সা সংগ্রহ করছে ববি। নুমার একটা ল্যাবের প্রাথমিক পরীক্ষায় জানা গেছে ওই মাকড়সার লালায় এইডস্ নিয়ন্ত্রণের উপাদান আছে।

ভাল আছে ল্যারি কিং, এই মুহূর্তে ওয়াশিংটনে ও।

রানাকে নিজের অফিসে নিয়ে গিয়ে বসালেন রেডক্লিফ, ডেস্কের দেরাজ খুলে একটা ফোল্ডার বের করে ধরিয়ে দিলেন ওর হাতে, বললেন, 'এই নিন, মিস্টার রানা। এই রিপোর্টটা আপনার হাতে তুলে দেয়ার জন্যেই নুমা আপনাকে দাওয়াত দিয়েছে।'

ফোল্ডারটা খুলে প্রথম কাগজটায় চোখ বুলাল রানা, বিশদ বর্ণনার সার-সংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে ওটায়। রিপোর্টটাকে কেন টপ সিক্রেট বলা হচ্ছে, সেটা বুঝতে ওর কোনও অসুবিধে হলো না। কেউ যদি আন্দাজ করে বলে যে বঙ্গোপসাগরের অগভীর পানিতে সোনার খনি পাওয়া গেছে, তা হলেও খুব একটা ভুল হবে না তার।

নুমার দু'নম্বর ব্যক্তি রেডক্লিফকে রানা বলল, 'এটা আপাতত আপনার কাছেই নিরাপদে থাকবে। আগামী হপ্তায় ফেরার সময় চেয়ে নেব আমি।'

'বেশ।' ফোল্ডারটা আবার ড্রয়ারে ভরে রাখলেন রেডক্লিফ, তালা দিতেও ভুললেন না।

এ-কথা সে-কথার পর একসময় এসওএস প্রসঙ্গটা তুলল রানা। 'শুনলাম এখানকার সামরিক ঘাঁটি থেকে জরুরি সাহায্যের আবেদন পাঠানো হয়েছিল ট্রেসপাসে। কী ব্যাপার, মিস্টার রেডক্লিফ? সিরিয়াস কিছু?'

কোনও রকম দ্বিধা না করেই পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলেন নুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। 'হ্যাঁ, সিরিয়াস বলেই তো মনে হচ্ছে। বলছি।'

আমেরিকানরা কোয়াজালিয়েন অ্যাটল দখল করে নেওয়ার পর ওখানকার আদিবাসী লোকজন বেশিরভাগই চলে গেছে

অ্যাটলের ইবায়ি দ্বীপে। তাদের মধ্যে অনেকে দক্ষ পেশাদার ডাইভার, সাগরের তলা থেকে এটা-সেটা তুলে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে।

কিন্তু কেউ বলতে পারছে না হঠাৎ কী হয়েছে, ডুব দেওয়ার পর কিছু লোক আর ফিরে আসছে না। শুধু তাই নয়, ফিরে আসা লোকদের মধ্যে যারা সবার চেয়ে গভীরে গিয়েছিল তারা অদ্ভুত সব কাহিনি শোনাচ্ছে। লিকলিকে সবুজ সাপের মত কী যেন দেখেছে। একটা কিংবা দুটো নয়, অসংখ্য, গুণে শেষ করা যাবে না। কখনও বলছে সচল আগাছা, নরম সামুদ্রিক লতা: আবার শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদও বলছে। পানির ভিতর দিয়ে ওগুলো নাকি বেশ দ্রুতগতিতে সুপারসিক্রেট মার্কিন সামরিক ঘাঁটির কাছাকাছি গভীর পানিতে ছড়িয়ে পড়ছে। শিকড় নেই, ভেসে থাকে পানির নীচে।

সচল আগাছা? সেটা আবার কী জিনিস! কেউ জানে না কোত্থেকে আসছে, যাচ্ছেই বা কোথায়।

ওদের আলোচনা তখনও শেষ হয়নি, সুদূর ওয়াশিংটন থেকে নুমার ডিরেক্টর-জেনারেল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের ফোন এল। রানাকেই চাইছেন তিনি।

কলটা সার্ভে শিপ ট্রেসপাসের কমিউনিকেশন রুমে গিয়ে রিসিভ করল রানা। কুশলাদি বিনিময়ের পর নুমা চিফ রানাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোয়াজালিয়েন মার্কিন ঘাঁটির আশপাশে কী ঘটছে সে-সম্পর্কে ওকে কোনও ধারণা দেওয়া হয়েছে কি না।

রানা বলল, জী, শুনলাম। বলা হচ্ছে, সাগরের তলায় এক ধরনের সচল আগাছা ছড়িয়ে পড়ছে।

'সায়েন্স ফিকশন মনে হলেও, আসলে তা নয়, রানা,' বললেন নুমা চিফ ব্যাপারটা সিরিয়াস, এর পেছনে অসৎ কোনও মতলব আছে কারও। শুধু ওই এক জায়গাতেই নয়,

আরও বহু জায়গায় দেখা যাচ্ছে ওগুলো—ওই সর্পলতা।'

সর্পলতা! ভাবল রানা। কেমন যেন ভীতিকর একটা শব্দ। অ্যাডমিরাল আরও কী বলেন শোনার জন্য অপেক্ষা করছে ও।

'মার্কিন সুপারসিক্রেট সামরিক ঘাঁটির আশপাশে এ-ধরনের কিছু ঘটলে ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি না নিয়ে উপায় থাকে না আমাদের।' একটু বিরতি নিলেন তিনি। 'খুব খুশি হতাম তুমি যদি ব্যাপারটা একটু দেখতে, রানা।'

উত্তর দিতে ইতস্তত করছে রানা। মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বিপদে পড়েছে, আর সেই বিপদে বিসিআই-এর একজন এজেন্ট তাদেরকে সাহায্য করছে, এটা ওর বস্ রাহাত খান হয়তো অনুমোদন করবেন না।

অথচ নুমা চিফের কোনও প্রস্তাব আজ পর্যন্ত ফিরিয়ে দেয়নি রানা। ফিরিয়ে দিতে হবে বলে কোনওদিন কল্পনাও করেনি।

'সার,' বলল রানা, রাহাত খান ছাড়া খুব কম লোককেই সার বলে সম্বোধন করে ও। 'আমাকে বসের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন নুমা চিফ। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি জানতাম এ-কথাই বলবে তুমি।'

তখনই ট্রেসপাসের কমিউনিকেশন রুম থেকে বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকার সঙ্গে স্যাটেলাইট ফোনের সাহায্যে যোগাযোগ করা হলো।

বিসিআই চিফকে অফিসেই পাওয়া গেল, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে রানার মনে হলো তিনি যেন ওর ফোন পাওয়ার অপেক্ষাতেই ছিলেন।

রানার সব কথা ভাল করে শুনলেনও না রাহাত খান, তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন: 'সুন্দরবনের কয়েক জায়গাতেও ওই রহস্যময় লতা হামলা চালিয়েছে। প্রচুর হরিণ মারা গেছে বলে জানিয়েছে বাওয়ালিরা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে আমি

একমত, ব্যাপারটা তুমি দেখলে ভাল হয়। এই লতার উৎপত্তি সম্ভবত প্রশান্ত মহাসাগরের কোথাও। উইশ ইউ গুডলাক, এমআরনাইন।' যোগাযোগ কেটে দিলেন তিনি।

একটা রিসিভার নামিয়ে রেখে আরেকটা কানে তুলল রানা। ওর সাড়া পেয়ে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন, 'কী বললেন তোমার বস্?'

হ্যামিলটন ভাব দেখাচ্ছেন তিনি যেন কিছুই জানেন না, অথচ বেশ বুঝতে পারছে রানা, ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আগেই আলাপ সেরে রেখেছেন দুই ধুরন্ধর বৃদ্ধ। 'সব ঠিক আছে,' সংক্ষেপে জানাল রানা।

'কোয়াজ সামরিক ঘাঁটির কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার পিটার টিমসন। তাঁর এসওএস পেয়ে পেন্টাগন থেকে একজন ভাইস-অ্যাডমিরালকে পাঠানো হয়েছে ওখানে,' বললেন জর্জ হ্যামিলটন। 'এই বিপদটা মোকাবিলা করার জন্যে তিনিই অপারেশন চিফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ভাগ্যক্রমে তুমি তাঁকে চেনো, নুমার কয়েকটা অভিযানে একসঙ্গে কাজ করেছ তোমরা। ভাইস-অ্যাডমিরাল ডোনাল্ড ম্যাকমোহন...

'সর্বনাশ!' নুমা চিফের কথা শেষ হলো না, রীতিমত আঁতকে উঠল রানা। 'ওই ভদ্রলোক এখানে কেন? তাঁর সঙ্গে কাজ করতে হলে তো প্রতি মুহূর্তে শুধু বাধার মুখে পড়তে হবে, সার!'

অপরপ্রান্তে প্রথমে একটু হাসলেন নুমা চিফ, তারপর গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'তোমার তো এরকম প্রতিক্রিয়া হবার কথা নয়, রানা। সবাই তাঁর আচরণে বিরক্ত বোধ করলেও, তোমাকে তাঁর সমর্থনে যুক্তি খাড়া করতে দেখেছি আমি। তাঁর সম্পর্কে তোমার কিছু মন্তব্য এখনও আমার মনে আছে—একটু হয়তো ইমপালসিভ, খিটখিটে, সবকিছু উল্টো করে দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু মানুষ তো ভাল! যোগ্যতার তো কোনও অভাব নেই! কী, এ-সব তুমি বলোনি?'

আমতা আমতা করল রানা। 'হ্যাঁ, তা বলেছি, কিন্তু...আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'আর যদি দেখো ঠিক নেই,' দৃঢ়কণ্ঠে রানাকে আশ্বস্ত করে বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, 'আমাকে শুধু একবার জানিয়ো।'

'জী, তার বোধহয় দরকার হবে না, আশা করি মানিয়ে নিতে পারব আমি,' শুকনো গলায় বলল রানা।

'গুড,' বললেন নুমা চিফ। 'ভাইস-অ্যাডমিরাল ম্যাকমোহনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমিও একমত, আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত আদিবাসী ডাইভারদের ব্যাপারটা তদন্ত করা। উর্বশীকে সঙ্গে নিতে পার তুমি, আফটার অল একজন ন্যাভাল অফিসার। ওর বসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে—এই অপারেশনে নুমাকে সাহায্য করছেন ওঁরাও।'

'জী, ঠিক আছে।'

'আই উইশ ইউ গুডলাক, মাই সান,' বলে যোগাযোগ কেটে দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

নুমা চিফের পরামর্শ মেনে নিয়ে উর্বশীকে সঙ্গে নিয়েই কাজ শুরু করেছে রানা। পরবর্তী দুদিন এই দ্বীপে সেই দ্বীপে ডাইভার নিখোঁজ হওয়ার রহস্য খুঁজতে বেরিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত একেবারে গায়ের কাছে পরস্পরের উপস্থিতি উপভোগ করেছে ওরা।

প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে, সেটাকে অগ্রাহ্য করবার ফল কখনও ভাল হয় না। রানা বা উর্বশী, কেউ কোনও ঝুঁকি নেয়নি, সেই নিয়মের কাছে সানন্দে আত্মসমর্পণ করেছে।

পাঁচ

প্রশান্ত মহাসাগরের শান্ত ঢেউয়ের পিঠে সওয়ার হয়ে ধীর ভঙ্গিতে সাঁতার কেটে কোয়াজালিয়েন অ্যাটলের দিকে এগোচ্ছে ওরা দুজন।

'রানা!'

সাগরের নীল সারফেস কেটে একটা ডরসাল ফিন ছুটছে, ওদের কাছ থেকে দূরত্ব খুব বেশি হলে মাত্র পঞ্চাশ গজ।

'থামো,' বলল রানা। 'শান্ত থাকো।'

'হোয়াইট নাকি?' জানতে চাইল উর্বশী।

'শুধু ভেসে থাকো, একচুল নড়বে না।'

সীমাহীন সাগরের মাঝখানে নিঃশব্দে ভেসে রইল ওরা; কিন্তু না, ফাঁকি দেয়া যায়নি ওটাকে। ওদের চারপাশে অলস ভঙ্গিতে পানি কেটে বড়সড় লম্বাটে একটা রেখা তৈরি করল ফিনটা।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। একমাত্র কাজ দুরুদুরু বুকে একদৃষ্টে ফিনটার দিকে তাকিয়ে থাকা।

ঠোঁট না নেড়ে ফিসফিস করল উর্বশী। 'স্পিয়ার গান?'

'এই স্পিয়ার দিয়ে হোয়াইট শার্ক ঠেকানো যাবে না,' রানাও ঠোঁট না নেড়ে জবাব দিল। 'তবু তৈরি থেকো, কাছে এলে চোখ সই করবে।'

আগের মতই পানি কাটছে ফিন। বৃত্তাকারে ঘুরছে না হাঙরটা, বিরাট একটা বাঁক তৈরি করে খানিক পর পর পাশ

কাটাচ্ছে ওদেরকে, দূরত্ব কমে গেছে আগের চেয়ে—এখন বড়জোর পঞ্চাশ কি ষাট ফুট।

ফিসফিস করল উর্বশী। 'আমাদের দেখতে পায়নি।'

'এখনও।'

'ওগুলো ভাল দেখতে পায় না।'

'না।'

'ভাগ্যিস ওয়েট সুট পরিনি আমরা,' বলল উর্বশী। 'ওগুলো পরলে সিলের মত দেখায়।'

'সিল ওদের খুব পছন্দের খাবার,' বলল রানা।

বড় আকারের কয়েকটা ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে এল এক ঝাঁক পরপয়েজ—দেশি ভাষায় শুশুক। খাটো তেকোনা ডরসাল ফিন, গোলাকার ভোঁতা নাক আর ছোট আকৃতির দাঁত ওগুলোর, আসলে তিমিরই একটা প্রজাতি।

বড় একটা ঝাঁক। সাঁতরাচ্ছে, পানি ছিটাচ্ছে, খেলাচ্ছলে পরস্পরকে ধাওয়া করছে। ছোটবড় সব বয়সেরই আছে।

হোয়াইট শার্ক যতই হিংস্র হোক, সুস্থ কোনও পরপয়েজকে ধরতে পারবে না। তবে ওরকম একটা আশায় থাকতে দোষের কিছু নেই—কে জানে, ঝাঁকের মধ্যে এক-আধটা হয়তো আহত, কিংবা বাচ্চাগুলোর একটা আনমনে বড়দের চোখের আড়ালে চলে আসতে পারে।

লম্বাটে চক্কর বাদ দিয়ে পরপয়েজগুলোর পিছু নিল হোয়াইট শার্ক, সরল একটা রেখা ধরে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে তার ফিনটা।

'এবার কিছুক্ষণ,' বলল রানা, 'ব্রেস্টস্ট্রোক।'

'যতক্ষণ না ডাঙার কাছাকাছি পৌঁছাই।'

আবার সাঁতার শুরু হলো। বেশ কিছুক্ষণ ব্রেস্টস্ট্রোকের পর ক্রল করল ওরা একটানা আধঘণ্টা। বোঝা গেল, শারীরিক ফিটনেসের দিক থেকে কেউ কারও চেয়ে কম নয়। দুজনেই দূরপাল্লার অভিজ্ঞ সাঁতারু, সহজে ক্লান্ত হবে না।

একটা করে ঢেউ এসে ওদেরকে মাথায় তুলছে, তখন দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে ওরা। যেদিকেই তাকাচ্ছে, সারি সারি ঢেউ ছাড়া দেখবার কিছু নেই। এভাবে অনেকক্ষণ পার হয়ে গেল। দুজনেই বারবার চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে ফিন আছে কি না। না, ফিনও নেই; আশপাশে ডাঙাও নেই। ওরা সাঁতরাচ্ছে তো সাঁতরাচ্ছেই। শক্তির ভাণ্ডার তো আর অফুরন্ত নয়, ক্রমে ফুরিয়ে আসছে সেটা। সূর্যটা ডুব দিতে যাচ্ছে পশ্চিম সাগরে।

তারপর একসময় বহুদূরে ডাঙা দেখা গেল।

প্রথমে শুধু কয়েকটা নারকেল গাছের আবছা মাথা, যেন নীল ঢেউগুলোর গা থেকে মাথাচাড়া দিয়েছে। তারপর আকাশে গাছপালা গজাল, এক মুহূর্ত পর হারিয়ে গেল সেগুলো, পরবর্তী ঢেউয়ের মাথায় উঠতেই আবার ফিরে এল সব।

একটু পর চোখে পড়ল ছিটকে ওঠা সাদা ফেনার ফোয়ারা, রিফে বাধা পেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আরেকটু পর গাঢ় একটা ঝলক, ওটা রিফ। নারকেল গাছের মাথাগুলো রিফের ভিতরে, ফেনার পিছনদিকে।

অবশেষে রিফের গায়ে ব্রেকটা চোখে পড়ল, মুখ খোলা একটা প্যাসেজ। ওটা দিয়েই ভিতরে ঢুকতে হবে ওদেরকে।

'এটা বিগেজ চ্যানেল,' বলল উর্বশী। 'যতটুকু ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক উত্তরে রয়েছি আমরা।'

'কতটা?' জানতে চাইল রানা।

'কম করেও পনেরো কিলোমিটার।'

চট করে একবার সূর্যটাকে দেখে নিল রানা। অ্যাটলটার পিছনে, পশ্চিম আকাশের খুব নীচে ঝুলে রয়েছে ওটা। 'ওদিকে যাওয়ার উপায় নেই এখন, পৌঁছাবার অনেক আগেই রাত হয়ে যাবে,' সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ও। 'চলো, প্রবাল রিফের ভেতরে ঢুকি। প্রথম যে দ্বীপটা দেখব সেটাতেই আশ্রয় নেব আমরা।'

চওড়া চ্যানেল ধরে সাঁতরাচ্ছে ওরা। ফাঁকটা গলে প্রবাল

রিফের ভিতর ঢুকল। লেগুনটা বিশাল, সেটাকে ঘিরে রেখেছে অনেকগুলো নিচু প্রবাল দ্বীপ।

হঠাৎ ঝপ্ করে অন্ধকার নেমে এল। হাত তুলে কয়েকটা নারকেল গাছ আর সবুজ ঝোপ-ঝাড় দেখাল রানা, ওটাই সবচেয়ে কাছে। 'এখনই ডাঙায় উঠে পড়তে হবে,' বলল ও। 'একটু পর দ্বীপ বা রিফ কিছুই দেখা যাবে না।'

ডাঙার সাদা বালিতে উঠে আসবার পর দুজনেই খেয়াল করল, পা কাঁপছে ওদের। একটানা অনেকক্ষণ সাঁতরানোর ফল।

সৈকতের বালি এখনও গরম, ওখানে বসে কিছুক্ষণ হাঁপিয়ে নিল দুজন, যে-যার ফ্লিপার খুলল, কথা বলবার শক্তি নেই। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে গা। উর্বশীকে কাফ মাসল্ ডলতে দেখে বোঝা গেল ক্র্যাম্প ধরেছে পায়ে।

খানিক পর দুজনের শরীরেই কাঁপুনি ধরে গেল। সূর্য ডুবে যেতেই চারপাশ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। বোঝা গেল, ভাল ঠাণ্ডা পড়বে আজ রাতে।

কাঁপতে কাঁপতে পরস্পরের কাছে সরে এল ওরা। গায়ে গা ঠেকল। ঠাণ্ডায় হিহি করছে দুজন, ভয়ানক ক্লান্ত, চুপচাপ থাকায় হাঙরের স্মৃতি ফিরে এল, সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল সাগরের তলায় একটা অদৃশ্য শক্তি ওদেরকে আটকে রেখেছিল–তখনকার ভয়টা আবার এখন অনুভব করতে পারছে, মৃত্যুর কাছাকাছি হওয়ার সেই অভিজ্ঞতা কোনওদিন ভুলবার নয়।

হঠাৎ করে পরস্পরকে পেতে ইচ্ছে হলো ওদের।

'রানা?'

'আর কোনও ভয় নেই, উর্বশী,' আশ্বস্ত করল রানা। 'এসো, তোমার পা-টা ম্যাসাজ করে দিই।'

'আমরা ডুবে যেতে পারতাম। হাঙরটা আমাদেরকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলতে পারত।'

'তবে এখন আর পারবে না।'

'কিন্তু আমরা প্রায় মারা যাচ্ছিলাম।'

'প্রায়।'

'রানা, আমি মরতে চাই না।'

'আমিও না।'

উর্বশীর কাফ মাসল্ ম্যাসাজ করছে রানা। পিছনে হেলে দু'হাতে ভর দিয়ে চোখ বুজে পুরুষের স্পর্শ উপভোগ করছে উর্বশী। লোভনীয় ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে রয়েছে ওর বুক, ও যে সেটা জানে না, তা নয়। পায়ের গোছা ডলতে ডলতে রানার হাত উরু বেয়ে উঠে আসতেই চোখ মেলল উর্বশী।

'কী হচ্ছে!' ভুরু কুঁচকে শাসনের ভঙ্গিতে চাইল ও রানার চোখে, মুখে হাসি।

'কই, কিছু না তো!' বলল রানা। ওর হাত উঠছে আরও। 'এখানেও ব্যথা করছে?'

'খুব!'

একটু পর উঠে দাঁড়াল রানা, তারপর ঝুঁকে দু'হাতে ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে চুমো খেল ঠোঁটে। সক্রিয় ভাবে সাড়া দিল উর্বশী।

ওকে নিয়ে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের পিছনে চলে এল রানা, যেখানে টানা বাতাস নেই। কয়েকটা নারকেল গাছের নীচে শুকনো, গরম বালির উপর নামাল ওকে। এদিকের বালি ঝুরঝুরে, নরম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে টেরই পায়নি, সজাগ হয়ে প্রথম কিছুক্ষণ বুঝতে পারল না রানা, কোথায় ও। ওর হাতে ধরা একটা নরম, ঠাণ্ডা হাত। চট্ করে মনে পড়ে গেল সব। বালির উপর পাশাপাশি চিত হয়ে শুয়ে আছে দুজন। শীতের প্রকোপ বেড়েছে। উর্বশীর দিকে ফেরার সময় রানা দেখল আকাশে চাঁদ উঠেছে। সাগর থেকে উঠে আসা বাতাস নারকেল গাছের পাতাগুলোকে আলোড়িত করছে। যেন চামর দুলছে ওদের উপর।

'আমরা বেঁচে আছি,' বিড়বিড় করল উর্বশী।

'হ্যাঁ।'

'সব মিলিয়ে, বেঁচে থাকার কোনও তুলনা হয় না।'

'কিছু সুবিধে তো অবশ্যই আছে। তবে আপাতত বেঁচে থাকাটা সার্থক হত পেট ভরানোর মত কিছু পেলে। তারপর একটা বিছানার ব্যবস্থা করা গেলে তো সোনায় সোহাগা!'

'গাছে উঠে দেখতে পার দু'চারটে নারকেল পাড়া যায় কি না। তবে বিছানা...অনেক বেশি চাওয়া হয়ে যাচ্ছে...বোধহয় বালির উপরই কাজ চালিয়ে নিতে হবে।' রানা তার দিকে তাকাতে হেসে উঠে দ্রুত বলল উর্বশী, 'এই, না! আমি ঠিক তা বোঝাতে চাইনি!'

'কী বোঝাতে চাওনি?' ন্যাকা সাজার ভান করল রানা।

'না বুঝে থাকলে বুঝে আর কাজ নেই তোমার,' আবার অকারণে হেসে উঠল উর্বশী।

বালির উপর সিধে হলো রানা। 'একটা টেলিফোন পেলে কাজ হত,' বলল সে। 'ভাইস অ্যাডমিরালকে রিপোর্ট করতে পারতাম। চলো, দেখি লোকবসতি পাওয়া যায় কি না।'

বিকিনিটা খুঁজে নিয়ে পরল উর্বশী, রানাও পরল ওর সুইমিং ট্রাঙ্ক।

নারকেল গাছের নীচে ঘন ঝোপ, ওগুলোর ভিতর দিয়ে সাবধানে হাঁটছে দুজন। একশো গজের মত এগিয়ে আবার সাগরের মুখোমুখি হলো ওরা। কোথাও লোকবসতির চিহ্ন নেই। পানির কিনারা ধরে হেঁটে ফিরে এল যেখান থেকে শুরু করেছিল।

'একেবারেই ছোট্ট দ্বীপ দেখছি!' বলল উর্বশী।

'নাম কী?'

'আমি কী করে বলব? কোয়াজ অ্যাটলে এরকম দ্বীপ আছে তিরানব্বুইটা।'

'আর এটা বোধহয় ওগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট।'

পানির উপর, কাছাকাছি, আরেকটা দ্বীপ দেখতে পেল ওরা

চাঁদের আলোয়–ওদেরটার চেয়ে একটু বড়, মাঝখানে প্রকাণ্ড রেইডার গম্বুজ। কালো আকাশের গায়ে গম্বুজটাকে বিরাট একটা বলের মত লাগছে। ওখানেও আলো নেই কোথাও।

'ওটা বিগেজ দ্বীপ হতে পারে,' বলল উর্বশী।

'পারে, তবে ওখানে রাতে কেউ থাকে না,' রানার মন্তব্য।

'চলো, উল্টোদিকটা দেখি,' বলল উর্বশী।

দ্বীপটার আরেক দিকে চলে এল দুজন। ওদের সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় লম্বা শান্ত নিস্তরঙ্গ লেগুন পড়ে আছে।

'আমার ধারণা, আশপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে জনবসতি নেই,' বলল উর্বশী।

'অর্থাৎ, পৃথিবীতে কেউ নেই, শুধু তুমি আর আমি?' বলে দু'পাশে দু'হাত ছড়াল রানা। খিলখিল হেসে ধরা দিল উর্বশী ওর বাহুডোরে।

একটু চুপ করে থেকে বলল ও, 'বড্ডো শীত! একটা আশ্রয় পেলে দারুণ হত।'

'অন্ধকারে সাঁতরানোর কথা ভাবছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আশপাশে হোয়াইট শার্ক আছে জানার পরেও? রিফ আর দূরত্বের কথা না হয় বাদই দিলাম।'

'তা হলে ঘুমোবার কী ব্যবস্থা?' জানতে চাইল রানা।

'এ দ্বীপেই বিছানা পাততে হবে।'

'একবার তো ঘুমিয়ে উঠলাম, চলো আবার ঘুমের প্রস্তুতি নেয়া যাক,' নিঃশব্দ হাসির সঙ্গে বলল রানা। 'এই, না! আমি ঠিক তা বোঝাতে চাইনি!'

'কী বোঝাতে চাওনি?' এবার ন্যাকা সাজার ভান করল উর্বশী।

'না বুঝে থাকলে বুঝে আর কাজ নেই তোমার,' হেসে উঠে বলল রানা।

'বেশ, তা হলে তা-ই করি এসো!' তার হাসির সঙ্গে যোগ দিয়ে উর্বশী বলল।

তা-ই করল ওরা। তবে তার আগে গোটা কয়েক নারকেল পেড়ে খেয়ে নিল শাঁস ও পানি। অনেকক্ষণ পর বিভিন্ন গাছের পাতা দিয়ে তৈরি পুরু বিছানায় শুয়ে এমনকী ঘুমিয়েও পড়ল দুজনে।

সদ্য উঠে আসা উজ্জ্বল সূর্যটা রক্তলাল ফুটবলের মত ঝুলে আছে পুব দিগন্তে। ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর চোখ মেলল রানা। দেখল একা সে।

ধীরে ধীরে উঠে বসল, গা থেকে খসে পড়ল বালি আর শুকনো পাতা। চারদিকে তাকিয়ে উর্বশীকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না।

উর্বশীর ডাইভিং মাস্ক, স্পিয়ার গান, সুইম ফিন ও বিকিনি বালির উপর পড়ে রয়েছে, ঘন ঝোপের ভিতর ওরা যেখানে ঘুমিয়েছে তার পাশেই।

হাত বাড়িয়ে নিজের স্পিয়ার গানটা ধরল রানা, লাফ দিয়ে সিধে হলো।

খুদে দ্বীপের শেষপ্রান্তে, লেগুনের পানিতে নড়াচড়া টের পেয়ে ঘন ঝোপের ভিতর দিয়ে ক্রল করে এগোল রানা, তারপর এক জায়গায় থেমে সাবধানে ডালপালা সরিয়ে পশ্চিম দিকে তাকাল। কিছুই দেখতে পেল না।

দিনের প্রথম আলোয় লেগুনের সারফেস অনেক দূর পর্যন্ত নিভাঁজ হয়ে রয়েছে।

তারপর সারফেস ভেঙে মাথা তুলল মেয়েটি, তার সঙ্গে উথলে উঠল প্রচুর পানি।

উর্বশী দাশা, বিবস্ত্রা এক অপরূপ অপ্সরা; পানি ঝরছে সারা শরীর থেকে; একহারা একটা ফরসা পরপয়েজের মত আনন্দে

অধীর হয়ে পানিতে ডিগবাজি খাচ্ছে, লাফাচ্ছে, ছুটছে আর... ছেলেমানুষের মত যা খুশি তাই করছে।

'রানাকে দেখল ও। 'রানা! চলে এসো!'

হেসে উঠল রানা। হাতের স্পিয়ার গান বালিতে নামিয়ে রেখে সিধে হলো, কোমর থেকে ট্রাঙ্ক খুলে ডাইভ দিল ঝলমলে লেগুনের স্ফটিক স্বচ্ছ পানিতে।

দ্রুত সাঁতার কেটে ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে উর্বশী। দ্রুত ক্রল শুরু করল রানা, উর্বশীর পিছু নিয়ে সাঁ সাঁ করে এগোচ্ছে। কিন্তু তারপরও দুজনের মাঝখানের দূরত্ব এতটুকু কমল না।

খুদে দ্বীপের কোণ ঘুরল উর্বশী, তারপর পানির উপর চিৎ হয়ে থেকে রানাকে কাছে আসবার সুযোগ দিল। ওকে চুমো খেল রানা, তারপর ঠাণ্ডা ও স্বচ্ছ পানির মধ্যে অনেকক্ষণ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থাকল দুজন—বেঁচে থাকার আনন্দে।

ঠিক সেই সময় অকস্মাৎ বিকট শব্দে আকাশ ছুঁতে চাইল লেগুনের মাঝখানের বিপুল জলরাশি, প্রকাণ্ড বৃত্তাকার নায়েগ্রার মত অগাধ বৃষ্টি নেমে আসছে। বিশাল ঢেউ ছুটে আসছে ওদের দিকে। পড়ি-মরি করে ছুটল ওরা ডাঙার দিকে।

'ওহ্ গড!' দম ফিরে পাওয়ার পর ফিসফিস করল উর্বশী। 'কী হলো, রানা?'

বিস্ফোরণের শব্দ এখনও মিলিয়ে যায়নি, ঝমঝম বৃষ্টিও থামেনি, রানা বলল, 'ওটা সেই আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ছোঁড়া আইসিবিএম। কোয়াজালিয়েন আসলে টার্গেট প্র্যাকটিস করার জন্যে মার্কিনিদের একটা চাঁদমারি।'

'গড! ওরা নির্ভুল তাক করতে পারে, সেজন্যে ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত আমাদের।'

'বিশেষ করে বোতামটা যেখানে পাঁচ হাজার মাইল দূরে,' বলল রানা। 'তবে এক্ষেত্রে চিনাদের কৃতিত্ব আরেকটু বেশি।'

'কী রকম?' জানতে চাইল উর্বশী।

'সিচোয়ান অ্যাটলও প্র্যাকটিস করার জন্যে চিনাদের একটা টার্গেট,' বলল রানা। 'বেইজিঙের একটা মিসাইল ঘাঁটি থেকে এক্সপেরিমেন্টাল আইসিবিএম ছোঁড়া হয় ওখানে, প্রায় চার হাজার মাইল দূর থেকে।'

'কৃতিত্বটা কী?' অধৈর্য হয়ে উঠল রানার সঙ্গিনী।

'মার্কিনিরা লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ ঠিকই, কিন্তু ওদের মিসাইল অন্ধ,' বলল রানা। 'সেমসাইড হওয়ার, কিংবা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার ভয় আছে—এই যেমন, ওটা আমাদের ঘাড়ের ওপর পড়তে পারত। কিন্তু চিনাদের মিসাইল অন্ধ নয়।'

'কী রকম?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল ইন্দোনেশিয়ান নেভির ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট।

'ওদের ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়,' বলল রানা। 'মিসাইল কোথায় আঘাত হানতে যাচ্ছে স্যাটেলাইটের চোখ দিয়ে তা দেখতে পায় বেইজিং ঘাঁটি, সেখানকার একটা ইঁদুরও ওদের চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না। যদি দেখে নিরীহ মানুষের ওপর পড়তে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ওটার গতিপথ বদলে দিতে পারবে ওরা।'

'থ্যাঙ্কস, রেড চায়না!' উর্বশীর কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল।

'সারা দুনিয়ার শান্তিপ্রিয় মানুষের মধ্যে সেজন্যেই তো চিনের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। ওরা এরকম বহু কিছুতেই আর সবার চেয়ে অনেক বেশি মানবিক।'

সিধে হয়ে বিকিনি পরছে উর্বশী। 'বোতামের কথা যখন উঠল, চলো, তৈরি হয়ে রিপোর্ট করি ভাইস-অ্যাডমিরালকে।'

'সাঁতার কাটতে চাও?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'নাকি রেইডার গম্বুজের ওখানে কপ্টার এলে পাইলটের কাছে লিফট চাইবে?'

'লং ডিসট্যান্স সুইমিং যথেষ্ট হয়েছে, আর না,' বলল উর্বশী।

'বেশ, চলো তা হলে, ওই দ্বীপেই উঠি গিয়ে।'

অল্প একটু সাঁতরে কাছাকাছি দ্বীপটায় উঠে অপেক্ষাই করছে ওরা। আধ ঘণ্টাও পার হয়নি, একটা কপ্টারকে দেখা গেল, নিচু এক সারি দ্বীপের মাথা ছুঁয়ে ছুটে আসছে। বিশাল লেগুনটাকে এই দ্বীপগুলোই ঘিরে রেখেছে।

পোশাকই বলে দিল, রেইডার ইকুইপমেন্ট অপারেট করে সিভিলিয়ান এক লোক। হেলিকপ্টারের পাইলট ইউ.এস নেভির ইউনিফর্ম পরে আছে। দুজনেই তারা ফিন ও স্পিয়ার গান সহ অর্ধনগ্ন দুজন ডাইভারকে দেখে হাঁ হয়ে গেল।

তাদের হাঁ বন্ধ হলো রানা আর উর্বশীর পরিচয়-পত্র ও নুমার ইস্যু করা টপ সিক্রেট রেইটিং কার্ড দেখে। ওগুলো ওরা যে-যার সুইম-সুটের ওয়াটারপ্রুফ পকেট থেকে বের করল।

সিভিলিয়ান লোকটা অবশ্য তারপরও চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল, তবে পাইলট তাড়াহুড়ো করে কপ্টারে তুলে নিল ওদেরকে। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিকে রওনা হলো যান্ত্রিক ফড়িং, ফিরে যাচ্ছে কোয়াজালিয়েন দ্বীপে।

রিফের সাদা রেখা ধরে খুব নীচ দিয়ে উড়ছে কপ্টারটা। ওদের চারদিকে বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগর। পিছনে ফেলে আসা দ্বীপগুলো এরইমধ্যে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, ছোটবড় আরও অনেক দ্বীপ দেখা যাচ্ছে সামনে, সবগুলো মিলে তৈরি করেছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অ্যাটল। দ্বীপগুলোর মাঝখানে ম্লান নীল শান্ত পানি নিয়ে পড়ে আছে বিশাল লেগুনটা।

আরও কয়েকটা খালি দ্বীপ দেখল রানা, কয়েকটা দ্বীপে রেইডার গম্বুজ রয়েছে, রয়েছে বড় আকারের ট্র্যাকিং স্যাটেলাইট সসার। বড় একটা দ্বীপ দেখে চিনতে পারল ও।

ওটার নাম ইবায়ি দ্বীপ, কোয়াজ দখল করবার পর প্রায় সব লোকজনকে ওখানেই সরিয়ে দেয়া হয়।

তারপর কাছে চলে এল কোয়াজ।

ছয়

আর্মি হেডকোয়ার্টার-এর হেলিপ্যাডে নামবার আগে শূন্যে স্থির হয়ে ভেসে রয়েছে কপ্টারটা, নীচে তাকিয়ে প্রবাল দ্বীপটা দেখছে রানা ও উর্বশী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানি সৈন্যদের কাছ থেকে ইউ. এস আর্মি কেড়ে নিয়েছিল এই দ্বীপ। আকারে চার বর্গমাইল, চারপাশে সারি সারি নারকেল গাছ, এখানে সেখানে পুরনো জাপানি বাঙ্কার।

কোয়াজে তিন হাজারের মত আমেরিকান বাস করে, তাদের মধ্যে মাত্র ত্রিশ-বত্রিশজন সামরিক বাহিনীর লোক। বাকি সবাই ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান ইত্যাদি, পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকে।

কোয়াজকে ওরা ছোট একটা মার্কিন শহরের মত করে গড়ে নিয়েছে। দু'দুটো নাইন হোলস গলফ কোর্স আছে এখানে, আরও আছে একজোড়া সুইমিং পুল, কয়েকটা বার, একটা নাইট ক্লাব, বোট ক্লাব ইত্যাদি।

হাফপ্যান্ট পরা আদিবাসী কিছু লোককে ট্রেনিং দিয়ে রেইডার, অপটিকস, মিসাইল গাইডেন্স ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ করে তোলা হয়েছে।

ছোট্ট এই দ্বীপটায় কয়েক বিলিয়ন ডলারের ইকুইপমেন্ট বসানো হয়েছে। প্রকাণ্ড ডিশের সাহায্য নিয়ে এখানকার রেইডার সিস্টেম সারা দনিয়ার উপর চোখ বুলাচ্ছে, বিশেষ করে প্রতিদ্বন্দ্বী

চিনের দিকেই বেশি নজর দেওয়া হয়।

ঘণ্টায় সতেরো হাজার মাইল গতিতে ছুটে যাওয়া, দু'হাজার মাইল দূরের চিনা মিসাইলকে দেখতে পাওয়ার মত শক্তিশালী টেলিস্কোপ আছে এখানে। এখানে বসে সেই মিসাইলের পরিষ্কার ফটোও তুলতে পারে ওরা।

কোয়াজের তীর থেকে খুব বেশি দূরে নয়, একটা চিনা ইলেকট্রনিক-সার্ভেইলান্স শিপ সারাক্ষণ মোতায়েন রাখা হয়েছে সাগরে। কোয়াজ থেকে কোড করা যে-সব সামরিক ডেটা আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় পাঠানো হয় তার সবই পিক করে চিনারা।

চিনাদের বোকা বানাবার জন্য প্রায়ই ভুল-ভাল তথ্য পাঠায় ওরা। তবে চিনাদেরকে আদৌ বোকা বানানো যায় কি না, তা কারও জানার সুযোগ হয়নি এখনও।

বরং চিনারা এই মাত্র ক'দিন আগে আশ্চর্য একটা সফল এক্সপেরিমেন্ট ঘটিয়ে মার্কিনিদের জানিয়ে দিয়েছে, মিসাইল টেকনলজিতে ওদের চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়েই আছে তারা।

পরীক্ষাটা ছিল এরকম: বেইজিং থেকে একটা আনআর্মড আইসিবি মিসাইল ছোঁড়া হলো সিচোয়ান অ্যাটলকে লক্ষ্য করে।

দশ মিনিট পর সিচোয়ান থেকে একটা অ্যান্টি-আইসিবিএম, অর্থাৎ ডিফেন্ডার মিসাইল ছোঁড়া হলো।

নতুন একটা ইনফ্রারেড হোমিং সিস্টেম ব্যবহার করে, তাপ-সন্ধানী ডিফেন্ডার মিসাইল আইসিবিএম-এর ওয়রহেডকে ধরে বসল প্রশান্ত মহাসাগরের একশো মাইল উপরের আকাশে। সংঘর্ষের ফলে বিস্ফোরক আর আলোর যে বিস্ফোরণ ঘটেছে, কোয়াজ দ্বীপের আলট্রাসেনসিটিভ সেনসর স্ক্রিনে পরিষ্কার দেখা গেছে সব।

রানা ও উর্বশীকে নিয়ে নীচের প্যাডে নেমে আসছে কপ্টার। আপাতদৃষ্টিতে যে-কোন সাধারণ, শান্তিপূর্ণ শহরের মতই লাগছে

কোয়াজকে। তবে না, ছোট্ট এই স্বর্গে সংকট দেখা দিয়েছে।

হেলিপ্যাড থেকে দুজনেই ওরা যে-যার কোয়ার্টারে ফিরল। শাওয়ার সেরে কাপড়চোপড় পরল, তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে অফিসার্স ক্লাবে দেখা করল আবার। ওখানে, রেস্তোরাঁয় বসে, নাস্তা সারল ওরা।

খাওয়া শেষ হতে কাছাকাছি একটা অফিস বিল্ডিঙে চলে এল দুজন। এখানেই ওদেরকে রিপোর্ট করতে হবে।

অপারেশন-চিফ ভাইস-অ্যাডমিরাল ডোনাল্ড ম্যাকমোহনের চেম্বারে ঢুকতে যাচ্ছে ওরা। প্রথমে বাইরের একটা অফিস কামরায় ঢুকল, ওদেরকে দেখে লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল মাস্টার সার্জেন্ট।

'আপনাদেরকে সেই কাল বিকেল থেকে খুঁজছেন ভাইস-অ্যাডমিরাল। আসুন,' বলে চেম্বারের দরজায় নক করল সে। 'মিস্টার মাসুদ রানা, সার, সঙ্গে মিস ইন্দোনেশিয়া।'

'লোকটা পাগল নাকি?' রানার কানের কাছে ফিসফিস করল উর্বশী।

'তা জানি না,' রানাও নিচু গলায় বলল, 'তবে ওর সঙ্গে আমি একমত।'

গম্ভীর ও কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল চেম্বার থেকে। 'এতক্ষণে আসতে মর্জি হলো হুঁজুরদের? কী সব লোকের সঙ্গে যে কাজ করতে হয়! যত্তো সব! পাঠিয়ে দাও।'

একপাশে সরে দাঁড়াল সার্জেন্ট, চোখ মটকাল; তাকে পাশ কাটিয়ে চেম্বারে ঢুকল উর্বশী ও রানা।

কামরাটা সাজানোর মধ্যে নৌবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সুরুচির ছাপ পাওয়া যাচ্ছে।

ডেস্কটা খুব বেশি বড় নয়, তাতে স্যাটেলাইট ফোন ছাড়া অ্যান্টেনা সহ একটা মিনি রেডিও সেটও রয়েছে।

ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন তিনি, তাঁব পিছনের

দেয়ালে সাদা র‍্যাক, সেগুলোয় আমেরিকান নেভির যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিনের খুদে সংস্করণ সাজিয়ে রাখা হয়েছে–এক সময় এইসব জলযানের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন ভাইস অ্যাডমিরাল ডোনাল্ড ম্যাকমোহন।

বাম দিকে খোলা জানালা, নারকেল গাছে ঘেরা লেগুনের ম্লান সবুজ পানি ভারি সুন্দর লাগছে।

কোয়াজ অ্যাটলের একটা খোলা ম্যাপ থেকে চোখ তুলে ভ্রূ জোড়া কপালের শেষ প্রান্তে পাঠিয়ে ওদের দিকে তাকালেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'আপনারা দুজন কোথায় ছিলেন বলুন তো? এদিকে আমি...'

কাঠামোটা ঠিক যেন পাতা ও কঞ্চি ছেঁটে নেয়া চিকন একটা বাঁশ। আধ-পাকা গোঁফ জোড়া চওড়া হলেও, দুই প্রান্ত চোখা। লম্বাটে নীল চোখ, কীভাবে যেন অসম্ভব সরু করে তাকাতে পারেন। পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরে আছেন।

গুরুগম্ভীর গলা শুনে উর্বশী ও রানার মনে হলো, যেন তাঁর চেয়ে তিনগুণ চওড়া কোনও বুকের ভিতর থেকে বেরিয়েছে আওয়াজটা।

'এদিকে আপনি...কী, মিস্টার ম্যাকমোহন, সার?' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে জিজ্ঞেস করল উর্বশী, কথার সুরে বিনয়ের কোনও অভাব নেই।

'অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছি!' বললেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'আবার কী!'

'কিন্তু,' শান্ত সুরে বলল রানা, 'আমি তো আপনাকে টেলিফোনে জানিয়েছি যে ইবায়ি ছাড়িয়ে রিফের ওদিকটা চেক করতে যাব আমরা।'

'কিন্তু জানাননি যে কাজটায় চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগবে। শুনুন, মিস্টার মাসুদ রানা, নুমার সঙ্গে কাজ করার সময় কার কাছে রিপোর্ট করবেন তা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই;

কিন্তু যতক্ষণ আপনি আমার সঙ্গে কাজ করবেন, দিনে অন্তত তিনবার রিপোর্ট করতে ভুলবেন না। কে কোথাকার ইন্টেলিজেন্স উইযার্ড, কে নেভির চ্যাম্পিয়ান এসপিওনাজ এজেন্ট, এ-সব আমি জানতে চাই না–বিশেষ করে নাক চ্যাপ্টা বিদেশী শত্রুরা যেখানে দোরগোড়ায় উঁকি-ঝুঁকি মারছে। আমাকে জানতে হবে কখন কে কী করছে। পরিষ্কার, মিস্টার রানা? এবং মিস ড্যাসা?'

রানা সম্পর্কে যতটুকু শুনেছে উর্বশী, তাতে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকল সে–এরকম রগচটা কোনও কর্মকর্তার সঙ্গে অবশ্যই কাজ করবে না ও। সন্দেহ নেই, অপারেশনের শুরুতেই কঠিন সংকটে পড়তে যাচ্ছে ওরা।

কিন্তু উর্বশীর ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণিত করে রানা বলল, 'হ্যাঁ, মিস্টার ম্যাকমোহন–আয়নার মত পরিষ্কার।'

একা শুধু উর্বশী নয়, ভাইস অ্যাডমিরালও রানার দিকে একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন।

'এবার যদি দয়া করে রিপোর্ট করার সুযোগ দেন,' আবার বলল রানা, 'আপনার তা হলে জানার সুযোগ হয় কী কারণে দেরি হলো আমাদের।'

'বসুন।' ইঙ্গিতে খালি দুটো চেয়ার দেখালেন ম্যাকমোহন। বসল ওরা। 'বলুন।'

'ইবায়ির ডাইভাররা গভীর পানিতে সবুজ সাপের মত লিকলিকে আগাছা দেখেছে বলে শোনা যাচ্ছে,' রিপোর্ট করছে রানা। 'আমরা ব্যাপারটা চেক করতে গিয়েছিলাম। আপনি জানেন কিছু ডাইভার ডুব দেয়ার পর ফিরে আসেনি। তাই ওখানে, রিফের খোলা দিকে, ডুব দিই আমরা। প্রায় সারাটা দিন কিছুই দেখলাম না। কোনও রকম বিপদেও পড়িনি।'

রানা থামতে উর্বশী বলল, 'আমরা যখন হাল ছেড়ে দিয়ে সারফেসে ওঠার কথা ভাবছি, এই সময় দেখতে পেলাম ওটাকে। না, লিকলিকে কিছু নয়। বিরাট তিমির মত, একটা সাবমেরিন।'

'সাবমেরিন?' সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হয়ে গেল শিরদাঁড়া, ভাইস অ্যাডমিরাল ম্যাকমোহন কটমট করে রানা আর উর্বশীর দিকে পালা করে তাকাচ্ছেন, ওটাকে দেখে ওরা যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছে। 'চিনা? কোয়াজের আশপাশে একটা চিনা সাবমেরিন ঘোরাফেরা করছে? জানতাম, এ আমি জানতাম! পেন্টাগনকে আমি বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি...'

'ওটা আসলে অনেকটা সাবমারসিবলের মত,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'সাধারণত ডিপ-ডাইভিং রিসার্চের কাজে ব্যবহার করা হয়।'

'আর ওটা চিনাও নয়,' বলল উর্বশী।

'চিনা নয় মানে?' খেঁকিয়ে উঠলেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'চিনা হতে বাধ্য! ওদেরকে আমি বহু বছর ধরে সন্দেহ করে আসছি! রাশিয়া স্রেফ মরা একটা ঘোড়া, কাজেই শত্রু বলতে এখন শুধু চিনকেই বুঝতে হবে! ওদের ওই সার্ভেইলান্স শিপটা নেহাতই একটা ডাইভারশন। ওখানে ওদের এক ঝাঁক সাবমেরিন আছে, যে-কোনও মুহূর্তে অ্যাটাক করার জন্যে রেডি।'

'দুনিয়ায় যত রকম সাব আছে সব আমি চিনি, সার,' বলল উর্বশী, বিরক্তি চেপে রাখবার চেষ্টা করেও পুরোপুরি সফল হলো না। 'আমার জানামতে, চিনা টাইপের সঙ্গে একদমই মেলে না এটা।'

'তা হলে কোন্ টাইপের সাব ওটা, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ড্যাসা?' ধমকে উঠলেন ভাইস অ্যাডমিরাল।

'এই টাইপের সাব আগে কখনও দেখিনি আমি।'

'তার মানেই তো আপনি বলছেন ওটা চিনা হতে পারে, আবার অন্য যে-কোনও দেশেরও হতে পারে!'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল উর্বশী। 'চিনাদের নতুন একটা টাইপ হতে পারে, তবে আমি তা মনে করি না। আরেকটা কথা, সমুদ্রের প্রায় ষাটফুট নীচে ওটা থেকে যে ডাইভাররা বেরিয়ে আসে,

তাদের কারও সঙ্গে এয়ার ট্যাংক ছিল না।'

উর্বশীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'তা সম্ভব নয়! সব ডিপ-সি ডাইভারকে এয়ার ট্যাংক ব্যবহার করতে হয়। আমি বলতে চাইছি, ফ্রি ডাইভার হলে অবশ্যই তাকে...কি বললেন, ডাইভার? ডাইভার কোত্থেকে এল?'

প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় কী কী দেখেছে ওরা, বিস্তারিত সবই ডোনাল্ড ম্যাকমোহনকে জানাল রানা, শুধু উর্বশীর সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলো বাদ দিয়ে।

'কী! ওরা আপনাদেরকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করেছে?' চোখ রাঙিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ভাইস অ্যাডমিরাল।

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'পাঁচজন ছিল ওরা, দুজন আমাদের হাতে মারা পড়েছে।'

রানা থামতেই উর্বশী আবার বলল, 'এবং সত্যি ওদের সঙ্গে এয়ার ট্যাংক ছিল না।'

'তা সম্ভব নয়,' পুনরাবৃত্তি করলেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'স্রেফ গাঁজাখুরি গল্প। আর কী যেন বললেন, ম্যাগনেটিক ফোর্স ফিল্ড? আপনাদের ধারণা, এ-সব স্টার ওঅর হাবিজাবি আমি গিলব?'

'স্টার ট্রেক,' বলল উর্বশী। 'ফোর্স বিম ব্যবহার করা হয় স্ট্রার ট্রেকে, স্টার ওঅরে নয়।'

'ওই হলো আর কী,' ধমকে উঠলেন ভাইস অ্যাডমিরাল।

'মোটকথা অদৃশ্য একটা শক্তি গভীর সমুদ্রে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল আমাদের,' বলল উর্বশী। 'আর সেটা আসছিল ওই সাবমারসিবল থেকে।'

'ওটা ম্যাগনেটিক ফোর্সই ছিল, ভাইস অ্যাডমিরাল,' নরম সুরে বলল রানা। 'এয়ার ট্যাংক খুলে ফেলে দেয়ার পর ওর কবল থেকে মুক্ত হই আমরা।'

'অ্যাটল থেকে দশ মাইল দূরে,' জানাল উর্বশী। 'সেজন্যেই আপনাকে কাল বা আজ সকালে রিপোর্ট করতে পারিনি আমরা।'

চোখ-মুখ কুঁচকে ওদের কথা শুনলেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'ওই ডাইভাররা,' বললেন তিনি। 'আপনারা যাদেরকে মেরে রেখে এসেছেন। তাদের লাশ উদ্ধার করে আনার কোনও সুযোগ আছে? কিংবা ইকুইপমেন্টগুলো? যাতে প্রমাণ করা যায় ওরা চিনা?'

'আমার সন্দেহ আছে,' বলল রানা। 'এখনও যদি হাঙর না খেয়ে থাকে, স্রোতের টানে ভেসে গেছে খোলা সাগরে।'

'কিংবা হয়তো ওই সাবটা ফিরে এসে নিয়ে গেছে সব,' বলল উর্বশী। 'কেন যেন আমার মনে হচ্ছে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করবে ওরা।'

'চিনা,' বললেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'এর আর কোনও ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, নতুন কিছু অস্ত্র বানিয়ে রেডি হয়েছে ওরা, যে-কোনও দিন হামলা চালিয়ে দখল করে নেবে কোয়াজ। গত দশ বছর ধরে ওয়াশিংটনকে যে-কথা বলে আসছি, সেটাই সত্যি হতে চলেছে এখন।'

উর্বশী ও রানা নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল।

ওদের দিকে না তাকিয়ে বড় করে একটা শ্বাস নিলেন ম্যাকমোহন, তারপর আবার শুরু করলেন। 'ব্যাপারটা এখনই রিপোর্ট করা দরকার। ওয়াশিংটন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জাতিসংঘ আর বেইজিঙের কাছে প্রতিবাদ জানাক। সারা দুনিয়ার মানুষকে আমরা দেখিয়ে দেব চিনা বেজন্মারা আসলে কত্তোবড় শয়তান!'

চেয়ার ঘুরিয়ে টেলিফোনের দিকে ফিরলেন তিনি। 'একঘণ্টার মধ্যে আমি আপনাদের লিখিত রিপোর্ট চাই।'

রানা আর উর্বশী চেয়ার ছেড়ে উঠছে না।

'মিস্টার ম্যাকমোহন, রিপোর্টে চিনের বিরুদ্ধে আমরা কিছু লিখব না,' স্পষ্ট করে জানাল রানা।

'এ-ও লিখব না যে ওটা আপনাদের কোয়াজ ইনস্টলেশনের জন্যে কোনও রকম হুমকি ছিল,' বলল উর্বশী।

'কারণ?' কর্কশ গলায় জানতে চাইলেন ভাইস অ্যাডমিরাল।

'কারণ সেটা যুক্তিসিদ্ধ হবে না, হবে ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র,' জবাব দিল উর্বশী। 'আমরা শুধু ফ্যাক্টস নিয়ে কাজ করি, সার।'

লাল হয়ে গেল ভাইস অ্যাডমিরালের মুখ, তারপর লালচে-বেগনি। 'আপনারা আমাদের এই আলোচনা রিপোর্ট করবেন! এটা একটা ফ্যাক্ট।'

চেয়ার ছাড়ল রানা। 'এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের রিপোর্ট পেয়ে যাবেন আপনি, মিস্টার ম্যাকমোহন,' যথাসম্ভব নরম সুরে বলল সে। 'সেটা যদি আপনার পছন্দ না হয়, ব্যাপারটা নিয়ে নুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মিস্টার রেডক্লিফের সঙ্গে আলাপ করতে হবে আপনাকে।'

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে আসছে ওরা, পিছন থেকে ভাইস অ্যাডমিরাল বিদ্রূপের সুরে বললেন, 'আমি যে কাউকে জবাবদিহি করি না, মিস্টার রেডক্লিফের নিশ্চয়ই তা ভাল করে জানা আছে। আলাপ যদি করি তো সরাসরি পেন্টাগনের সঙ্গে করব–বলব কোথাকার কে মাসুদ রানা আর মিস ড্যাসা শত্রুর আক্রমণ ঠেকাবার প্রস্তুতি নিতে বাধা দিচ্ছে আমেরিকাকে!'

বাইরে বেরুতেই সাগরের টানা বাতাস আর উষ্ণ রোদ স্বাগত জানাল ওদেরকে। একজোড়া নারকেল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ঝিলমিল করা লেগুনটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

'তোমার কি মনে হয়, ওরা চিনা ছিল, রানা?' প্রশ্ন করল উর্বশী।

'একেবারে অসম্ভব, তা বলছি না। আমেরিকানরা ওদের স্যাটেলাইট ট্র্যাক করে, এটা কখনওই ভাল চোখে দেখেনি ওরা। হয়তো এখানকার গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাকিং ডেটা জানতে চাইছে বেইজিং।'

'কিন্তু সেজন্যে তো কাছাকাছি খোলা সাগরে সার্ভেইলান্স শিপ রয়েছে ওদের।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমেরিকানরা এসডিআই [স্ট্র্যাটেজিক

ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ] রিসার্চ ডেটা এখান থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কোথাও পাঠায় না, ফলে সে-সব পিক করারও কোনও উপায় নেই। না, ওগুলো পেতে হলে গোপন অ্যাকশন দরকার হবে চিনাদের। ঘাঁটি দখল করতে হবে।'

উর্বশী দেখল লেগুনের সারফেস আয়নার মত চকচক করছে, সেটার উপর দিয়ে তরতর করে এগিয়ে চলেছে একটা ক্যানু। 'তা হলে তো ওটা চিনাদের হতেও পারে।'

'কী জানি,' বলল রানা। 'এদিকের পানিতে থাকতে হলে ফুয়েল আর রসদের জন্যে কোনও সাবমেরিন টেন্ডার-এর সহায়তা পেতে হবে ওটাকে। কিন্তু কাছাকাছি অন্য কোনও জাহাজ তো আমরা দেখছি না। যেটা আছে, আমার জানামতে সেটা সার্ভেইলান্স শিপই; কোনও সাব টেন্ডার নয়।'

'যে-কোনও একটা দ্বীপে ওটার বেস থাকতে পারে,' বলল উর্বশী।

'ডেটা সংগ্রহই যদি উদ্দেশ্য হয়, তা হলে রাবার বোট দরকার। কারণ বাস্তব তথ্য পেতে হলে ডাঙায় ভিড়তে হবে তোমাকে।'

'তা হলে কারা ওরা? এয়ার ট্যাংক ছাড়া সাগরের নীচে থাকেই বা কীভাবে? আর ওই ম্যাগনেটিক ফোর্স...'

উর্বশীকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'রিপোর্টটা তাড়াতাড়ি লিখে ফেলা উচিত।'

'সেটা সরাসরি মিস্টার রেডক্লিফকে জমা দিই চলো,' প্রস্তাব করল উর্বশী। 'তিনি যেখানে যেখানে পাঠানোর দরকার পাঠাবেন। সন্দেহ করছি তা না হলে আমাদের রিপোর্টে কারিগরি ফলাবেন ভাইস অ্যাডমিরাল।'

'সেটা বোধহয় উচিত হবে না,' বলল রানা। 'তাতে ভদ্রলোক অপমানিত বোধ করতে পারেন, বলা যায় না, তখন হয়তো আরও বেশি আনপ্রেডিক্টেবল হয়ে উঠবেন।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল উর্বশী, তারপর বলল, 'আমার ধারণা ছিল না, অবহেলা আর অপমান এতটা সহ্য করতে পার তুমি।'

'রিপোর্টটা কে লিখবে?' অভিযোগের জবাব না দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'দুজনে দুটো লিখব,' বলল উর্বশী। 'কোডে লিখতে একঘণ্টা লাগবে আমার।'

'ঠিক আছে।'

উর্বশীকে চলে যেতে দেখছে রানা। ছায়াঢাকা সরু পথ ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছে ও। দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল।

অফিস বিল্ডিঙে ফিরে এসে ওর আর উর্বশীর জন্য বরাদ্দ কামরাটায় ঢুকল রানা। স্যাটেলাইটের সাহায্যে অত্যন্ত জটিল এক সাঙ্কেতিক ভাষায় যোগাযোগ করল বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকার সঙ্গে।

সময়ের ব্যবধান প্রায় ছয় ঘণ্টা, কাজেই ঢাকায় এখন বিকেল পাঁচটা। ঠিক তিন সেকেন্ড পর অপরপ্রান্তের রিসিভার সাড়া দিল, 'ওয়েলকাম, সার। ইয়েস?'

নিজের অবস্থান জানিয়ে সংক্ষেপে রিপোর্ট করল রানা, তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই বাদ দিল না। জানা আছে ওর, এই রিপোর্টের প্রিন্টআউট একটু পরেই বিসিআই চিফের সামনে হাজির করা হবে। তিনি যদি প্রয়োজন মনে করেন, সরাসরি রানার সঙ্গে বার্তা বিনিময় করবেন।

পাঁচ মিনিট পর রাহাত খানের গুরুগম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল।

'এমআরনাইন, তোমার রিপোর্ট পড়ে মনে হচ্ছে যেন সায়েন্স ফিকশন।' মুচকি হাসল রানা। 'তবে না, আমি জানি ব্যাপারটা সিরিয়াস। শুধু পশু-পাখি নয়, সুন্দরবন থেকে মানুষ মারা যাবার রিপোর্টও আসছে, রানা। প্রতি মুহূর্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ওই লতা। এয়ার ট্যাংক ছাড়া ডাইভার, ম্যাগনেটিক ফোর্স... কী মনে

হয়, চিনারা হতে পারে?'

'মার্কিন ভাইস অ্যাডমিরাল ম্যাকমোহনের তাই ধারণা,' বলল রানা। 'কিন্তু উনি তো সর্দি লাগলেও চিনাদের দায়ী করেন। গ্রিনপিস কিংবা ওরকম কোনও পরিবেশবাদী গ্রুপ হতে পারে, সার?'

'না, ওরা মানুষ খুন করবে না,' জোর দিয়ে বললেন রাহাত খান। 'তা ছাড়া, সাবমেরিন পাবে কোথায়?'

'সার, ওই সাবমেরিনটার আমি কোনও ব্যাখ্যা পাচ্ছি না,' বলল রানা। 'ওটা মার্কিন ঘাঁটির কী এমন ক্ষতি করতে পারবে? কেউ কখনও একটা দ্বীপকে লক্ষ্য করে টর্পেডো ছোঁড়ে না। ওরা এখানে ল্যান্ড করতে পারে, কিন্তু এক হপ্তাও দখলে রাখতে পারবে না, মেরে-ধরে পালাতে বাধ্য করবে মার্কিনিরা। তা হলে?'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে,' বললেন বস্। 'আমি চাই প্রায়োরিটি ধরে তদন্ত করো তোমরা। সাবমেরিনটার একটা বেস থাকতে বাধ্য, আগে সেটা খুঁজে বের করা দরকার।'

'জী, সার।'

'গুড লাক,' বলে যোগাযোগ কেটে দিলেন বিসিআই চিফ।

অফিসার্স কোয়ার্টারে এসে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকল রানা। কমপিউটার অন করে রিপোর্টটা লিখে ফেলল, গুজব আর কল্পনা বাদ দিয়ে শুধু ঘটনার বর্ণনা দিল।

শাওয়ার সেরে কাপড় পরল রানা, তারপর আবার বেরুল। উর্বশীর ফ্ল্যাটের কাছাকাছি চলে এসেছে, দেখল নেভি ব্লু ইউনিফর্ম পরে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে ও, হাতে একটা কমপিউটার প্রিন্টআউট।

'কী বলল জাকার্তা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মুখ বুজে থাকো, গুজবে কান দিয়ো না, সম্ভব হলে সাবের বেসটা খুঁজে বের করো,' বলল উর্বশী। 'ঢাকা?'

'ওই একই কথা,' বলল রানা।

দু'সারি নারকেল গাছের মাঝখান দিয়ে এগিয়েছে ঝকঝকে রাস্তাটা, অফিস বিল্ডিঙে ফিরে এল ওরা।

ওদের দেখে নিঃশব্দে হাসল সার্জেন্ট। 'তাড়াতাড়ি চলে আসায় ভাইস অ্যাডমিরাল খুশি হবেন।' দরজায় নক করে ওদের উপস্থিতি ঘোষণা করল।

চেম্বারে ঢুকে ওরা দেখল খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে লেগুনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ডোনাল্ড ম্যাকমোহন। পায়ের আওয়াজ পেয়েও ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকালেন না। বললেন, 'ডেস্কের ওপর রিপোর্টগুলো রেখে যান। এখন আর তাড়াহুড়োর কোনও দরকার নেই।'

'তার মানে, মিস্টার ম্যাকমোহন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল উর্বশী। 'আমি আমার রিপোর্টের কপি পাঠিয়েছি জাকার্তা আর নুমা হেডকোয়ার্টারে, দু'জায়গা থেকেই আপনার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'এর মানে হলো, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ড্যাসা, আপনাদের জন্যে অপেক্ষা না করে আমি আমার রিপোর্ট ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দিয়েছি,' বললেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যা যা করা দরকার সবই করা হচ্ছে। আপনাদের রিপোর্টের আর কোনও গুরুত্ব নেই।'

'কিন্তু, মিস্টার ম্যাকমোহন,' বলল রানা, 'আমাদের রিপোর্ট ছাড়া ওয়াশিংটনকে বলার মত আর তো কিছু ছিল না আপনার কাছে!'

ভ্রূ কোঁচকালেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'কেন, আপনাদের মৌখিক রিপোর্টের সারমর্ম লিখেছি, তারপর আমি আমার নিজস্ব উপসংহারও টেনেছি। কাজেই আপনাদের রিপোর্টে গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু আছে, তার সবই ওয়াশিংটন এখন জানে। আমার পরামর্শ, আপনারা বিশ্রামে চলে যান। অন্তত যতক্ষণ না পেন্টাগন কিছু বলে।'

অবাক হয়ে মার্কিন নৌ-কর্মকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকল উর্বশী। 'আপনি কীভাবে আমাদের রিপোর্টের সারমর্ম লেখেন?'

'রিপোর্টে আপনি ঠিক কী লিখেছেন বলুন তো, মিস্টার ম্যাকমোহন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ডাইভাররা চিনা, সাবটাও চিনাদের, এ-সবই লিখেছি।' হাতঘড়ি দেখলেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'এই মুহূর্তে বেইজিঙে আর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অফিশিয়াল প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে।'

পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা আর উর্বশী।

'কিন্তু ব্যাপারটার সঙ্গে যদি চিন জড়িত না হয়, সার?' জানতে চাইল উর্বশী।

আবার ভ্রূ কোঁচকালেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'জড়িত না হলে অভিযোগ ফিরিয়ে নেব,' সোজাসাপ্টা উত্তর।

'রানা,' চাপা উত্তেজনার সঙ্গে বলল উর্বশী, 'এখনও বোধহয় সময় আছে, চেষ্টা করা দরকার নুমার মাধ্যমে আমাদের রিপোর্ট দুটো বেইজিং আর ওয়াশিংটনে পাঠানো যায় কি না।'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসে ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু লিউ ফুচুং রয়েছে, তার মাধ্যমে চিন সরকারকে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া যায়। আর নুমার চিফ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের মাধ্যমে ওয়াশিংটনকেও জানানো যায় আসলে কী হচ্ছে এখানে। তার চিন্তায় বাধা পড়ল ভাইস অ্যাডমিরাল হেসে ওঠায়।

'এখন আর কারও কিছু করার নেই,' হাসতে হাসতে বললেন তিনি। 'কারণ, বেস কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পিটার টিমসনকে বলে সমস্ত আউটগোয়িং কমিউনিকেশন বন্ধ করে দিয়েছি আমি। কেন, কেউ আপনাদের জানায়নি? খানিক আগে কোয়াজে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে?'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছে উর্বশী, ইঙ্গিতে তাকে থামার

নির্দেশ দিল রানা। উর্বশী লক্ষ্য করল, কী যেন শোনার চেষ্টা করছে রানা।

অফিসের বাইরে কাকে যেন ধমকাচ্ছে সার্জেন্ট, দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তার গলা শোনা যাচ্ছে। 'অসম্ভব, সানমুন! আগেই বলেছি তোমাকে, ভাইস অ্যাডমিরাল কঠিন ডিসিপ্লিন মেনে চলেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কারও সঙ্গে তিনি দেখা করবেন না!'

'দেখা তো হতেই হবে! বড় বিপদ, বস্!'

'সানমুন, খবরদার! আরে, গর্দভ নাকি! এই, না!'

চেম্বারের দরজা দড়াম করে খুলে গেল। ভিতরে ঢুকল ছোটখাট অথচ শক্ত-সমর্থ একজন কোয়াজালিয়েন, মাথায় ধবধবে সাদা চুল। কোমরে নামমাত্র একটা ন্যাকড়া পেঁচিয়ে লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা, তবে ন্যাকড়াটা রঙচঙে প্রবাল আর মুক্তো দিয়ে অলঙ্কৃত।

তার পিছু নিয়ে ঢুকল মাস্টার সার্জেন্ট, প্রৌঢ় আদিবাসীর কাঁধ ধরে টানছে, গায়ের জোরে তাকে চেম্বার থেকে বের করে নিয়ে যাবে।

লোকটা একহাতে ঠেকিয়ে রাখছে সার্জেন্টকে, অপর হাত তুলে তর্জনীটা সরাসরি ভাইস অ্যাডমিরালের বুকের দিকে তাক করল। 'বস্, ভাইস অ্যাডমিরাল, খুব বিপদ! কথা বলার অনুমতি চাই। আমার দাবি, দায়ী লোকদের আপনি ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করান!'

'কোনও অভিযোগ থাকলে অফিসকে লিখে জানাও,' বললেন ম্যাকমোহন। 'এখানে আরও লোক আছে, তারা ব্যাপারটা দেখবে। আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত।'

'আমি গুড সানমুন, আপনার কাছে এসেছি, বস্, কারণ ঘাঁটির কমান্ডার বললেন আপনিই নাকি অপারেশন চিফ। আমার লোকজন মারা যাচ্ছে, বস্! কীসের লিখিত অভিযোগ, আগে তাদেরকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে সার্জেন্টের

হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করল লোকটা। 'লাশ ফেলে রেখে এসেছি। আজ সকালে ছয়জন মারা গেছে। ওরা লেগুনে ডুব দিয়েছিল...

চোখ মিটমিট করল ভাইস অ্যাডমিরাল। 'মারা যাচ্ছে?'

'সৈকতে। ডাইভ দেয়ার আগে সব ঠিক। লেগুন থেকে উঠে আসার পর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, প্রলাপ বকছে, বলছে সারা শরীর জ্বলে-পুড়ে গেল। তারপর সব শেষ।'

'এ-সব কী বলছে ও?' সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করলেন ডোনাল্ড ম্যাকমোহন।

'গুড সানমুন গোঁয়ার হতে পারে, সার, কিন্তু কখনও কিছু বাড়িয়ে বলে না,' জানাল সার্জেন্ট, চোখে-মুখে উদ্বেগ।

'কেউ পাঁচ-সাত ঘণ্টা পর মারা যাচ্ছে, কেউ দেড়-দু'ঘণ্টা পর,' বলল সানমুন। 'আমার সঙ্গে চলুন, বস্, নিজের চোখে দেখবেন। সাহায্য আনান। ওয়াশিংটনকে বলুন লেগুনের পানিতে আপনারা কিছু করেছেন। এর জন্যে আপনাদের বোমা আর রকেট দায়ী। ওগুলোর জন্যেই আমার লোকজন মারা যাচ্ছে। লেগুনে আর কী করেছেন?'

'যত্তো সব! স্রেফ প্রলাপ বকছে লোকটা!' বললেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'লেগুনে আমরা এমন কিছু করিনি যাতে মানুষ মারা যাবে। তোমার ডাইভাররা নিশ্চয়ই...চিনারা!' ঝট করে রানা আর উর্বশীর দিকে ঘুরলেন তিনি। 'ওরা লেগুনে কিছু ফেলে গেছে! এতক্ষণে বোঝা গেল, এই কাজ করতেই এসেছিল ওরা! লেগুন বিষাক্ত করে দিয়ে গেছে, সহজেই যাতে বেসটাকে দখল করে নিতে পারে! জানতাম, আমি জানতাম!'

ঘুরে দরজার দিকে এগোল রানা। 'আগে জানা দরকার আসলে কী হচ্ছে ওখানে।'

ব্যগ্রভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল গুড সানমুন। ভাইস অ্যাডমিরালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনিও, বস্, চলে আসুন।

সঙ্গে মেডিসিন নিতে ভুলবেন না যেন। আর ডাক্তার। জলদি!'

রানার মাথার পিছনে কটমটে দৃষ্টিতে তাকালেন ম্যাকমোহন। তারপর কী মনে করে শ্রাগ করলেন। 'ঠিক আছে, সার্জেন্ট,' বললেন তিনি। 'মেডিকেল অফিসকে সতর্ক করে দাও। তারপর একটা লঞ্চের ব্যবস্থা করো, ইবায়ি দ্বীপে যাবে।'

সাত

ভাইস অ্যাডমিরাল ম্যাকমোহনের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর টিমোথি-র নেতৃত্বে ইবায়ি দ্বীপের উদ্দেশে রওনা হলো লঞ্চটা। বিশাল লেগুনের সবুজাভ-নীলচে পানি স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। উর্বশী আর রানা ছাড়াও লঞ্চে ছয়জন মার্কিন সৈন্য রয়েছে।

ইবায়ি দ্বীপে পাঁচ হাজার কোয়াজালিয়েন বাস করে, মার্কিন আর্মির নির্দেশে কোয়াজ ছেড়ে ওখানে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তারা।

'ভাইস অ্যাডমিরালের ধারণা, আমাদের বিরুদ্ধে একটা অপারেশন চালাতে যাচ্ছে চিনারা,' বলল মেজর টিমোথি। 'এ ব্যাপারে আপনারা কিছু জানেন, মিস্টার রানা?'

'হ্যাঁ, জানি,' বলল রানা।

ভ্রূ কোঁচকাল মেজর। 'আপনাদের কী ধারণা খুব বড় কোনও বিপদ হতে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল উর্বশী। 'আমরা সবাই মারাত্মক বিপদে পড়তে যাচ্ছি, আপনাদের উন্মাদ ভাইস অ্যাডমিরালকে সময়মত

কেউ যদি বাধা না দেয়।'

গলা খাদে নামিয়ে মেজর টিমোথি বলল, 'সত্যি কথা বলতে কী, মাঝে মধ্যে আমারও খুব ভয় করছে ভাইস অ্যাডমিরালকে। চিনকে তিনি এতই অপছন্দ করেন যে...'

'দুনিয়ায় বোধহয় তিনিই সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন চিনকে,' তার কথায় সায় দিয়ে বলল উর্বশী।

'না, না, ঘৃণা করবেন কেন,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আসলে ভদ্রলোক একটু বেশি সতর্ক, এই যা।'

'সার্জেন্টকেও দেখলাম বিড়বিড় করে তাঁর কথার প্রতিবাদ করছিল,' বলল উর্বশী। 'আমি তো দেখছি সবাই এই লোকটার ওপর অসন্তুষ্ট। শুধু তুমি বাদে, রানা।'

চুপ করে আছে রানা।

'কিছু যদি মনে না করো,' আবার বলল উর্বশী, 'তোমার ভূমিকা আমার কাছে রীতিমত রহস্যময় লাগছে, রানা। ওই ভদ্রলোকের ব্যাপারে এত কেন সহনশীল তুমি, তিনি যখন তোমাকেও অপমান করতে ছাড়েন না?'

'আসলে...মানুষটা সিনসিয়ার,' বলল রানা। 'তাঁর মধ্যে এমন কিছু মহৎ গুণ দেখেছি আমি যে, অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা না করে পারি না। বিশ্বাস করো, লোকটা আসলেই ভাল। দেখবে, নিজের ভুল যখন ধরতে পারবেন, কেমন সরলভাবে স্বীকার করেন সেটা!'

'তোমার ভাল লোক নিজের ভুলটা যখন ধরতে পারবেন তখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।' রাগে আর উত্তেজনায় একটু হাঁপাচ্ছে উর্বশী।

সে ভয় সত্যি হয়তো আছে, মনে মনে ভাবল রানা।

'মিস্টার ম্যাকমোহনকে খুব পছন্দ করেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, কাজেই আমরা কেউ তাঁর নামে অভিযোগ করলে গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন না তিনি,' আবার বলল উর্বশী। 'কিন্তু তোমার কথা আলাদা, রানা। তুমি যদি অভিযোগ করো, আমি

জানি, ভদ্রলোকের খবর হয়ে যাবে।'

'আগে পরিস্থিতিটা বুঝতে দাও আমাকে,' বলল রানা। 'এ প্রসঙ্গে এখন আর কোনও আলোচনা নয়।'

লেগুনের নীলচে-সবুজাভ পানি কেটে তরতর করে এগিয়ে চলেছে লঞ্চ। কয়েকটা জনশূন্য, খুদে দ্বীপকে পিছনে ফেলে এল ওরা। তারপর সামনে বড়সড় একটা দ্বীপ পড়ল। ওটাই ইবায়ি।

লঞ্চ থেকেই বোঝা গেল খুব একটা সুখে নেই ইবায়ি দ্বীপের মানুষ। গোটা দ্বীপ স্রেফ বড় একটা বস্তি। গাছের পাতা, পলিথিন আর কঞ্চি দিয়ে বানানো প্রতিটি ভাঙাচোরা ঘরে করুণ চেহারার লোকজন গিজগিজ করছে।

রানা ভাবল, অভাবী মানুষকে দিয়ে অন্যায় কাজ করিয়ে নেওয়া খুব সহজ। এদের কেউ যদি অশুভ কোনও শক্তিকে সাহায্য করে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

'মেজর!' হঠাৎ ডাকল কেউ।

লঞ্চের পিছনে, পানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে হেলমসম্যান; বোম্যানও কী যেন দেখছে সেদিকে। কথা বলছে বোম্যানই।

'পানিতে টনকে টন সামুদ্রিক লতা, সার। আগে তো কখনও লেগুনের এদিকটায় আমি এরকম দেখিনি।'

'গার্ড থাকলেও, এগুলো প্রপেলারকে জ্যাম করে দিতে পারে,' জানাল হেলমসম্যান। দেখল, পানি এখন আর স্ফটিক স্বচ্ছ নয়, রঙটাও নয় সবুজাভ-নীলচে। পানির রঙ এখন গাঢ় সবুজ, এতই গাঢ় যে কালো দেখাচ্ছে। সারফেসের নীচে লতাগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বলেও সন্দেহ হলো তার।

'এদিকে স্রোত খুব বেশি,' বলল উর্বশী, অনুভব করল লঞ্চের স্পিড কমে গেছে। 'তার ওপর পুরু আগাছা ঠেলে এগোতে হচ্ছে, স্পিড তো কমবেই।'

'খেয়াল করো, ওগুলো এত তাড়াতাড়ি বাড়ছে যে, খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে,' বলল রানা।

রেইলিঙে দাঁড়িয়ে পানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। ধীরগতিতে এগিয়ে ইবারি দ্বীপের নড়বড়ে জেটির পাশে ভিড়ল লঞ্চটা। বহু কোয়াজালিয়েন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে জেটির দু'পাশের সৈকতে, অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

সবার আগে লাফ দিয়ে তীরে নামল গুড সানমুন। 'আসুন আপনারা,' পিছনে একবার তাকিয়ে রানা, উর্বশী আর টিমোথিকে বলল সে, তারপর সৈকতের কাছাকাছি একটা কুঁড়েঘরের দিকে হনহন করে এগোল।

লঞ্চ থেকে নেমে তার পিছু নিল ওরা। ওদের পিছনে থাকল সশস্ত্র ছয় সৈনিক।

কুঁড়ের দরজা খুলল সানমুন, সবাইকে মাথা নিচু করে ঢুকতে হলো ভিতরে। মেয়েদের কান্নার শব্দ ধাক্কা দিল কানে।

'কুঁড়েটার চারপাশে নজর রাখো,' সৈনিকদের নির্দেশ দিল মেজর টিমোথি।

কুঁড়ের ভিতরে আলো খুব কম। তবে দৃশ্যটা দেখবার জন্য খুব বেশি আলোর দরকার নেই।

নারকেল গাছের শুকনো পাতার উপর শুইয়ে রাখা হয়েছে ছ'জন তরুণ কোয়াজালিয়েনকে। তাদের সবার মুখ বিকৃত হয়ে আছে, ঠিক যেমন দেখা যায় পয়জন ভিক্টিমদের।

লাশগুলোকে ঘিরে বসে রয়েছে দশ-বারোজন মহিলা। দুলছে তারা, লাশের গায়ে হাত বুলাচ্ছে, সুর করে কাঁদছে আর বিলাপ করছে। মাঝে মধ্যে নিষ্ফল ক্ষোভে নিজেদের মাথার চুল ধরে টানছে কেউ কেউ।

'ওদেরকে আমরা সৈকতে পেয়েছি। সবাই লেগুনে নেমেছিল,' ধীরে ধীরে কথা বলছে গোষ্ঠিপ্রধান সানমুন। 'দুজন বোধহয় বাকি সবার চেয়ে দু'মাইল বেশি দূরে ছিল। কালও কেউ অসুস্থ ছিল না। তরুণ আর শক্তিশালী ওরা। দক্ষ ডাইভার, ভাল সাঁতারু। দুজন এখনও মারা যায়নি, তবে ভীষণ অসুস্থ।'

'কথা বলতে পারছে?' সে থামতেই জানতে চাইল রানা। 'জিজ্ঞেস করোনি, কী হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করা হয়েছে। বলছে, কিছু না। কিছু হয়নি। শুধু ডাইভ দিয়েছে, সাঁতার কেটেছে, লেগুন ছেড়ে উঠে এসেছে, ব্যস। অসুস্থ হয়ে পড়েছে ডাঙায় ওঠার পর।'

'অসুস্থ লোক দুজন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মেজর টিমোথি।

'কোয়াজালিয়েন হাসপাতালে দিয়ে এসেছি, বলল সানমুন। 'ডাক্তাররা বলছেন, এই রোগ আমরা চিনি না।'

রানা, উর্বশী আর মেজর টিমোথি লাশগুলো পরীক্ষা করল।

'এই দুটো শরীরে কোথাও কোনও ক্ষত বা কাটা-ছেঁড়ার দাগ নেই,' বলল রানা।

'এ দুটোরও নেই,' জানাল উর্বশী।

মাথা নাড়ল মেজর টিমোথি। 'না,' বলল সে। 'কারও শরীরের এতটুকু চামড়া পর্যন্ত ছড়ে যায়নি।'

'তা হলে এরা মারা গেল কীভাবে?' ফিসফিস করল উর্বশী।

'ডুবে?' জানতে চাইল মেজর টিমোথি।

সরদার সানমুন বলল, 'কেউ ডোবেনি। সবাই খুব ভাল সাঁতারু। ডুবে মরা মানুষদেরকে এরকম দেখায় না।'

'দেখে মনে হচ্ছে পয়জনে মারা গেছে,' আন্দাজ করল রানা। 'পোস্টমর্টেম হওয়া দরকার, মেজর।'

মাথা ঝাঁকাল টিমোথি। 'লাশগুলো আমি কোয়াজে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। নেভির একজন প্যাথলজিস্টকে পার্ল হারবার থেকে উড়িয়ে আনতে হবে।'

'কিন্তু লেগুনে যে জিনিসটা গজাচ্ছে, তার কী হবে?' জানতে চাইল উর্বশী।

সানমুনের দিকে ফিরল রানা। 'ওগুলো লেগুনে আপনারা কবে থেকে দেখছেন?'

মাথা নাড়ল সানমুন। 'গতকাল দেখিনি।'

'বলতে চাইছেন, আজই প্রথম দেখলেন?'

'আজই দেখলাম। কাল ছিল না।'

কোয়াজ চিফকে বোঝাবার চেষ্টা করল মেজর টিমোথি। 'না, কাল নিশ্চয়ই ওগুলো ছিল ওখানে, সম্ভবত কয়েক হপ্তা ধরেই রয়েছে, কিন্তু আপনারা কেউ খেয়াল করেননি। হয়তো পানির অনেক নীচ থেকে ওপরে উঠে আসছে জিনিসটা, সারফেসের কাছাকাছি আসার পর আজ আপনারা দেখতে পেয়েছেন। ওরকম পুরু আগাছা জন্মাতে কয়েক বছর সময় লাগার কথা।'

মাথা নাড়ল সানমুন। 'দু'দিন আগেও আমি নিজে ডাইভ দিয়েছি। কোথাও এতটুকু আগাছা ছিল না।'

'অসম্ভব!' বলল মেজর।

রানা তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আসুন, আমরা আরেকবার দেখি জিনিসটা, মেজর। লোকগুলো বিনা কারণে মারা যায়নি। আর এই আগাছাও বেশ রহস্যময়। দু'দুটো রহস্য। দুটোর মধ্যে কোনও ধরনের যোগাযোগ থাকতেও পারে।'

'খানিকটা নমুনা নিয়ে যাই আমরা,' বলল উর্বশী। 'পোস্টমর্টেমের পাশাপাশি ওগুলোও অ্যানালাইজ করে দেখা উচিত।'

মাথা ঝাঁকাল মেজর। মাথা নামিয়ে কুঁজো হয়ে কুঁড়েঘরটা থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

লেগুনের তীরে এখনও ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোয়াজালিয়েনরা, পানির দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে।

কখন কী নতুন বিপদ হয়, সৈনিকদের কোয়াজে রেখে যাচ্ছে মেজর। বাকি সবাইকে নিয়ে আবার লঞ্চে উঠল সে। তার নির্দেশে হেলম্‌স্‌ম্যান তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে এল লঞ্চটা।

রানা বলল, 'আগে দেখা যাক আগাছাটা কতদূর ছড়িয়েছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হেলম্‌স্‌ম্যানকে নির্দেশ দিল মেজর।

বো-র কাছে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন ক্রু, লম্বা লগি দিয়ে পুরু আগাছা সরিয়ে লঞ্চের জন্য পথ তৈরি করছে। ইতিমধ্যে পানির সারফেস ভেঙে উপরে উঠে এসেছে ওগুলো, প্রপেলারে জড়িয়ে ওটাকে অচল করে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, সাপের মত সবুজ লিকলেকে কিছু শাখা লঞ্চের গা বেয়েও উপরে ওঠার চেষ্টা করছে।

রানা দেখল লেগুনের পানি কালচে-সবুজ হয়ে গেছে।

'ভাগ্যক্রমে, সার,' মেজর টিমোথিকে বলল হেলম্স্‌ম্যান, 'প্রপেলারের চারধারে উইড-প্রটেকশন কেইজ আছে। যতই সরু হোক, আশা করি খাঁচার ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকতে পারবে না ওগুলো।'

'মাই গড!' ফিসফিস করল মেজর। 'আমি সত্যি ওগুলোকে বাড়তে দেখছি! এ ভয়ঙ্কর জিনিস এল কোত্থেকে?'

'হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর এবং বিষাক্ত,' বিড়বিড় করল রানা। 'জানতে হবে কোত্থেকে আর কীভাবে এল।'

ওর দিকে তাকাল উর্বশী। 'আমি একটা কথা ভাবছি, তুমিও কি...

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'দুটো রহস্যকে কাকতালীয় বলা যায়, কিন্তু তিনটে রহস্য হলে নাকে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ এসে লাগে।'

'তার মানে তুমিও সাবমারসিবলটার কথা ভাবছ। কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছে না লেগুনভর্তি আগাছা আর লাশগুলোর সঙ্গে কী সম্পর্ক থাকতে পারে ওটার।' উর্বশী চিন্তিত।

'এখানে কিনারা, সার!' বোম্যান হাঁক ছাড়ল।

পরিষ্কার পানি পেয়ে লঞ্চ যেন লাফ দিয়ে এগোল। এদিকের পানির রঙ এখন আর কালচে-সবুজ নয়; আগের মত স্বচ্ছ ও নীলচে-সবুজাভ।

তীর থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে সরে এসেছে লঞ্চ, ঝুঁকে তাকাতে লেগুনের তলার বালি চিকচিক করতে দেখল রানা।

পরমুহূর্তে ওর গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে স্বচ্ছ পানিতে ছড়িয়ে পড়ছে অসংখ্য লিকলিকে সবুজ সাপ–তবে জানে ওগুলো সাপ নয়।

'ওগুলো দ্রুত ছড়াচ্ছে!' ওর গলার আওয়াজ অবিশ্বাসে কেঁপে গেল।

সবাই নীচের দিকে ঝুঁকে নিঃশব্দে স্বচ্ছ পানির ভিতর তাকিয়ে আছে। প্রথমে দেখা গেল ঘন কালো ছায়ার মত লেগুনের তলা ঢেকে ফেলছে কোটি কোটি সরু শুঁড়। তারপর সেগুলো সারফেসে উঠছে। ওগুলোর বিস্তারকে দৃষ্টিপথে ধরে রেখে লঞ্চকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে হেলম্‌স্‌ম্যান। গতি কিছুটা কমিয়ে আনতে হলো। তারপর সচল আগাছার সঙ্গে একই গতিতে এগোল তারা।

'ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ মাইল গতিতে জন্মাচ্ছে, মেজর,' বলল হেলম্‌স্‌ম্যান, তার গলার আওয়াজ বেসুরো লাগল রানার কানে।

পরিষ্কার পানিতে সাবলীল ভঙ্গিতে বাঁক নিল লঞ্চ, তারপর বো ঢোকাল ঘন জলজ ঝোপে। ওগুলো এখানে এত পুরু, ওরা যেন একটা ঘন জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। প্রপেলার কেইযটাকে মুক্ত রাখার জন্য আঁকাবাঁকা পথ ধরে ধীরগতিতে লঞ্চ চালাবার চেষ্টা করছে হেলম্‌স্‌ম্যান, বোতে দাঁড়ানো ক্রুরা লগি দিয়ে রাশি রাশি উদ্ভিদ ঠেলে সাহায্য করছে তাকে।

'জিনিসটা যাই হোক, তীরে এসে বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে না,' বলল উর্বশী। 'শুধু পানিতে বাড়ছে, টার্গেট সম্ভবত লেগুনের মাঝখানটা।'

'হয়তো...' শুরু করল রানা, কিন্তু বাধা পেয়ে থেমে গেল।

একটা রোমহর্ষক আর্তনাদ শোনা গেল। ধীরগতি লঞ্চের বো থেকে ভেসে এল আওয়াজটা।

নিজের লগিটাকে আগাছা মুক্ত করবার জন্য বো-তে দাঁড়ানো ক্রু পানির দিকে অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়েছিল, পা পিছলে যাওয়ায় পড়ে গেছে পানিতে।

হাসতে হাসতে পানি থেকে লঞ্চে উঠে এসেছে লোকটা। লেগুনের পানিতে ভিজে গেছে সে, সারা শরীর থেকে ঝুলছে বাড়ন্ত লতা।

আর্তনাদ করে ওঠার পর বিরতিহীন ঝাঁকি খেতে শুরু করেছে লোকটা, যেন নিজের শরীরের উপর তার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক, চিৎকার করে বলছে, সারা শরীর জ্বলে-পুড়ে গেল। যেন সাংঘাতিক বিষাক্ত কোনও সাপে কামড় দিয়েছে তাকে।

'কী হলো?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল উর্বশী।

অন্য এক ক্রু তার সঙ্গীর সাহায্যে ছুটে গেল, যন্ত্রণায় অস্থির বন্ধুর গা থেকে ডাঁটাগুলো সরাবার জন্য হাত বাড়াল সে।

'না!' গলা চড়িয়ে বাধা দিল রানা। 'ছুঁয়ো না ওকে! ওই লতাগুলোতেও হাত দিয়ো না কেউ!' উর্বশী আর মেজর টিমোথির দিকে ফিরল ও। 'এভাবেই মারা গেছে ডাইভাররা। ওই উদ্ভিদে বিষ আছে–সম্ভবত নার্ভ পয়জন। তা থেকে লেগুনের পানিও বিষাক্ত হয়ে গেছে।'

আক্রান্ত লোকটা অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে, লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল দ্বিতীয় ক্রু। ঠিক সেই মুহূর্তে দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ল দুর্ভাগা প্রথম ক্রু। তখনও হাঁ করে আছে সে, তবে এখন আর গলা থেকে কোনও আওয়াজ বেরুচ্ছে না। চোখ দুটো বিস্ফারিত, অপলক তাকিয়ে আছে নীল আকাশের দিকে।

পতনের পর হাত-পায়ের খিঁচুনি বেড়ে গেল তার। ওদের সবার চোখের সামনে মারা যাচ্ছে লোকটা, অথচ কারও কিছু করবার নেই।

তার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে উর্বশীর চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। সবাইকে আড়াল করে ফোঁপাচ্ছে সে, চেষ্টা করছে যাতে কোনও শব্দ না হয়।

আট

আরও প্রায় বিশ মিনিট পর মারা গেল লোকটা।

'মাই গড!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল মেজর।

'আমি... আমি একবার এক লোককে নিউ গিনিতে এভাবে মরতে...দেখেছিলাম,' সবার পিছন থেকে বলল হেলম্‌স্‌ম্যান, রোদ ঝিলমিল নীরব পরিবেশে তার কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর অবাস্তব লাগছে রানার কানে। 'লোকটাকে সাপে কেটেছিল। ঠিক এভাবেই মারা যায় ও। চিৎকার করছিল, শরীরটা থরথর করে কাঁপছিল। তবে এতটা ভয়ঙ্কর নয়; কারণ, মরতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লেগেছিল তার।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'কেউ ওকে ছোঁবেন না। এবার তাড়াতাড়ি তীরে নিয়ে চলুন আমাদের।'

মাথা ঝাঁকাল হেলম্‌স্‌ম্যান। খানিক আগের পরিষ্কার পানিও আগাছায় ভরে উঠেছে, সেগুলো ঠেলে পথ করে নিচ্ছে লঞ্চটা, গতি মন্থর। কারও মুখে কথা নেই। রোদে পড়ে থাকা লাশটার দিকে মাঝে-মধ্যেই তাকাচ্ছে ওরা–দৃষ্টিতে ভাষা নেই, হতবিহ্বল চেহারা।

তীরে, ধবধবে সাদা বালির উপর, এখনও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোয়াজালিয়েনরা। ওদের পিছনে সারি সারি নারকেল গাছগুলোকে শিশুদের অদক্ষ হাতে আঁকা ছবির মত লাগছে। সেগুলোর পিছনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে কুঁড়েগুলো।

একা শুধু সরদার গুড সানমুন দাঁড়িয়ে রয়েছে জেটিতে।

লঞ্চটাকে জেটির কাছে পৌঁছাতে দেখে কয়েকজন তরুণ দ্রুত পানির দিকে এগোল, যেন ওদেরকে সাহায্য করতে চাইছে।

'না!' গলা চড়িয়ে নিষেধ করল রানা। 'লেগুনের কাছ থেকে দূরে সরে থাকো সবাই! কেউ হাত দিয়ো না পানিতে!'

তার দেখাদেখি চিৎকার শুরু করল মেজর টিমোথি। 'পিছাও! পিছু হটো! সানমুন, তুমি তোমার লোকজনকে লেগুনের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও! তুমিও পানিতে নেমো না!'

জেটিতে ঘুরে দাঁড়াল সানমুন, নিজের লোকদের লেগুনের কাছ থেকে সরে যেতে বলছে। লঞ্চ থেকে দেওয়া নির্দেশই নিজের ভাষায় পুনরাবৃত্তি করছে সে।

লঞ্চ ভিড়তে প্রথমে রানাই পা রাখল জেটিতে, তারপর উর্বশী। ভাবলেশহীন চেহারা নিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল সরদার সানমুন।

'আপনার কথাই ঠিক, চিফ,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'কাল ওই আগাছা লেগুনে ছিল না। ওটার বিষে মার্কিন নেভির এক লোক এই মাত্র মারা গেল। আপনার ডাইভারদের মৃত্যুর কারণও ওই বিষ।'

'বিষ নামাবার ওষুধ দিন, বস্!' কাতর আবেদনের সুরে বলল সানমুন।

'আমি ডাক্তার নই, সানমুন,' বলল রানা। 'তবে জানি সমস্যাটা বোঝা গেলে আমাদের কারও মাথা থেকে একটা কিছু সমাধান বেরিয়ে আসতে পারে।'

'সমস্যা তো পরিষ্কার,' বলল সানমুন। 'পানি দূষিত হয়ে গেছে, তাই পানিতে নামা যাবে না। কিন্তু লেগুন থেকে মাছ আর মুক্তো তুলতে না পারলে আমরা খাব কী? বাঁচব না—এটাই তো সমস্যা, নাকি?'

'হ্যাঁ, এটাই সমস্যা, বলল উর্বশী। 'তবে এটার আরও

অনেক খারাপ দিক আছে। দেখে তো মনে হচ্ছে, গোটা লেগুন কয়েক দিনের মধ্যে ভরাট হয়ে যাবে। তারপর ধীরে ধীরে ভরাট হবে গোটা প্রশান্ত মহাসাগর। শুধু সময়ের ব্যাপার, এক সময় দুনিয়ার সবগুলো সাগরে ছড়িয়ে পড়বে ওগুলো।'

'থামানোর পথ নেই, বস্?' চোখে-মুখে আতংক নিয়ে রানার দিকে তাকাল সানমুন।

'প্রথমে জানতে হবে জিনিসটা কী, কোত্থেকে আর কীভাবে এল লেগুনে,' বলল রানা। 'আপনার লোকদের জানিয়ে দিন, লেগুনের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। লেগুনের এমনকী কাছাকাছি যাওয়াও উচিত হবে না। কেউ যেন ভুলেও ওই আগাছা না ছোঁয়। চেক না করা পর্যন্ত সাগরেও নামা নিষেধ।'

'কতদিনের জন্যে?'

'সেটা বলা মুশকিল।'

'কিন্তু আমরা মাছ ধরব না? আমাদেরকে খেতে হবে না?' অসহায় দেখাচ্ছে সরদারকে।

'সাগর পরীক্ষা করার জন্যে এক ঘণ্টার মধ্যে একটা টিম পাঠাচ্ছি আমরা,' বলল রানা। 'দ্বীপের চারপাশের পানিও চেক করবে ওরা। এদিকে আপনার লোকজন লেগুনের কিনারায় নজর রাখুক, দেখুক পানি ছেড়ে ওগুলো ডাঙায় উঠছে কি না।'

'জী, বস্, ঠিক আছে।'

'আরেকটা কথা,' বলল রানা। 'যদি দেখেন, লতাগুলো ডাঙায় উঠে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে মেজর টিমোথিকে রিপোর্ট করবেন।'

'ইয়েস, বস।' মাথা ঝাঁকাল সানমুন।

কোয়াজ দ্বীপ থেকে মাইলখানেক উত্তরে এসে গাঢ় সবুজ আগাছার পুরু স্তর থেকে মুক্ত হলো লঞ্চটা। প্রতি মুহূর্তে কয়েক লাখ নতুন শুঁড় গজাচ্ছে, যেন সচেতনভাবে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের পিছু নিয়ে আসছে ওগুলো।

'কোয়াজকে ঘিরে ফেলতে পুরো একটা দিনও লাগবে না ওগুলোর,' বলল মেজর টিমোথি। 'ভাবছি যদি ডাঙায় উঠে আসে?'

'তা আসবে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'জলজ উদ্ভিদ, পানি ছাড়া বাঁচবে না। তবু সতর্ক থাকতে হবে। আমরা তো জানিই না ওগুলো কী আসলে।'

'যেমন অদ্ভুত তেমনি অসম্ভব একটা ব্যাপার!' বলল উর্বশী। 'সায়েন্স ফিকশনকেও হার মানায়। যত শীঘ্রি সম্ভব তদন্ত হওয়া দরকার।'

'আমাদের টিমে নুমার কয়েকজন বিজ্ঞানীর থাকা দরকার,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'আগে চলো, ভাইস-অ্যাডমিরাল ম্যাকমোহনকে রিপোর্ট করি।'

'তাঁকে বিশ্বাস করানো খুব সহজ কাজ হবে না,' নিচু গলায় মন্তব্য করল মেজর টিমোথি।

গাছের ছায়ায় ঢাকা দ্বীপটার মেইন ডকে ভিড়ল ওদের লঞ্চ। হাসপাতালের কিছু কর্মী অপেক্ষা করছে, লাশগুলো মর্গে নিয়ে যাবে। ওদের কাছ থেকে জানা গেল, দুই প্যাথলজিস্ট ভদ্রলোক পার্ল হারবার থেকে রওনা হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কাল সকালের আগে তাঁরা পৌঁছাতে পারবেন বলে মনে হয় না।

লাশগুলোর সঙ্গে হাসপাতালে চলে এল উর্বশী ও রানা। ছোট হলেও এখানকার ল্যাবে অনেক রকম আধুনিক ইকুইপমেন্ট আছে। ডাক্তারদের সঙ্গে পরিচিত হলো ওরা। ইবায়ি দ্বীপের দুঃসংবাদ লঞ্চ ফিরে আসবার আগেই পৌঁছে গেছে কোয়াজে, ফলে ডিউটিতে থাকা ডাক্তার আর টেকনিশিয়ানরা সাহায্য করবার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে।

'দু'রকম পানির নমুনা দরকার আমাদের,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'লেগুনের যে পানিতে ওগুলো আছে, আর যে পানিতে নেই। তারপর দরকার ওই উদ্ভিদের নমুনা—পাতা, ডাঁটা আর, যদি

থাকে, শিকড়। প্রত্যেকে কমপ্লিট প্রোটেকটিভ ড্রেস পরবেন, রেডিওঅ্যাকটিভ পদার্থ নিয়ে কাজ করার সময় যেমন পরা হয়। আছে এখানে?'

'আছে,' জবাব দিলেন চিফ ফার্মাসিস্ট। 'নেভির প্রত্যেক ইন্সটলেশনেই পাবেন। নিউক্লিয়ার শিপ যে-কোনও জায়গায় সমস্যায় পড়তে পারে।'

'আগাছা সংগ্রহের সময় লম্বা লগি ব্যবহার করতে হবে। লগির মাথার দিকে টিউব বেঁধে সংগ্রহ করবেন পানি। কিছুই যেন স্পর্শ করতে না হয়, এমনকী হাতে প্রোটেকটিভ গ্লাভ পরা থাকলেও না। অন্তত যতক্ষণ স্পষ্ট করে কিছু জানা না যায়।'

'ওকে।' মাথা ঝাঁকালেন অফিসার।

'নমুনাগুলো এখানে নিয়ে আসার পর কী করব আমরা?' ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

'সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করে যত রকম টেস্ট করা দরকার, সব করবেন,' বলল রানা। 'বিশেষ করে পয়জনের...নার্ভ পয়জনের খোঁজে। সেই সঙ্গে উদ্ভিদটা আইডেনটিফাই করার জন্যে সমস্ত বোটানিকাল ডিটেইল্স্ও সংগ্রহ করবেন।'

'ওকে, মিস্টার রানা।'

'তবে প্রতিটি কাজ করবেন একটা গ্লাভ বক্সের ভেতরে। ফরসেপ, স্টিক ইত্যাদি দিয়ে কাজ করবেন, হাত দিয়ে নয়।'

'আশা করি অতটা বোধহয় সিরিয়াস নয় ব্যাপারটা,' বললেন ডাক্তার।

'ভুলেও কিছু আশা করতে যাবেন না। ওটার সংস্পর্শে এলে মানুষ মারা যাচ্ছে যখন, এরচেয়ে সিরিয়াস আর কী হতে পারে?' প্রশ্ন করল রানা, তবে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না। বলল, 'আগে প্যাথলজিকাল রিপোর্ট পেয়ে নিন, জানুন কী নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন, তারপর না হয় ঝুঁকি নেবেন।'

ল্যাব টিম লঞ্চ নিয়ে ইবায়ি দ্বীপে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, রানা

আর উর্বশী বিদায় নিয়ে চলে এল।

অফিস বিল্ডিঙে পৌঁছে ওরা জানতে পারল, কোয়াজ ঘাঁটির কমান্ডার রাশভারী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পিটার টিমসন ভাইস-অ্যাডমিরালের সঙ্গে জরুরি মিটিং সেরে একটু আগে নিজের হেডকোয়ার্টারে ফিরে গেছেন। এ-ব্যাপারে মাস্টার সার্জেন্টের ভাষ্য হলো, মিটিঙের আগে স্বাভাবিকই দেখা গেছে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে, কিন্তু মিটিঙের পর তাঁকে দেখে মনে হয়েছে প্রচণ্ড রকম বিরক্ত।

সার্জেন্ট তাদেরকে আরও জানাল, এই মুহূর্তে মেজর টিমোথি নিজের রিপোর্ট নিয়ে ভাইস অ্যাডমিরালের চেম্বারে রয়েছে।

ওরাও ঢুকল। প্রথমেই চোখে পড়ল নৌ-কর্মকর্তার রণমূর্তি, ডেস্কের পিছনে খাড়া বাঁশের মত সিধে হয়ে আছেন: মুখটা টকটকে লাল, হাত দুটো পিছনে এক করা।

মেজর টিমোথি নিরীহ মেষ শাবকের মত তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন আরেকটা ধমক দিলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

'সাত-সাতটা লাশ! সা-তটা!' ওদেরকে দেখে নতুন উদ্যমে শুরু করলেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'তার মধ্যে এমনকী একজন আমেরিকানও আছে! আপনারা এখনও বলবেন ব্যাপারটার সঙ্গে চিন জড়িত নয়? যদি জিজ্ঞেস করি কীভাবে কী ঘটল, জানি কিছুই বলতে পারবেন না। ইন্টেলিজেন্স না ঘোড়ার ডিম! শুনুন, ভুল-ভাল ইন্টেলিজেন্সের কারণেই এখন আমেরিকানদের চামড়া খুলে নিচ্ছে ইরাকীরা। হ্যাঁ, বলুন।'

সবুজ সাপের মত লিকলিকে লতা আর তার গায়ের চৌকোনা পাতার বর্ণনা দিল রানা। বলল খালি চোখে পরিষ্কার দেখা যায় ওগুলো বাড়ছে, লাশগুলোর শরীরে কোনও দাগ নেই। সবশেষে নিজের সন্দেহের কথা জানাল।

'বিষাক্ত সি-উইড ঘণ্টায় পাঁচমাইল স্পিডে বাড়ছে?' পালা করে তাদের তিনজনের দিকে তাকালেন ম্যাকমোহন, তারপর

উর্বশীর উপর স্থির হলো তাঁর দৃষ্টি। 'আপনি এই দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে একমত, ম্যাডাম? আসলেও এ-সব দেখেছেন আপনারা?'

'হ্যাঁ, দেখেছি। তবে মৃত্যুর জন্যে শুধু আগাছা দায়ী, নাকি পানিরও ভূমিকা আছে, তা বলতে পারব না। ক্রু লোকটাকে দেখে মনে হলো, বিষক্রিয়ায় মারা গেছে সে।

ডেস্ক ঘুরে এসে নীরব চেম্বারের ভিতর পায়চারি শুরু করলেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'এ হলো স্রেফ বায়োলজিকাল ওঅরফেয়ার! জানতাম, এই নিয়েই গবেষণা করছে ওরা, তবে ভুলেও কখনও সন্দেহ করিনি যে আমাদের ওপর ব্যবহার করবে।' ঘুরে থামলেন ম্যাকমোহন, তাকালেন ওদের দিকে। 'এটা কাপুরুষের মত চোরাগোপ্তা হামলা, জাপানিরা পার্ল হারবারে যা করেছিল। খুব দ্রুত অ্যাকশন নিতে হবে। আমি এখনই ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আপনারা...

'চিনের মত একটা সুপারপাওয়ার তিরানব্বুইটা বালির স্তূপে চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে ছয়জন আদিবাসীকে মেরে ফেলবে?' জিজ্ঞেস করল উর্বশী, বিদ্রূপের সুরটা ইচ্ছে করেই গোপন করছে না। 'আপনার মনে হচ্ছে না, অতি সামান্য লাভের জন্যে নিজেদের ভূমিকা ফাঁস করে দিচ্ছে ওরা?'

রানা চিন্তিত। 'এটা আমেরিকানদের মেইন ট্র্যাকিং স্টেশন, এখান থেকে বিশেষভাবে শুধু লালচিনের ওপর চোখ রাখা হয়। হতে পারে মহাশূন্যে কিছু পাঠাবার আগে মার্কিনিদের এই চোখটা নষ্ট করতে চাইছে চিন, আমেরিকানরা যাতে ব্যাপারটা এখনই টের না পায়।'

ঘোঁৎ করে একটা পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুললেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'দেখা যাচ্ছে আপনাদের মধ্যে অন্তত একজনের কিছুটা সুবুদ্ধি হয়েছে। চিন যদি স্যাটেলাইট হামলা চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তা হলে প্রথমেই তাদের উচিত হবে এই ট্র্যাকিং স্টেশনটা উড়িয়ে দেয়া। ঠিক তাই করতে যাচ্ছে ওরা।'

'কিন্তু, সার,' মেজর টিমোথি নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল, 'সামুদ্রিক আগাছা খুব একটা দ্রুত আমাদের রেইডার সিস্টেমকে ধ্বংস করতে পারবে না। আমি বলতে চাইছি স্যাটেলাইট অপারেশন আড়াল করার জন্যে ওরা যদি কোনও সারপ্রাইজ অ্যাটাক শুরু করে থাকে, প্রথমে রেইডার গম্বুজ আর ইন্সটলেশন ধ্বংস করবে না? প্রচণ্ড শক্তিতে আর দ্রুত... সার?'

'আগাছা ছেড়ে দেয়াটা স্রেফ প্রস্তুতির একটা অংশ, গর্দভ! আমাদেরকে নরম করে নিচ্ছে। বোকা বানাচ্ছে। আমরা ভাবব প্রাকৃতিক কোনও দুর্যোগ শুরু হয়েছে! সবাই ওই ফালতু সি-উইডকে নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত হয়ে উঠব, আর ঠিক তখনই চুপিসারে লেগুনে ঢুকে পড়বে ওদের সাবমেরিন, ডাইভারদের নামিয়ে দিয়ে যাবে, তারা যাতে ঝটিকা হামলা চালিয়ে দ্রুত ইন্সটলেশনটা দখল করে নিতে পারে। কিন্তু আমাকে ওরা বোকা বানাতে পারছে না, ওদের জন্যে প্রস্তুত হয়েই থাকব আমরা।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল রানা।

চোখে-মুখে গোঁয়ার্তুমির ছাপ, আবার পায়চারি শুরু করলেন ভাইস অ্যাডমিরাল। বাইরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সূর্য উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে, লেগুনের স্ফটিক স্বচ্ছ পানি চকচক করছে রোদে। তবে সবুজাভ-নীলচে পানির রঙ উত্তরদিকটায় বদলে গিয়ে এরইমধ্যে কালচে হতে শুরু করেছে।

'কীভাবে মানে? ওয়াশিংটন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্যারাট্রুপার পাঠাবে এখানে। প্যাসিফিকে আমাদের যত ক্যারিয়ার আছে, সবগুলোর মুখ এদিকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে, সেই সঙ্গে রওনা হয়ে যাবে সবগুলো মিসাইল ক্রুযারও। গুয়াম থেকে বারো ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা হান্টার সাবগুলোর। অল্প কয়েক ঘণ্টা সময় দরকার শুধু, শালাদের আমি ঘুঘুর ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়ব না!'

লোকটার নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করে সারা শরীর রাগে জ্বালা করছে উর্বশীর।

পায়চারি থামিয়ে ওর দিকে তাকালেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'ইন্দোনেশিয়া কী করবে, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার ড্যাসা?' জানতে চাইলেন তিনি। 'চিন-মার্কিন যুদ্ধে নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ থাকার মত বোকামি করবে না আপনাদের সরকার? আমি চাই আপনাদের কিছু প্যারাট্রুপারও এখানে চলে আসুক, আর হয়তো দু'চারটে গান বোট?'

উর্বশী বলল, 'আমি যেভাবে রিপোর্ট করেছি, আমার সরকার জানে না এখানে চিন কোনও ষড়যন্ত্র করছে। কাজেই ওদের বিরুদ্ধে কোনও অ্যাকশনে নামারও প্রশ্ন ওঠে না।'

আরও লাল হয়ে উঠল ভাইস অ্যাডমিরালের চোখ-মুখ। 'মেজর টিমোথি!' অকস্মাৎ গর্জে উঠলেন তিনি।

'ইয়েস, সার!'

'মিস ড্যাসাকে অ্যারেস্ট করো!' নির্দেশ দিলেন ম্যাকমোহন। 'আমার সন্দেহ হচ্ছে ড্যাসা সম্ভবত শত্রুর চর হিসেবে এখানে ঢুকে পড়েছে!'

'তা হলে, ভাইস অ্যাডমিরাল, বলল রানা। 'মেজরকে নির্দেশ দিন আমাকেও যেন অ্যারেস্ট করা হয়। আমার রিপোর্টেও ওই একই কথা বলেছি আমি। তা ছাড়া, যে কোনও খামখেয়ালি রিপোর্ট পেলেই ওয়াশিংটন প্যাসিফিক ফ্লিট মুভ করাবে বলেও আমি মনে করি না।'

অপমানটা গায়ে লাগল ভাইস অ্যাডমিরালের। টুকটুকে লাল হয়ে উঠল তাঁর মুখটা, কথা বলতে পারলেন না কিছুক্ষণ। কড়া কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলেন নিজেকে। তাঁর মনে পড়ে গেছে: বাংলাদেশী এই যুবককে বেশি ঘাঁটালে বিপদ হতে পারে নিজেরই।

'আপনার ধারণা, *আমার* রিপোর্ট অগ্রাহ্য করে দুজন বিদেশী ইন্টেলিজেন্স এজেন্টের রিপোর্টকে গুরুত্ব দেয়া হবে?' হো হো করে কাষ্ঠহাসি হেসে উঠলেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'আমাদের

আলাপ শেষ হবে না, তার আগেই ঝাঁকে ঝাঁকে পৌঁছে যাবে...'

হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল চেম্বারের দরজা, লাফ দিয়ে ভিতরে ঢুকল মাস্টার সার্জেন্ট, উত্তেজনায় চোখ-মুখ চকচক করছে। 'ভাইস অ্যাডমিরাল...'

'এটা কী, সার্জেন্ট? কোন্ সাহসে এভাবে তুমি...

'সার! চিনারা, সার! ওদের একটা জাহাজ আছে না? ওটা থেকে ব্রডকাস্ট করছে ওরা, সার। ডাকছে আমাদের। মানে, একটা ওপেন ব্যান্ড-এ কথা বলছে! সরাসরি, সার, খোলাখুলি—আমাদের সাহায্য চাইছে!'

টান টান, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডোনাল্ড ম্যাকমোহন। 'সাহায্য চাইছে? ডাকছে *আমাদেরকে?* আরে দূর, জীবন থাকতে...আরে, ওদের এমনকী এ-ও স্বীকার করার কথা নয় যে ওখানে ওরা আছে...'

'ওরা কী বলছে আমাদের শোনা উচিত, সার,' ভয়ে ভয়ে বলল মেজর টিমোথি।

রানা আর উর্বশী এরইমধ্যে ঘুরে দরজার দিকে হাঁটা ধরেছে। চোখ মিট মিট করলেন ভাইস অ্যাডমিরাল, রানা আর উর্বশীর মাথার পিছনদিকে একবার তাকালেন, তারপর ফিরলেন মেজর ও সার্জেন্টের দিকে। সবশেষে ছোট্ট মাথাটা ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে ঝাঁকালেন একবার।

'আচ্ছা, হ্যাঁ। রেডিও রুমে। আমার পিছু নাও,' রানা আর উর্বশীর পিছু পিছু চেম্বার থেকে বেরুবার সময় বললেন ভাইস অ্যাডমিরাল। তাঁকে অনুসরণ করল মেজর আর সার্জেন্ট।

হেডকোয়ার্টার বিল্ডিঙের করিডর ধরে হন হন করে এগোচ্ছে রানা। বড়সড় কমিউনিকেশন রুমটা একেবারে শেষ মাথায়। এই কামরা থেকেই মার্কিনিদের কোয়াজ সামরিক ঘাঁটি মহাশূন্যে ভাসমান স্যাটেলাইট ও গোটা দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।

রেডিওম্যানদের একটা গ্রুপ মেইন স্পিকার কনসোল-এর

সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মন দিয়ে শুনছে আতংকিত একটা কণ্ঠস্বর থেকে বেরিয়ে আসা সাহায্যের আহ্বান। বিশুদ্ধ ইংরেজি বলছে লোকটা, তবে ক্ষীণ হলেও চিনা টান ধরা যাচ্ছে।

'মেডে! মেডে! মেডে! সাড়া দাও, কোয়াজালিয়েন! তীর থেকে পনের মাইল উত্তর-পুবে চিনা ইলেকট্রনিক সার্ভেইলান্স শিপ। সাড়া দাও, কোয়াজালিয়েন! আমাদের বিরুদ্ধে এ-সব কী করছ তোমরা? ফরমাল প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা। মানবাধিকার এবং আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে আমাদের বিরুদ্ধে বায়োলজিকাল যুদ্ধ শুরু করেছ তোমরা...'

"ওহ্ গড!' বিড়বিড় করল রানা। কোথাকার পানি কোথায় গড়াবে কল্পনা করতে গিয়ে মুখটা শুকিয়ে গেল ওর। প্রাণ হারাবার মত বিপদে পড়ে কয়েকজন চিনা এই মুহূর্তে মার্কিনিদের সাহায্য চাইছে ঠিকই, কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই থেমে থাকবে না।

'মেডে! মেডে! মেডে! সাড়া দাও, কোয়াজালিয়েন! যা-ই করে থাকো তোমরা, এখনই সেটা থামাও! আমরা সারেন্ডার করছি! এই মুহূর্তে জরুরি সাহায্য পাঠাও! হামলা বন্ধ করো! আমরা ধরা দেব! আর্জেন্ট মেডিকেল এইড দরকার! জাহাজ ত্যাগ করতে হবে! কোওর্ডিনেটস...'

একজন রেডিওম্যানকে ঠেলে সরিয়ে দিল রানা, আরেকজনের হাত থেকে ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল মাইক্রোফোনটা। 'কোয়াজ থেকে নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর,' মাউথপিসে বলল সে। 'চিনা সার্ভেইলান্স শিপ-এর মেডে কল শুনে সাড়া দিচ্ছি। আমার আসল পরিচয়: বিসিআই-এর মাসুদ রানা। জাহাজে যদি কোনও চিনা সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট থাকেন, আমার সঙ্গে কথা বলুন তিনি। আমার স্পেশাল কোড জানান তাঁকে: এলএফ-সিক্স লেটার।'

রানার এই স্পেশাল কোড এভাবে ভাঙতে হবে–এলএফ মানে লিউ ফুচুং, ইংরেজিতে ফ্রেন্ড লিখতে ছয়টা অক্ষর লাগে।

অর্থাৎ লিউ ফুচুঙের বন্ধু সে।

লিউ ফুচুং–চিনা সিক্রেট সার্ভিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর।

ম্যাকমোহনের মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেছে। স্পিকারের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন, যেন ওখানে তিনি চিনাদের চ্যাপ্টা নাক আর সরু চোখ দেখতে পাচ্ছেন। বেসুরো গলায় বললেন, 'এটা ওদের একটা চালাকি! সময় পেতে চাইছে ওরা, আমাদেরকে ডাইভার্ট করতে চাইছে। মিস্টার রানা, জানতে পারি কোন্ সাহসে আপনি...

স্পিকার থেকে নতুন একটা কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল। আরও মার্জিত উচ্চারণ, কথার সুরে চৈনিক টান নেই বললেই চলে। 'কী চান আপনি, মাসুদ রানা? আমরা কল্পনাও করতে পারি না মার্কিনিদের এরকম নগ্ন ও অমানবিক হামলায় নুমারও কোনও ভূমিকা আছে...'

'আইডেনটিফাই!' নির্দেশ দিল রানা।

নীরব হয়ে গেল অপরপ্রান্ত। তারপর ভেসে এল, 'মেজর ইউ মিন, চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস। কোড–ডাবল ওয়ান। আপনার দেয়া কোড কমপিউটারে চেক করার সময় নেই, তবে ধরে নিচ্ছি এটা জেনুইনই হবে।'

রানারও সময় নেই ইউ মিনের কোড চেক করার। ধরে নিতে হবে, তার সঙ্গে ছল-চাতুরী করা হচ্ছে না। 'এবার বলুন, ইউ মিন, কী হচ্ছে ওখানে?'

'কী হচ্ছে আমেরিকানদের জিজ্ঞেস করুন, মিস্টার রানা! ওদের বায়োলজিকাল অ্যাটাকে এরইমধ্যে আমাদের চারজন ক্রু মারা গেছে। জাহাজ পুরোপুরি অচল। মানবিকতার নামে হেলিকপ্টার পাঠাবার অনুরোধ জানাচ্ছি, আমাদেরকে যেন উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জাহাজটাকে টেনে নীচে নামাবার আগেই...

'সবুজ লতা নাকি?' বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করল রানা। 'সামুদ্রিক উদ্ভিদ, এত দ্রুত গজাচ্ছে যে খালি চোখে দেখা যায়?

আপনাদের লোকেরা ওগুলো পরিষ্কার করতে গিয়ে মারা গেছে?'

'আমি কি ধরে নেব আমেরিকানরা জানতে চাইছে তাদের অমানবিক হাতিয়ার কতটা ভয়ঙ্কর?' তিক্ত স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করল চিনা স্পাই। 'তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, জাহাজটাকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলতে কতক্ষণ সময় নেবে এই বিষাক্ত আগাছা?'

'ওগুলো জাহাজে উঠবে না,' বলল রানা। 'আমরা অন্তত তাই জানি। প্রথম কখন দেখেছেন?'

অপরপ্রান্ত আবার দু'এক মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেল। 'আজ সকালে। কত গভীর পর্যন্ত আছে দেখার জন্যে ডাইভার নামানো হয়েছিল। তারা আর ফেরেনি।' চিনা স্পাই ইতস্তত করছে। 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটার জন্যে মার্কিন ঘাঁটি দায়ী নয়, অথচ আপনারা জানেন...'

'ওই একই ব্যাপার এখানেও ঘটছে, মেজর ইউ মিন। গোটা লেগুন সিউইডে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ইবায়িতে ছ'জন আদিবাসী আর একজন আমেরিকান মারা গেছে। এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোয়াজের দিকে এগিয়ে আসছে ওই আগাছা। আপনারা কি অচেনা ডাইভার কিংবা রহস্যময় কোনও সাবমারসিবল দেখেছেন?'

'ব্যাপারটা ওখানেও ঘটছে?'

'বিশ্বাস করুন, মেজর।'

স্পিকার থেকে আবার প্রথম ব্যক্তির কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল। 'কমান্ডার লিউ ইয়ান। আপনি বলছেন অ্যাটলেও ওই সামুদ্রিক আগাছা জন্মাচ্ছে? বলছেন কুকর্মটা আমেরিকানদের নয়? তা হলে কাদের?'

'এখানকার একজন ভাইস অ্যাডমিরালের ধারণা, এটা আপনাদের কাজ,' বলল রানা। 'আচ্ছা...'

চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন ডোনাল্ড ম্যাকমোহন। 'আমি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি! ওরা আমাদের হেলিকপ্টার বহরকে ওখানে

নিয়ে যাবার জন্যে টোপ ফেলছে, উদ্দেশ্য আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেয়া। আপনি বোকার মত আমেরিকার শত্রুর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন, মিস্টার রানা!' মাইক্রোফোন লক্ষ্য করে ছোঁ দিলেন তিনি, তবে রানা সেটা সময়মত সরিয়ে নেওয়ায় সুবিধে করতে পারলেন না। 'আমাকে দিন ওটা! দেখিয়ে দিচ্ছি হলুদ কুকুরদের সঙ্গে কী ভাষায় কথা বলতে হয়...'

স্পিকার থেকে চিনা কমান্ডার লিউ ইয়ানের গলা ভেসে এল। 'আমাদের ক্যাপটেনও বলছে ব্যাপারটা স্রেফ মার্কিন শুয়োরদের একটা ষড়যন্ত্র–চিনা ভূখণ্ডে পরিকল্পিত সারপ্রাইয অ্যাটাক করতে চায়, তার আগে চেষ্টা করছে সার্ভেইলান্স শিপটা ধ্বংস করতে। এই অবস্থায় কী করতে পারি আমরা?'

'প্রথমে আপনি আমাকে জানান,' বলল রানা, 'কোনও ডাইভার কিংবা সাবমারসিবল দেখেছেন কি না।'

জবাব দিল মেজর ইউ মিন। 'না, মিস্টার রানা, কোনও ডাইভার দেখিনি আমরা। তবে আমাদের সোনার-এ একটা সাবমেরিন ধরা পড়েছে। আমরা ধরে নিয়েছি ওটা মার্কিনিদের।'

'অ্যাটাক সাবের তুলনায় খুব ধীরে চলে, আবার রিসার্চ ভেসেলের তুলনায় গতি বেশি? এমন আকৃতি, আগে কখনও দেখেননি, তাই তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটা মার্কিনিদের নয়?'

'না। আপনাদের নয় তো?'

'নাহ্!' চিনা স্পাই আতংকিত বোধ করছে। আমেরিকান বিপদ মোকাবিলা করতে পারবে সে, কিন্তু অজানা আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লড়বে কীভাবে? 'আমাদের নীচে বহুবার সাবটার অস্তিত্ব টের পেয়েছি। কখনও অ্যাটলের দিক থেকে আসে, কখনও উত্তরদিক থেকে। আমাদের তলা দিয়ে এগোবার পর কোথায় যেন হারিয়ে যায়!'

'ঠিক আছে। কেউ আমরা জানি না আসলে কী হচ্ছে। আমার

পরামর্শ...'

রানার পিছন থেকে গর্জে উঠলেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'ওরা মিথ্যেকথা বলছে, রানা! ওদের কথায় কান দেবেন না! আপনি সরে দাঁড়ান, ওয়াশিংটনের সঙ্গে কথা বলি আমি। প্রতিটি সেকেন্ড এখন মূল্যবান! আপনি কত বড় গাধা যে বুঝতে পারছেন না ওরা আমাদেরকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে?'

গালিটা শুনতে না পাওয়ার ভান করল রানা, বলল, 'মিস্টার ম্যাকমোহন, আপনার সঙ্গে আমি একমত নই। ওদের চারপাশেও আগাছা দেখা যাচ্ছে, তার মানে তৃতীয় কোনও পক্ষ চিনা আর আমেরিকানদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। সবারই এখন উচিত, তৃতীয় পক্ষকে যত দ্রুত সম্ভব সনাক্ত করা।'

'দেখুন, মিস্টার ম্যাকমোহন,' রেগেমেগে শুরু করল উর্বশী, 'আপনি যে শুধু অন্যায় জেদ ধরছেন তাই নয়, ভব্যতা আর কাণ্ডজ্ঞানও বজায় রাখতে পারছেন না! প্রতিটি বিষয়ে আপনার পক্ষ নিয়ে আমাদের সঙ্গে তর্ক করেন রানা, বলেন–উনি লোক তো ভাল! অথচ তাকেও গালাগালি করে নিজেকে ছোট করছেন আপনি!'

'কী? আমার পক্ষ নেন?' খেপে আগুন হয়ে উঠলেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'আমি ভাল কি খারাপ তার সার্টিফিকেট নিতে হবে ওর কাছ থেকে?'

'ওদের সঙ্গে আমিও একমত, সার,' বেসুরো গলায় জানিয়ে দিল মেজর টিমোথি। 'আমিও বিশ্বাস করি...

শুকনো হাড্ডিসার শরীরটা বন করে ঘোরালেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'যা খুশি বিশ্বাস করো, টিমোথি। আমি এখানকার অপারেশন্স চিফ, নির্দেশ যা দেয়ার আমিই দেব। খানিক আগে এ-কথা আমি আমাদের কমান্ডার পিটার টিমসনকেও জানিয়ে দিয়েছি। আমরা চিনাদেরকে কোনও সাহায্য করব না. এবং তোমাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করা হলো। গার্ডস্!'

মাইক্রোফোনে শান্ত সুরে কথা বলছে রানা। 'ইউ মিন, আপনি তাড়াতাড়ি চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সম্ভব হলে আপনাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে সরাসরি কথা বলুন। সবাইকে জানান কী হচ্ছে এখানে। কিছু বাদ না দিয়ে–সবটুকু।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

'মার্কিন নৌবাহিনীর ভাইস্ অ্যাডমিরাল ম্যাকমোহনের ধারণা, আপনারা হামলা চালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন–এটাও রিপোর্ট করবেন। পানির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন ক্রুদের। চেষ্টা করুন জাহাজটাকে আগাছা থেকে বের করতে পারেন কি না।'

'তা সম্ভব বলে মনে হয় না, মিস্টার রানা,' কমান্ডার লিউ ইয়ানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা। 'চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিনি আমরা। জাহাজের চারপাশে উদ্ভিদগুলো এত ঘন হয়ে জন্মেছে, প্রপেলার ঘুরতে পারছে না।'

'তারপরেও চেষ্টা চালিয়ে যান। যদি নড়াচড়া করতে না পারেন, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকুন ওখানে, বেইজিঙের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এখান থেকেও সাহায্য পাঠানো হবে। হয়তো ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস না খেয়ে উপায় নেই আমার।'

'জলদি, মিস্টার রানা!' গম্ভীর সুরে বলল কমান্ডার লিউ ইয়ান। 'আমাদের খোলের ওপর চাপ শুধু বাড়ছেই। আগাছাটা পানি থেকে উঠে আসছে না ঠিকই, কিন্তু জন্মাচ্ছে দ্রুত–এই লতা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইস্পাতের বারোটা বাজিয়ে দেবে।'

'হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা

ওদেরকে অ্যারেস্ট করবার জন্য করিডর ধরে ছুটে আসছে সশস্ত্র গার্ডরা। হুড়মড় করে রেডিও রুমে ঢুকে পড়ল তারা।

ভাইস অ্যাডমিরালের মুখোমুখি হলো ওরা তিনজন–রানা,

উর্বশী আর মেজর টিমোথি।

'আমি চাই না এখানে কেউ আহত হোক, মিস্টার ম্যাকমোহন,' শান্ত সুরে বলল রানা। বগলের তলায় হোলস্টারে রাখা ওয়ালথার পিস্তলটা একবার স্পর্শ করল সে, দেখে নিল জায়গা মত ছুরিটাও আছে কি না।

'আপনি প্রথমে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, ভাইস অ্যাডমিরাল,' বলল উর্বশী। 'অ্যারেস্ট করার চেষ্টা হলে আমরা প্রতিহত করব। তখন যদি কেউ আহত হয়, তার পরিণতি কিন্তু ভাল হবে না।'

'সার,' বলল মেজর টিমোথি, 'আমার মনে হয়...'

'তোমার কি মনে হয় না হয় তার এক পয়সাও দাম দিই না আমি, টিমোথি!' গর্জে উঠলেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'এই ব্যাপারটার পর সিভিলিয়ান হয়ে যাবে তুমি, মানে যদি কারাদণ্ড না হয় আর কি! তোমরা তিনজন আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছ, কাজেই বাধ্য হয়ে তোমাদেরকে আমি সেলে ভরে রাখার নির্দেশ দি...'

অবিশ্বাস্য প্রচণ্ডতা নিয়ে কোথাও কিছু একটা বিস্ফোরিত হলো। ভরাট, গুরুগম্ভীর গর্জনটা একই সঙ্গে যেন দু'জায়গা থেকে ভেসে এল: রানার বন্ধ করতে ভুলে যাওয়া মাইক্রোফোন আর কোয়াজ দ্বীপের প্রায় বিশ কিলোমিটার উত্তর-পুব থেকে।

নিজেদের ঝগড়া ভুলে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল ওরা সবাই। রোদ ঝলমলে দিন, মেঘমুক্ত আকাশ। বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে কোয়াযের লোকজন হকচকিয়ে গেছে। সবাই যে যার হাতের কাজ ফেলে উত্তর-পুব দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

নীল প্রশান্ত মহাসাগরের বুক থেকে ধোঁয়ার প্রকাণ্ড একটা স্তম্ভ ধীরে ধীরে খাড়া হলো আকাশের গায়ে। ওদিকে চিনা জাহাজটা ছাড়া বিস্ফোরিত হওয়ার মত আর কিছু নেই।

'ওহ্ গড! ওহ্ গড!' ভাইস অ্যাডমিরাল ডোনাল্ড ম্যাকমোহন বিড়বিড় করছেন।

নয়

'এমন হতে পারে যে,' বলল মেজর টিমোথি, 'ওটা চিনা জাহাজ নয়। হয়তো অন্য কিছু...' নিজের কানেই অবিশ্বাস্য লাগায় চুপ করে গেল সে।

উর্বশী দেখল মেঘমুক্ত আকাশে কালো ধোঁয়ার স্তম্ভটা এখনও উঁচু হচ্ছে। 'সবাই শেষ। এরকম একটা বিস্ফোরণে একজনেরও বাঁচার কথা নয়। কেউ আমরা জানি কতজন ছিল ওরা?'

'ওই সাইজের একটা জাহাজে,' ঢোক গিলে বলল রানা, গলার আওয়াজে জোর নেই, 'কম করেও দুই থেকে তিনশো।'

ভাইস অ্যাডমিরাল ম্যাকমোহনকে দিশেহারা লাগছে, তিনি আচ্ছন্ন বোধ করছেন। 'কিন্তু... কিন্তু... কে? মানে...কী? ওটা নিশ্চয়ই ...চিনা জাহাজ হতে পারে না। ওরা আমাদের ওপর হামলা চালাচ্ছিল। সবকিছুর পেছনে ওরাই তো। কাজেই... কাজেই... আমাদের একটা সাবমেরিন... একটা টর্পেডো! না, মিসাইল! নিশ্চয়ই আমাদের কোনও মিসাইল ক্রুযার...'

'ভাইস অ্যাডমিরাল, সার,' বলল মেজর টিমোথি, 'কোয়াজের কাছাকাছি কোনও মিসাইল ক্রুযার এলে আমরা জানব। কোনও সাবমেরিন এলেও জানব। চিনাদের ওটা আনআর্মড সার্ভেইলান্স শিপ ছিল। আমরা ওটাকে কোনও ওয়ার্নিং না দিয়ে ডুবিয়ে দিতে পারি না। আমরা...

'তবে চিন তাই ভাববে,' বলে দ্রুত ভাইস অ্যাডমিরালের

দিকে ঘুরে গেল রানা, ওর মাথা ঝড়ের বেগে কাজ করছে।

মাত্র কালই ওদের ওই অচেনা শত্রুর সাবমারসিবল আর ডাইভারদের বিরুদ্ধে পেন্টাগন ও ওয়াশিংটনকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন ম্যাকমোহন। বেইজিঙের বিরুদ্ধে ওয়াশিংটন অভিযোগ এনেছে, কোয়াজ দখল করতে চাইছে ওরা। চিনাদের ওই জাহাজও নিজের বিপদ সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে বেইজিংকে।

খানিক আগে জাহাজটার সঙ্গে রানার যে কথাবার্তা হলো সেটা যদি বেইজিংকে রিপোর্ট করা না হয়ে থাকে, বেইজিং ধরে নেবে আক্রান্ত হবার অজুহাতে আমেরিকানদের কোয়াজ ঘাঁটিই ওদের সার্ভেইলান্স শিপকে ডুবিয়ে দিয়েছে।

হিসাবটা দুয়ে দুয়ে চারের মত সহজ, ভাইস অ্যাডমিরালকে তা শুনিয়েও দিল রানা।

'গুড গড!' ওর কথা শুনে ফিসফিস করল মেজর টিমোথি, রক্ত নেমে যাওয়ায় সাদাটে হয়ে গেছে মুখ। 'ঠিক তাই, চিনারা এভাবেই দেখবে ব্যাপারটা!'

উর্বশীর গলা ভেঙে গেল, 'বেইজিং এটাকে হামলা শুরুর প্রথম ধাপ বলে মনে করবে!'

এতক্ষণ চোখ মিটমিট করছিলেন ভাইস অ্যাডমিরাল, হঠাৎ করে যেন তাঁর ঝাপসা দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে গেল। 'মিস্টার মাসুদ রানা, আপনার সঙ্গে আমি একমত! সত্যি কথা বলতে কী, আমার তরফ থেকে মারাত্মক একটা ভুলই হয়ে গেছে,' অকপটে স্বীকার করলেন তিনি।

তাঁর মুখ থেকে এ-ধরনের অপ্রত্যাশিত কথা শুনে উর্বশী আর মেজর টিমোথি চট করে একবার দৃষ্টি বিনিময় করল।

'এ-সবের পেছনে চিন যদি না থাকে, এবং আমরা যে ধরনের প্রোটেস্ট ফাইল করেছি, আমি বেইজিং হলে ধরে নিতাম জাহাজটাকে আমেরিকাই ডুবিয়েছে। 'ফলে সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টার-স্ট্রাইকের অর্ডার দিতাম!'

‘গড! ওহ্ গড!’ কমিউনিকেশন রুমের মেঝেতে এলোমেলো পা ফেলে পাগলের মত হাঁটাচলা করছে আর প্রলাপ বকছে মেজর টিমোথি। ‘যদিও এই ভুলের কোনও প্রায়শ্চিত্ত হয় না, তবু তুমি আমাদের রক্ষা করো!’

কপালের দু’পাশ আঙুল দিয়ে ডলছেন ভাইস অ্যাডমিরাল। ‘এই মুহূর্তে ওয়াশিংটনের সঙ্গে কথা বলতে হবে আমাকে!’ রেডিওম্যানের দিকে ফিরলেন। ‘টপ প্রায়োরিটি ইমার্জেন্সি চ্যানেল, কোডেড মেসেজ। জলদি!

‘না,’ বলল রানা।

‘না! না? ড্যাম ইট, রানা!’ হুংকার ছাড়লেন ভাইস অ্যাডমিরাল। ‘স্বীকার করছি আমার ভুল হয়েছে! আপনার জানা উচিত এই মুহূর্তে ওয়াশিংটনকে সব কথা বলা দরকার।’

‘জানি,’ বলল রানা। ‘তবে আপনাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আপনার যে সময় লাগবে, তারচেয়ে অনেক কম সময় লাগবে আমার। কামরা ছেড়ে চলে যান, প্লিজ!’

‘কী যা-তা বকছেন!’ ধমকে উঠলেন ভাইস অ্যাডমিরাল। ‘পেন্টাগনের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে টপ প্রায়োরিটি চ্যানেল আছে আমার। ওরা ইমিডিয়েটলি ডিফেন্স সেক্রেটারিকে জানাবে, ডিফেন্স সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টকে অবহিত করবেন। শুনি তো, আপনার মত বিদেশী একজন স্পাই কীভাবে...’

‘ডিক্লারেশন সেভেনটিন, সেভেনটিন,’ বলল রানা। ‘নাম্বার ফিফটিওয়ান, রো এইট।’

ভাইস অ্যাডমিরালের চেহারা ম্লান হয়ে যেতে দেখল ওরা। হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। ‘ফর গড’স সেক, কে আপনি?’

‘সময় নেই, মিস্টার ম্যাকমোহন। রেডিও রুমটা খালি করে দিন আমাকে, প্লিজ। এখনই!’

আরও এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন ভাইস অ্যাডমিরাল।

দু'সেকেন্ড। তারপর ঝট করে ঘুরলেন। 'বেরোও! বেরোও সবাই! মিস্টার রানাকে একা থাকতে দাও! গার্ড, বাইরের দরজা কাভার দাও তোমরা। জলদি!'

দ্রুত পায়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সবাই। উর্বশীর চোখে-মুখে একরাশ কৌতূহলের সঙ্গে আরও একরাশ বিস্ময় ফুটে আছে।

রানার মুখে সুপারসিক্রেট কোড শুনে এখনও হাঁ হয়ে আছেন ভাইস অ্যাডমিরাল ম্যাকমোহন, ঘাড় ফিরিয়ে বার বার তাকাচ্ছেন ওর দিকে।

সুপারসিক্রেট এই কোড-এর তাৎপর্য হলো—কারও মুখ থেকে এটা উচ্চারিত হওয়া মাত্র বিনা দ্বিধায়, কালবিলম্ব না করে, আর কোনও প্রমাণ ছাড়াই তার কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে।

ভাইস অ্যাডমিরাল এই কোড সম্পর্কে জানেন, কিন্তু তা ব্যবহার করার অধিকার এমনকী তিনিও পাননি।

এই মুহূর্তে নুমা চিফ জর্জ হ্যামিলটনকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাচ্ছে রানা, কারণ মারাত্মক কোনও সংকটের সময় কাজে লাগতে পারে ভেবে এই সুপারসিক্রেট কোডটা বিশ্বাস করে তিনিই ওকে জানিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সেরে সেটা ব্যবহার করবার ক্ষমতাও পাইয়ে দিয়েছেন ওকে।

এত বড় একটা সম্মান আর ক্ষমতা ওর হাতে তুলে দেওয়ার পিছনে নুমা চিফের যুক্তি ছিল—মাসুদ রানা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন; অন্যায়-অমঙ্গল আর অশুভ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রীতিমত একটা ইন্সটিটিউশন-এ পরিণত হয়েছে ও; কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে শুধু নিজের দেশের কথা ভাবে না, গোটা বিশ্বের কীসে ভাল হবে তা-ও ওর বিবেচনার মধ্যে থাকে। কাজেই এই কোড ব্যবহার করবার যোগ্যতা ওর আছে।

কোডটার কল্যাণে মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রধান আর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে সরাসরি কথা বলতে

পারবে রানা।

তবে এই মুহূর্তে ওঁদের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করাটা রানার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। কারণ, চিন যদি পাল্টা আঘাত করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, আমেরিকানদের কারও কিছু করবার নেই।

চিনকে ক্ষান্ত করবার একটাই উপায় দেখতে পাচ্ছে রানা, চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর লিউ ফুচুংকে প্রকৃত অবস্থা জানানো।

ফুচুং ওর কথা বিশ্বাস করবে।

ওদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফুচুঙের কথা বিশ্বাস করবেন।

দরজা বন্ধ হওয়ার পর শক্তিশালী ইন্টারকন্টিনেন্টাল রেডিও অন করে নিজের কোড বলল রানা, এক পলকের মধ্যে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস কমপিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল ওর। আরেকটা কোড টাইপ করতে হলো, এই মুহূর্তে ফুচুঙের পিসি-র স্ক্রিনে ওর কোড ফ্ল্যাশ করছে।

তিন সেকেন্ডের মাথায় রেডিও থেকে বন্ধু ফুচুঙের কর্কশ, বেসুরো কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'খুব ব্যস্ত আছি, দোস্ত! তোর সঙ্গে পরে কথা বলি?'

রানা আন্দাজ করতে পারছে কী নিয়ে ওদের ব্যস্ততা। 'না, সব কাজ ফেলে আমার কথা শুনতে হবে তোকে,' দ্রুত, ঠাণ্ডা সুরে বলল ও।

'কিন্তু, রানা... মানে, আমরা একটা ন্যাশনাল ক্রাইসিস নিয়ে টেলি-কনফারেন্সে রয়েছি...

'আমি জানি। স্টিল, আই ইনসিস্ট!' আবার বলল রানা।

অপরপ্রান্তে এক সেকেন্ডের নীরবতা। তারপর ফুচুং অস্বাভাবিক শান্ত গলায় বলল, 'ওকে, গো অ্যাহেড। কিন্তু মনে রাখিস, গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হলে এক লাথি মেরে তোর...

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই শুরু করে দিল রানা।

'কোয়াজের কাছাকাছি তোদের সার্ভেইলান্স শিপ বিস্ফোরিত হয়েছে। কারণ অজ্ঞাত। এজন্যে আমেরিকানরা কোনও ভাবেই দায়ী নয়, রিপিট, আমেরিকানদের কারণে ঘটেনি এটা।

'কোনও সংকটে পড়েছিল জাহাজটা, ওপেন চ্যানেল থেকে কোয়াজ বেস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে সাহায্য চায়। আমি নুমার একটা কাজে কোয়াজে আছি, ওদের মেডে কল আমিই রিসিভ করি। তোদের জাহাজের কমান্ডার লিউ ইয়ান আর সিক্রেট সার্ভিসের মেজর ইউ মিন-এর সঙ্গে আমার কথা হয়। জাহাজটায় সাহায্য পাঠাবার প্রস্তুতি চলছে, এই সময় ওটা বিস্ফোরিত হয়েছে।

'আমি ধারণা করছি, বেইজিং আর জাতিসংঘে ওয়াশিংটন যে প্রতিবাদ জানিয়েছিল তা আজকের মধ্যেই কোনও এক সময় প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। কোয়াজের চারপাশে যা ঘটছে তার জন্যে চিন দায়ী নয়। যদি সম্ভব হয়, তোদের প্রাইম মিনিস্টারকে জানিয়ে রাখতে পারিস, এখন থেকে পনের মিনিটের মধ্যে হটলাইনে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ভুল বোঝাবুঝির জন্যে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবেন।

'আমরা এখন অকুস্থলে যাচ্ছি, জাহাজের কেউ বেঁচে থাকলে উদ্ধার করব।'

'ওহ্ গড! ওহ্ গড! রানা, আর ইউ অ্যাবসলিউটলি শিওর অ্যাবাউট দিস?'

'ইয়েস, মাই ফ্রেন্ড,' শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল রানা।

'এখন আমি কী করি, রানা? প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে—কোয়াজে পাল্টা আঘাত করা হবে! অর্ডার-এ শুধু প্রাইম মিনিস্টারের সই বাকি! এতক্ষণে বোধহয়...' অকস্মাৎ আর্তনাদ করে উঠল ফুচুং, '...ওহ্ গড! তুই কোয়াজে?'

'হ্যাঁ।'

'ওহ, অলমাইটি গড! আমরা কোয়াজ উড়িয়ে দিচ্ছি, রানা!'

'যেভাবে হোক ঠেকা, দোস্ত,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা, তারপর একটা ঢোক গিলল।

খোলা জানালা দিয়ে সাগর আর আকাশের দিকে তাকাল ও। আকাশে মেঘ নেই। কোনও মিসাইল বা প্লেনও নেই। সাগরও ফাঁকা। তবে পানির নীচে কী আছে কে জানে!

সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। এবার নুমা চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করল। পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকেও সংক্ষেপে একটা ধারণা দিল ও। সবশেষে বলল কী করতে হবে।

'গড অলমাইটি!' সব শুনে বিড়বিড় করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'প্রার্থনা করো, যাতে সময় পাই!'

লাইন থেকে সরে গেলেন নুমা চিফ। চেয়ারে হেলান দিল রানা, অপেক্ষা করছে। চোখ বুজল, কল্পনায় ভবিষ্যৎ দেখতে চাইছে। চিনাদের সিচোয়ান ঘাঁটিতে মিসাইল বা সাবমেরিন নেই, কাজেই ওদিক থেকে কোনও বিপদের আশঙ্কা না করলেও চলে।

সাংহাই কিংবা বেইজিং থেকে রওনা হয়ে মাঝপথে রয়েছে একটা আইসিবিএম। কিংবা কোনও চিনা সাবমেরিন থেকে ছোঁড়া হয়েছে ওটা। কোয়াজ অ্যাটল, সবাইকে নিয়ে, আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ওই বিষাক্ত সাপলতা যে হারে বাড়ছে তাতে দুনিয়ার সবগুলো সমুদ্র ভরাট করে ফেলতে খুব বেশি সময় নেবে না, তার আগেই একটা আইসিবিএম যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে দেয়, সেটাই বা মন্দ কী!

অ্যাই! নিজেকে ধমক মারল রানা। *অলস মস্তিষ্ক দেখা যাচ্ছে আসলেও শয়তানের বাসা!*

মাথা ঝাঁকিয়ে অসার চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলল ও। ওই বিষাক্ত লতার পিছনে কারা আছে ঠিকই খুঁজে বের করবে ওরা। ওটাকে থামাবার উপায়ও জেনে নেবে। তবে এ-সব ওদেরকে করতে হবে

খুব বেশি ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আগেই।

জর্জ হ্যামিলটনের কণ্ঠস্বর কাঁপা কাঁপা। 'ডান, মাই সান। মিস্টার প্রেসিডেন্ট এই মুহূর্তে চিনা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন।'

'থ্যাঙ্ক গড!' বলল রানা, স্বস্তির নিঃশ্বাসটা ধীরে ধীরে ছাড়ছে। 'আশা করি ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলতে পারবেন তাঁরা।'

'পারা উচিত, রানা, পারা উচিত।' নুমা চিফ পাইপে আগুন ধরাচ্ছেন, লাইটার জ্বালার আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। 'পরিস্থিতি এরকম সিরিয়াস হয়ে উঠল কী করে, রানা? চিনা জাহাজ বিপদে পড়ল কেন? কারা ধ্বংস করল ওটা?'

'জাহাজটা কী কারণে বা কেন বিস্ফোরিত হয়েছে, জানি না, সার,' বলল রানা। 'আর সেই সাবমারসিবল, আর এয়ারট্যাংক-বিহীন সেই ডাইভারদের ব্যাপারেও আমরা অন্ধকারে।'

'একটার সঙ্গে আরেকটার যোগাযোগ আছে বলে মনে করছ?'

'জী,' বলল রানা। 'এর মধ্যে আরও একটা রহস্য আছে, সার।'

'তা-ই?'

ওদের ইবাযি যাওয়ার ব্যাপারটা রিপোর্ট করল রানা। অদ্ভুত সামুদ্রিক লতার বর্ণনা দিল। বলল আদিবাসী ডাইভারদের লাশ পরীক্ষা করে তাদের কারও গায়ে কোনও ফুটো বা দাগ দেখতে পায়নি। আমেরিকান ক্রুর কথাও জানাল, লেগুনের পানিতে পড়ে যাওয়ায় কী করুণ মৃত্যু হয়েছে বেচারার।

সবশেষে বলল, 'ওই বিষাক্ত লতার কথা বলতেই রেডিও সাইলেন্স ভেঙে কোয়াজের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল চাইনিজ সার্ভেইলান্স শিপ। এই একই লতা ওদের জাহাজের চারদিকে দ্রুত বাড়ছিল, ওটা কী দেখতে গিয়ে ওদের কয়েকজন লোক মারাও গেছে।'

'সাগরে?' জিজ্ঞেস করলেন নুমা চিফ।

'তাই বলেছে ওরা।'

কয়েক হাজার মাইল দূরে এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে আছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। নীরবতা দীর্ঘ হচ্ছে।

'সার?'

তারপরেও সাড়া নেই। অবশেষে ধীর, লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার আওয়াজ শুনল রানা, তারপর আবার নুমা চিফের গলা ভেসে এল। নিচু কণ্ঠস্বর, প্রায় ফাঁপা। 'সামুদ্রিক ওই লতাগুলো বড় হচ্ছে, খালি চোখে দেখেছ?'

'জী।'

ওয়াশিংটনে আরেকটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। 'অবিশ্বাস্য হলেও, এরকম বিদঘুটে ব্যাপার সত্যি সত্যি ঘটছে। তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার খানিক আগে ইন্দোনেশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস চিফ, উর্বশীর বসের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তিনিও এই সামুদ্রিক লতার কথা বললেন।'

'কী রকম, সার?' আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তেলুক সেন্দ্রাওয়াসি উপসাগরের ওদিকে, ইরিয়ান জায়া দ্বীপপুঞ্জের ছোট্ট একটা দ্বীপ কুরুডুতে থাকেন প্রবীণ এক ডাচ ফাদার। দুদিন আগে রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য হলো, ওদিকের একটা খাঁড়ি রাতারাতি সামুদ্রিক লতায় ভরে গেছে। ওগুলো নাকি এত দ্রুত বাড়ছে, খালি চোখে দেখা যায়। পশুপাখি ওই আগাছার সংস্পর্শে এলে মারা যাচ্ছে। মরা মাছে ভরে উঠেছে খাঁড়িটা, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।'

এবার রানার চুপ করে থাকার পালা।

নুমা চিফ বলে চলেছেন, 'কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করছে না, ভাবছে বাহাত্তুরে পড়ে প্রলাপ বকছেন। কিন্তু এখন তো দেখছি...

'ইরিয়ান জায়ায়?'

'দুদিন আগে,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'ওখানে আমি যেতাম, সার,' বলল রানা। 'কিন্তু আমাকে

প্রথমে একবার দেশে ফিরতে হবে।'

'কী ব্যাপার, রানা?' কথাটা শুনে বিস্মিত হলেন নুমা চিফ।

'স্যার,' বলল রানা, 'বস্ আমাকে জানিয়েছেন আমাদের সুন্দরবনেও এই একই আলামত দেখা গেছে। শুধু পশুপাখি নয়, মানুষ মারা যাবারও রিপোর্ট আসছে...'

'ও, বুঝেছি, সুন্দরবনের লেটেস্ট নিউজটা এখনও তুমি পাওনি,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ঘণ্টাখানেক আগে তোমার বসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

'জী?'

'শুনলে তুমি অবাক হবে, রানা,' বললেন নুমা চিফ। 'খুশিও হবে। রাহাত আমাকে জানাল, সুন্দরবনের যে-সব নদীর মোহনায় রাতারাতি সামুদ্রিক আগাছা দেখা গিয়েছিল, হঠাৎ করেই আবার সব গায়েব হয়ে গেছে। পানি একেবারে পরিষ্কার, কোথাও কোনও আগাছার চিহ্নমাত্র নেই।'

'কী বলছেন!' রানা খুশি, তবে বিমূঢ়ও। 'কীভাবে?'

'তা কেউ বলতে পারছে না, রানা।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কেউ এক্সপেরিমেন্ট করছে, সার?'

'এখন তো তাই মনে হচ্ছে।'

'আপনার কাছে এ-ধরনের আর কোনও রিপোর্ট আছে, সার?'

'এখনই ল্যারি কিংকে কমপিউটার চেক করে দেখতে বলব,' জানালেন অ্যাডমিরাল।

'আমি তা হলে আর দেশে ফিরছি না,' বলল রানা। 'এদিকটায় ঘুরে দেখি কোনও ক্লু পাই কি না। দুজন সারভাইভারকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তারা যদি কিছু বলতে পারে। চিনা জাহাজ যেখানে বিস্ফোরিত হয়েছে সেখানেও কোনও এভিডেন্স থাকতে পারে।'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ও রানা, দুজনের হাতেই জরুরি কাজ

রয়েছে, অথচ দুজনের কেউই বিদায় নিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করছে না। ওরা আসলে অপেক্ষায় রয়েছে। মুহূর্তগুলো পার হচ্ছে নীল-সাদা আগুনের ঝলক আর ব্যাঙের ছাতা আকৃতির মেঘের নীচে কখন কোয়াজালিয়েন অদৃশ্য হয়ে যাবে তার অপেক্ষায়। কোয়াজালিয়েন, নয়তো ওয়াশিংটন। আজকের পর আর হয়তো পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে না।

দুনিয়া না থাকলে দুনিয়াদারিও থাকবে না, থাকবে না কাউকে রক্ষা করবার কঠিন দায়িত্বও। আহ্, কী শান্তি!

তারপর হঠাৎ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কণ্ঠস্বর আবার ভরাট ও ভারী শোনাল। 'চাইনিজ প্রাইম মিনিস্টার আমাদের ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন, রানা। এরইমধ্যে ওই এলাকায় ওরা একটা জাহাজ পাঠিয়েছে। বলছে খুব তাড়াতাড়ি একজন বায়োলজিকাল ওঅরফেয়ার এক্সপার্টও পাঠাবে, ভাইস অ্যাডমিরাল ডোনাল্ড ম্যাকমোহনের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে।'

'গুড নিউজ, সার,' শান্ত সুরে বলল রানা।

'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'খুব কম লোকই জানবে কত বড় একটা বিপর্যয় থেকে তুমি দুনিয়াটাকে বাঁচিয়েছ!'

'নিজেকেও, সার,' হেসে উঠে বলল রানা। 'চিনারা প্রথম আঘাতটা হানতে যাচ্ছিল কোয়াজে।'

'আই উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক, মাই সান,' বলে যোগাযোগ কেটে দিলেন জর্জ হ্যামিলটন।

ভাইস অ্যাডমিরালের চেম্বারে একা শুধু তাঁকেই পেল রানা। ওকে ভিতরে ঢুকতে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

সারা জীবন বিনা প্রশ্নে নির্দেশ পালন করতে অভ্যস্ত ম্যাকমোহন, তবে সে-সব নির্দেশ সব সময় উপরমহলের কোনও কর্তাব্যক্তির কাছ থেকে এসেছে। রানার মত একজন বিদেশী স্পাই মাথার উপর ছড়ি ঘোরাবে, এটা অন্তর থেকে মেনে নিতে

খুব কষ্ট হচ্ছে তাঁর। ভাবছেন, উপরওয়ালাদের কাছে না-জানি কী রিপোর্ট করেছে রানা তাঁর নামে।

ভাইস অ্যাডমিরালের চেহারা দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল রানা। শান্ত বিনয়ের সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করল ও।

রানা থামতে ম্যাকমোহন ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইলেন, 'আপনি এখন কী করবেন বলে ভাবছেন, মিস্টার রানা?'

'আমি এবার পূর্ণোদ্যমে ওই লতা আর সাবমারসিবলের পেছনে লাগব,' বলল রানা। 'প্রয়োজনে আপনার সাহায্য পাব আশাকরি?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়! যখন যা দরকার শুধু মুখ ফুটে বলবেন, প্লিজ।' খুশি হয়ে উঠলেন ভাইস অ্যাডমিরাল। বুঝতে পেরেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে কিছু বলেনি এই বিদেশি যুবক, সামান্যতম ঔদ্ধত্যও দেখাচ্ছে না। 'এখন কোনও সাহায্য দরকার, মিস্টার রানা?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল রানা।

যেন নতুন প্রাণশক্তি ফিরে পেয়েছেন ম্যাকমোহন, কারণ আশ্বাস পেয়েছেন তাঁর ছোট্ট সাম্রাজ্যে কেউ তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছে না। 'চিনাদের সাহায্যে রেসকিউ বোট আর হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছে, মিস্টার রানা। একজোড়া সার্চ প্লেন ওই সাবমারসিবল বা অন্য কোনও এভিডেন্স-এর খোঁজ করছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পার্ল হারবার থেকে প্যাথোলজিস্টদের টিমটা পৌঁছে যাবে...'

'দেখা যাচ্ছে, সবদিক চমৎকার ভাবে সামলে নিয়েছেন আপনি,' বলে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উর্বশীর কোয়ার্টারে চলে এল রানা।

উর্বশী ওর জিনিস-পত্র গোছগাছ করছে।

'কোথাও চললে?'

'হ্যাঁ,' কাজ থেকে মুখ তুলে বলল উর্বশী। 'আমাকে দেশে

ডেকে পাঠানো হয়েছে।'

'বিশেষ কোনও কারণ?'

শ্রাগ করল উর্বশী, হাসল মৃদু। 'রি-অ্যাসাইনমেন্ট। আওয়ারস্ ইজ নট টু কোয়েশ্চন হোয়াই, ব্রাদার।' চোখের দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ হলো। 'তুমি আসলে কে, রানা?'

'ও, আচ্ছা, ওই প্রায়োরিটি কোড সম্পর্কে জানতে চাইছ।' মৃদু হাসল রানা। 'সংক্ষেপে, আমার প্রতি নুমা চিফের অঢেল স্নেহ ও বিশ্বাসের একটা নিদর্শন। ব্যস, এরমধ্যে আর কিছুই নেই। এতক্ষণে বদলে গেছে কোড। আবার আমি আর সবার মতই সাধারণ এক এজেন্ট–বিদেশে বেকায়দায় ধরা পড়ে গেলে নিজের দেশ যাদেরকে অস্বীকার করে।'

নিঃশব্দে হাসল উর্বশীও। 'ভবিষ্যতে আবার হয়তো আমাদের দেখা হতে পারে, রানা। ভাবছি, তখন তুমি আমাকে চিনতে পারবে তো?'

'চলো, তোমাকে প্লেনে তুলে দিই, সিসটার,' খোঁচাটা গায়ে না মেখে বলল রানা। 'নাকি মিস্টার রেডক্লিফের কাছ থেকে বিদায় নিতে ট্রেসপাসে যাবে?'

'তিনি খুব ব্যস্ত, তাই ওঁর কাছ থেকে আমি টেলিফোনে বিদায় চেয়ে নিয়েছি,' বলল উর্বশী।

'কী নিয়ে ব্যস্ত?'

'ট্রেসপাস থেকে চিনা নৌ-কর্মকর্তা আর এক্সপার্টদের সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে ওঁকে,' বলল উর্বশী। 'কেউ বোধহয় ওঁর কানে কথাটা তুলেছে–চিনাদেরকে দু'চোখে দেখতে পারেন না ভাইস অ্যাডমিরাল, তাই নেগোসিয়েশনের ব্যাপারটা পুরোপুরি তাঁর হাতে ছেড়ে দেয়া বোধহয় ঠিক হবে না।'

এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছে জিপ থেকে নামল ওরা। বিদায়ের ঠিক আগের মুহূর্তে আবেগের রাশ টেনে রাখতে না পেরে দু'ফোঁটা জল বেরিয়ে গেল উর্বশীর চোখ থেকে। রানাকে একটা চুমো দিয়েই

ছুটে চলে গেল প্লেনের দিকে।

প্লেনটা টেকঅফ করবার পর জিপে ফিরে এসে ড্রাইভারকে রানা বলল, 'হসপিটালে চলো।' অল্প কদিনের পরিচয়, তবে মেয়েটার সঙ্গে সময়টা সত্যিই খুব ভাল কেটেছে; সেই সুখস্মৃতি মাঝে মধ্যেই আনমনা করে তুলবে ওকে, ফলে ওর নিঃসঙ্গতা আরও কিছুটা গভীর হবে।

দশ

ইবায়ির ওদিক থেকে সর্পলতা আর পানির নমুনা নিয়ে এইমাত্র হসপিটালে ফিরে এসেছে ল্যাব টিম।

রানা পৌঁছে দেখল ভারী প্রোটেকটিভ কাপড়চোপড় খুলতে ব্যস্ত তারা, একই সঙ্গে গ্লাভ বক্সে করে নিয়ে আসা নমুনাগুলো দেখছে। সমস্ত টক্সিক ও রেডিওঅ্যাকিটিভ পদার্থ এই বক্সেই রাখা হয়।

'দেখছেন, কাটার পরেও বাড়ছে ওগুলো,' চিফ ফার্মাসিস্টের সহকারী বলল রানাকে, পানি ভরা বোতলের ভিতর সবুজ লিকলিকে লতার দিকে তাকিয়ে আছে। বোতলের পানিতে প্রায় সাপের মতই অলসভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে ওগুলো। 'ইবায়ির ওদিকের লেগুনে এরইমধ্যে একমাইল লম্বা হয়ে গেছে এই লতা. দিন-দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে যাবে কোয়াজে।'

'কিছু আন্দাজ করতে পারছেন, জিনিসটা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কী ধরনের পয়জন ইনভলভড়?'

ল্যাব ডাক্তার মাথা নাড়লেন। 'লেগুনের পানিতে কয়েকটা প্রাথমিক টেস্ট করেছি আমরা, এখন পর্যন্ত পরিচিত কিছু পাইনি।'

'জাপানে গবেষণা করা হচ্ছিল খাওয়ার যোগ্য এক ধরনের সামুদ্রিক উদ্ভিদ নিয়ে,' টেকনিশিয়ানদের একজন বলল। 'এগুলো অনেকটা সেরকমই দেখতে। পাতার প্যাটার্নে অদ্ভুত কিছু অমিল আছে, কিন্তু আমি সেটা ঠিক ধরতে পারছি না। ওগুলো নরমাল স্পিশিজ-এর মতই, তবে অস্বাভাবিক শক্তিশালী আর বাড়েও খুব দ্রুত।'

'এই আকৃতির শুঁটি কখনও কোনও চারায় দেখিনি আমি,' অন্য একজন টেকনিশিয়ান উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, চোখে-মুখে গভীর উৎকণ্ঠা। 'ঠিক যেন খুদে লাটিম।'

ওদেরকে নির্বিঘ্নে কাজ করতে দিয়ে ওখান থেকে চলে এল রানা। করিডর ধরে সোজা এসে ঢুকল হসপিটাল ডিরেক্টরের কামরায়।

ইনি নেভির ডাক্তার। রানাকে দেখামাত্র লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লেন। সন্দেহ নেই, ভাইস অ্যাডমিরাল চারদিকে কথাটা ছড়িয়ে দিয়েছেন যে রানাকে পুরোদস্তুর ভিআইপি-র মর্যাদা দিতে হবে।

'বলুন, মিস্টার রানা, আপনার জন্যে কী করতে পারি আমি?' জানতে চাইলেন ডিরেক্টর।

'ইবায়ির দুজন অসুস্থ ডাইভারকে এখানে ভর্তি করা হয়েছে,' বলল রানা। 'আমি ওদেরকে দেখতে এসেছি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডিরেক্টর। 'ও, হ্যাঁ। দুঃখিত, সার। চোখে পড়ার মত জখম নেই কোথাও, টেস্টেও কোনও পয়জন ধরা পড়েনি, কিন্তু এরইমধ্যে মারা গেছে একজন। আরেকজনের অবস্থাও ভাল নয়।'

'আমি দেখতে পারব?' জানতে চাইল রানা।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে কাঁধ ঝাঁকালেন ডিরেক্টর, বললেন, 'ঠিক

আছে, চলুন।' রানাকে নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এলেন তিনি।

সামনে একটা ডেস্ক পড়ল, পথ আগলে রেখেছে। ডেস্কের পিছনে ঝগড়াটে চেহারা নিয়ে বসে আছে এক মধ্যবয়স্কা নার্স। নার্সের পিছনে, একটা বন্ধ কামরার বাইরে, কোয়াজালিয়েনদের সর্দার গুড সানমুনকে দেখতে পেল রানা। লম্বা একটা বেঞ্চে বসে চোখ মুছছে সে। ওকে দেখে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'কে মারা গেল, সানমুন?' ডেস্কটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল রানা, ওর পিছু নিয়ে আসছেন ডিরেক্টর, তাঁর পিছনে নার্স।

'ওর নাম মোয়াবু,' বলল সরদার সানমুন। 'আমার চাচাতো ভাইয়ের ছেলে। বউ আছে। তিনটে বাচ্চা। ওরা একেবারে পথে বসল, সার!'

'দুঃখিত, সানমুন।'

'অপর লোকটার নাম তানুম, আমেরিকান নেভিতে ছিল।'

ডিরেক্টর দরজা খুলে ধরলেন, নীরব হসপিটাল কেবিনে ঢুকল রানা। একটাই বেড, তাতে রোগা-পাতলা এক তরুণ শুয়ে আছে। খোলা চোখ দুটো সিলিঙের গায়ে স্থির। তাকিয়ে আছে, কিন্তু দেখছে না।

নার্সকে ঠেলে রানার পাশে চলে এল সরদার। 'তানুম?' নরম সুরে ডাকল সে।

কোনও সাড়া নেই। এক চুল নড়ছে না লোকটা। খোলা চোখ দুটো কোন্ সুদূরে তাকিয়ে আছে কে বলবে। হাত দুটো শরীরের পাশে শক্ত লাঠির মত পড়ে আছে।

'কী হয়েছিল বলবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পানিতে,' বললেন ডিরেক্টর। 'লেগুনে।'

চোখ মিটমিট করল লোকটা। অকস্মাৎ ঝাঁকি খেল তার সারা শরীর। কোটরের ভিতরে পাক খাচ্ছে চোখের মণি। পাকানো মুঠো হয়ে গেল হাত। এই অবস্থায় স্থির হয়ে থাকল সে।

'পানি শব্দটা কানে গেলেই রিয়্যাক্ট করছে পেশেন্ট,' ফিসফিস

করলেন ডিরেক্টর, তারপর গলা চড়ালেন, 'পানি, তানুম। পানিতে কী হয়েছিল?'

আড়ষ্ট হয়েই থাকল লোকটা। বেডের আরও কাছে গিয়ে দাঁড়াল সরদার সানমুন। কোয়াজালিয়েন ভাষায় কিছু বলল সে। এমনভাবে কেঁপে উঠল তানুম, কিছু যেন কামড় দিয়েছে। তারপর কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল শরীরটা, দু'হাত তুলে মুখ ঢাকল। নিজের ভাষায় চিৎকার করে কিছু বলছে।

'কী বলছে, সরদার?'

চোখে-মুখে কোনও ভাব নেই, তরজমা শুরু করল সানমুন। 'বাড়ছে লতা! খসখস! খসখস! লেগুন ভরে যাচ্ছে লাটিমে! খসখস করছে! বুদ্বুদ, বুদ্বুদ! জ্বলে গেল! পুড়ে গেল!' কাঁধ ঝাঁকাল সরদার। 'এইসবই বলছে বারবার।'

'এরকম প্রলাপ থেকে,' ডিরেক্টর বললেন, 'আপনি কোনও সূত্র পাবেন বলে মনে হয় না, সার।'

'কী জানি,' শ্রাগ করে বলল রানা। 'ভুক্তভোগীর প্রলাপ থেকে অনেক সময় পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়।' একটু ঘুরে সানমুনের দিকে তাকাল ও। 'আমাকে আপনি ইবায়িতে নিয়ে যেতে পারেন?'

ওর দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সরদার। 'ক্যানু চড়তে ভয় পান না তো, বস্?'

'না,' বলল রানা। এই মুহূর্তে অফিশিয়াল কোনও বাহন ব্যবহার না করাই ভাল বলে মনে হচ্ছে ওর। ধীরেসুস্থে, একা কাজ করতে চাইছে। এই ব্যাপারটার সঙ্গে কে জড়িত নয় বলা মুশকিল।

দু'সারি নারকেল গাছের মাঝখান দিয়ে পরিচ্ছন্ন রাস্তা। রানাকে নিয়ে লেগুনের ডকে চলে এল সরদার। পানিতে সেইলবোট, পাওয়ারবোট আর ওয়াটার স্কি-র ভিড় দেখল রানা। ওগুলোর মধ্যে সানমুনের ক্যানুটাও বাঁধা রয়েছে বহুকাল আগে

আদিবাসীদের জন্য তৈরি নড়বড়ে কাঠের জেটিতে।

বৈঠা মেরে গভীর পানিতে চলে এল সানমুন, তারপর পাল তুলে দিতেই তরতর করে এগোল তার ক্যানু।

কোয়াজালিয়েন থেকে ইবায়ির দিকে অর্ধেক পথও পেরোয়নি ওরা, লেগুনের পানি গাঢ় হতে শুরু করল, সর্পলতার ডগাগুলো পানির সারফেসের উপর মাথা তুলে যেন ফণা দোলাচ্ছে, যাচ্ছে শুধু দক্ষিণ দিকে। ক্যানুর গতি কমল, তবে খুব বেশি নয়, যেন পুরু আগাছার উপর দিয়ে পিছলে এগোচ্ছে ওরা।

'একটু পিছিয়ে বসুন, বস্,' নির্দেশ দিল সরদার। 'ক্যানুর আগাটা যাতে উঁচু হয়ে থাকে।'

পিছিয়ে গেল রানা। সানমুনের মনে হচ্ছে লতার লূপগুলো যেন ক্যানুটাকে পেঁচিয়ে ধরবার চেষ্টা করছে। ক্যানুর বো যথেষ্ট উঁচু, লতাগুল্মের বাধা অগ্রাহ্য করতে পারছে। তবে ওগুলো আরও ঘন হয়ে উঠলে ক্যানুটা অচল হয়ে যেতে পারে।

গা ছমছমে, ভৌতিক একটা পরিবেশ। যতদূর দৃষ্টি যায় খাঁ-খাঁ করছে খালি লেগুন। অথচ এই সময় ঝপাঝপ বৈঠা মেরে অসংখ্য ক্যানুর চারদিকে ছুটোছুটি করবার কথা ।

ধীরে ধীরে আরও পুরু হয়ে উঠল সর্পলতা। রানার মনে হলো, ওগুলোর উপর দিয়ে অনায়াসে হাঁটতে পারবে ও। ক্যানুর গতি আরও কমে এল, তবে পালে হাওয়া থাকায় অচল হয়ে পড়ছে না।

এক সময় ইবায়ির ভাঙাচোরা জেটিতে ভিড়ল ওদের ক্যানু। জেটি বা লেগুনের তীর ধরে যতদূর দৃষ্টি যায় কেউ কোথাও নেই। এমনকী কাছাকাছি কুঁড়েগুলোকেও ফাঁকা মনে হলো রানার। ক্যানুটাকে ভাল করে বেঁধে সাবধানে জেটিতে উঠল সানমুন। রানা আগেই উঠেছে।

'তানুমের ঘরটা কোন্দিকে?' জিজ্ঞেস করল ও।

সারি সারি নারকেল গাছের ভিতর দিয়ে সরু পথ চলে গেছে।

রানাকে নিয়ে একটা আধপাকা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সরদার। টিনের ছাদ থেকে লতানো লাউয়ের ডগা ঝুলতে দেখল রানা।

বাড়িটার পিছনে সবজি খেত, হাতে দা নিয়ে সেখানে কাজ করছে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের এক শ্বেতাঙ্গিনী। সানমুনকে দেখে ব্লাউজের হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল সে, পিছিয়ে গিয়ে গাছের ছায়ায় ফেলা একটা মোড়ার উপর বসল। সানমুনের দিকে তাকিয়ে হাসল সে, তবে তাতে প্রাণ নেই।

'কেমন দেখলেন ওকে, সরদার?' শান্তভাবে প্রশ্ন করল সে।

'সেই একই রকম,' মাথা নেড়ে বলল সে, তারপর রানাকে দেখাল। 'ইনি মাসুদ রানা, নুমার খুব বড় অফিসার। সিউইড কেসটা তদন্ত করছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। কিছু প্রশ্ন করবেন।' রানার দিকে ফিরল সর্দার, 'বস্, ইনি লিডিয়া–মিসেস তানুম।'

রানার দিকে তাকাল লিডিয়া তানুম। 'কী জানতে চান, মিস্টার রানা?'

'আপনি আমেরিকান?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল মিসেস লিডিয়া। 'তানুমকে বিয়ে করার পর থেকে আমি কোয়াজালিয়েন।'

'আপনার স্বামী মার্কিন নেভিতে কী কাজ করতেন?'

'কী আবার, কোয়াজালিয়েনরা সবচেয়ে যেটা ভাল পারে–ডাইভিং। ফ্রগম্যান ছিলেন আমার স্বামী।'

'চাকরিটা তিনি ছাড়লেন কেন?

'আমাকে বিয়ে করায় ওঁর চাকরি চলে যায়।'

'কেন?'

'আদিবাসীরা ওদের দ্বীপ ফিরে পাবার জন্যে আন্দোলন করছে,' বলল লিডিয়া। 'আমি সেই আন্দোলনের একজন সংগঠক।' তিক্ত হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'আমার অপরাধে স্বামী

অপরাধী।'

'তানুম কখনও দ্বীপ ছেড়ে কোথাও গেছেন?'

মাথা নাড়ল লিডিয়া। 'না, বহু বছর কোথাও যাননি।'

'চাকরি গেছে কতদিন হলো?' জানতে চাইল রানা।

'তা-ও তো প্রায় চার বছর হতে চলেছে।'

'সেই থেকে ওদের নেভির সঙ্গে তানুমের কোনও সম্পর্ক নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কিংবা কোয়াজ ঘাঁটিতে আসা-যাওয়াও নেই?'

'না, আমার স্বামী কোনও সম্পর্ক রাখেননি,' বলল লিডিয়া। 'এমনকী যে-সব পদক পেয়েছিলেন সেগুলোও সব লেগুনের পানিতে ফেলে দিয়েছেন। শুধু একটা জিনিস ফেলতে পারেননি–ওয়েট সুটটা।'

'ওয়েট সুট?' তীক্ষ্ণ হলো রানার দৃষ্টি। 'ডাইভ দেয়ার সময় আপনার স্বামী ওয়েট সুট পরেন? মানে, এখনও? যেদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন?'

'হ্যাঁ,' বলল মিসেস তানুম।

'অপর ডাইভার,' দ্রুত সানমুনের দিকে ফিরল রানা, 'সরদার? যে লোকটা মারা গেছে হাসপাতালে? সে-ও কি ওয়েট সুট পরে ছিল?'

'হ্যাঁ, মোয়াবু সুট পরত।'

'তানুমের ওয়েট সুটটা কোথায়?'

'ওঁর ফেরার অপেক্ষায় সব সাজিয়ে রেখেছি ঘরে,' বলল লিডিয়া।

'আমি ওটা একবার দেখতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যান, দেখে আসুন,' ইঙ্গিতে বাড়ির দরজাটা দেখিয়ে দিল মিসেস তানুম।

একাই ভিতরে ঢুকল রানা। দুটো মাত্র ঘর। বেডরুমটা পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো। একটাই জানালা, ওটার সামনে

ফেলা লম্বা ও নিচু টেবিলে পুরোদস্তুর ওয়েট সুট আর ডাইভিং ইকুইপমেন্ট গুছিয়ে রাখা হয়েছে।

দু'হাতে গ্লাভ পরে নিয়ে প্রতিটি জিনিস নেড়েচেড়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা: দুই প্রস্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ ওয়েট সুট; রাবার গ্লাভ, ফিন, মাস্ক, সুটের উপর আর নীচে ওয়াটারটাইট সেলাই।

পুরো পরিচ্ছদটাই ওয়াটারপ্রুফ, তবে পরীক্ষা করে রানার মনে হলো মাস্কটার চারধারে সূক্ষ্ম লিক থাকা অসম্ভব নয়। তা ছাড়া, পরবার আগেও সাধারণত মাস্কটা একবার পানিতে ডুবিয়ে নেওয়া হয়।

পানি বা সর্পলতায় যে বিষ আছে সেটা চরম ক্ষতি করবে চামড়ার সংস্পর্শে এলে। তানুমের ওয়েট সুটে যে লিক আছে তাতে খুব সামান্য পানিই স্পর্শ করেছে তাকে। তাতে অসুস্থ হয়ে পড়লেও, অন্য ছয়জনের মত দ্রুত মারা যায়নি সে, এখনও মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে। এটা নিশ্চয় মোয়াবুর বেলায়ও সত্যি, মারা যেতে ওই ছয়জনের চেয়ে বেশি সময় নিয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে রানা দেখল সবজি খেতে আবার কাজ শুরু করেছে লিডিয়া তানুম। মোড়াটায় বসে হাত-পাখার বাতাস খাচ্ছে সরদার।

'ধন্যবাদ, মিসেস তানুম,' বলল রানা।

হাতের কাজ থামিয়ে মিসেস লিডিয়া জিজ্ঞেস করল, 'এ-সবে কি আমার স্বামীর কোনও উপকার হবে?'

'আশা তো করি।'

'তা হলে আমারই আপনাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত, মিস্টার রানা,' বলে আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মহিলা।

'আরেক ডাইভার, মোয়াবু,' সরদারের দিকে ফিরে বলল রানা। 'তার ওয়েট সুটও কি দ্বীপেই আছে?'

মাথা ঝাঁকাল সরদার। পথ দেখিয়ে রানাকে নিয়ে যাচ্ছে আরেকটা কুঁড়েতে।

মোয়াবুর পরিবার দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে। তাদের খালি ঘরের মেঝেতে স্তূপ হয়ে পড়ে রয়েছে ওয়েট সুটটা। মোয়াবু মারা যাওয়ার পর ভয়ে বোধহয় কেউ ওটার কাছাকাছি আসেনি। হাতে গ্লাভ রয়েছে, তাই নির্ভয়ে নেড়েচেড়ে দেখল রানা সুটটা।

'এটার গ্লাভ দেখছি না যে?' জানতে চাইল ও।

'ছিল না,' বলল সানমুন। 'মোয়াবু গ্লাভ পরতে পছন্দ করত না।'

চিন্তা করছে রানা। ওয়েট সুটের সবকিছু ওয়াটারপ্রুফ হলে কী হবে, লেগুনের পানিতে ডুব দেওয়ার সময় মোয়াবুর হাতে গ্লাভ পরা ছিল না। কাজেই পানিতে মিশে থাকা বিষ সরাসরি তার অনেকটা চামড়া স্পর্শ করেছে, সেই অনুপাতে বিষক্রিয়াও ছড়িয়েছে মোয়াবুর সারা শরীরে।

পানির মত, লতাগুলোর সরাসরি স্পর্শও নিশ্চয় একই রকম মারাত্মক হবে। তবে রানার জানা নেই দুই ডাইভারের কেউ জিনিসটা স্পর্শ করেছিল কি না।

'আপনি কি আবার কোয়াজে ফিরবেন, সরদার?' জানতে চাইল রানা।

'না, বস্। এখানে আমার অনেক কাজ। চলুন, আপনাকে আমার একটা ক্যানুতে তুলে দিই।'

বস্তি এলাকা ছেড়ে লেগুনের ধারে ফিরে এল ওরা। ডাঙায় তোলা ছোট একটা ক্যানুর দিকে হাত তুলল সানমুন। ধরাধরি করে জেটিতে এনে লেগুনে নামানো হলো সেটাকে, গায়ে পানি না লাগানোর ব্যাপারে দুজনেই অত্যন্ত সতর্ক থাকল।

'কোনও ঝুঁকি নেবেন না, বস্,' সাবধান করল সানমুন। 'পানি যেন না লাগে।'

'লাগবে না,' মৃদু হেসে তাকে আশ্বস্ত করল রানা, তবে বেশ কিছুটা নার্ভাস বোধ করছে।

হাতের গ্লাভ না খুলে ক্যানুতে একটু পিছিয়ে বসে সাবধানে

বৈঠা চালাচ্ছে রানা, খেয়াল রাখছে গায়ে যাতে পানির ছিটে না লাগে। পুরু আগাছার উপর ক্যানুর গতি কমে আসছে দেখে বৈঠা চালাবার গতি বাড়িয়ে দিল।

আরও কিছুদূর আসবার পর পাল তুলল রানা। বাতাস পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠল সেটা। দক্ষিণ দিকে ছুটছে ওর ক্যানু।

আগাছার বিস্তার কতদূর ছড়িয়েছে দেখে নিয়ে দিক বদলে পরিষ্কার পানিতে চলে এল ও, বিরাট একটা বৃত্ত তৈরি করে কোয়াজে ফিরছে। সরদার সাঁনমুনের মত অত দক্ষ মাঝি নয় ও, কাজেই কোনও ভুল করবার ঝুঁকি নেওয়া চলে না।

ঘুরপথ ধরে আসায় কোয়াজে ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। জেটি থেকে সোজা হেডকোয়ার্টারে চলে এল রানা।

জর্জ রেডক্লিফের সঙ্গে ভাইস অ্যাডমিরাল ম্যাকমোহন সাগরে গেছেন। সিচোয়ান রেইডার ঘাঁটি থেকে পাঠানো ক্রুজারে বসে চিনা কয়েকজন এক্সপার্টের সঙ্গে মিটিং করছেন তিনি। এক্সপার্টরা এসেছেন বিশেষ একটা প্লেনে চড়ে সরাসরি বেইজিং থেকে।

অফিসে রয়েছে একা শুধু মেজর টিমোথি। রানার অনুপস্থিতিতে কী কী হয়েছে সব জানা গেল তার কাছ থেকে।

প্লেন ও বোট নিয়ে গোটা এলাকা চষে ফেলা হয়েছে, কিন্তু চিনা সার্ভেইলান্স শিপের কোনও সারভাইভারকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ-ও জানা যায়নি কী কারণে জাহাজটা বিস্ফোরিত হয়।

মাথা নাড়ল মেজর। 'সামুদ্রিক লতা ওদিকে অসম্ভব পুরু। দাবাগ্নির মত ধাঁ-ধাঁ করে ছড়াচ্ছে। প্রচুর মাছ আর শুশুক দেখলাম, এমনকী একটা তিমিও চোখে পড়ল, স-ব মরে ভেসে উঠেছে। কদিন পর দুর্গন্ধে আর টেকা যাবে না এখানে। এভাবে যদি বাড়তেই থাকে...' চুপ করে গিয়ে আবার মাথা নাড়ল সে।

'পার্ল হারবার থেকে প্যাথলজি টিমটা এসেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল মেজর। 'লাশ নিয়ে কাজ শুরু করেছেন।

এখনও কোনও রিপোর্ট দেননি।'

ওখান থেকে হসপিটালের ল্যাবে চলে এল রানা।

ওকে দেখে চিফ ফার্মাসিস্টের সহকারী কাঁধ ঝাঁকাল। 'এখন পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি, সার,' বলল সে। 'আমরা চিনি এমন কোনও পয়জনের সঙ্গে এটাকে মেলানো যাচ্ছে না। জিনিসটা এমনকী পয়জন না-ও হতে পারে স্রেফ হয়তো সিউইডের সংস্পর্শে মানবশরীরে কোনও ধরনের প্রতিক্রিয়া।'

'চারাটাকে আইডেনটিফাই করা গেছে?' জানতে চাইল রানা।

'ফার ইস্টে খাওয়া হয়, এরকম একটা সাধারণ সামুদ্রিক লতার রূপান্তরিত সংস্করণ,' ধীরে ধীরে বলল লোকটা। 'তবে কী কারণে ওটা রূপ বদলেছে, তার কোনও সূত্র জানা নেই আমাদের। এ-ও জানি না, কীভাবে ওটা লেগুন বা সাগরে এল।'

'প্যাথলজিস্টরা কী বলছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'মৃত্যুর আসল কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারছেন না?'

'না, পারছেন না, সার। তবে আনঅফিশিয়ালি বলছেন, কেসটা নির্ভেজাল নার্ভ পয়জনিং-এর। যদিও সেই পয়জনটার টাইপ এখনও ওঁরা ধরতে পারছেন না। ওঁদের একজন আমাকে বললেন, অনেকটা সাপের বিষের মত। কিন্তু কোনও সাপের মধ্যে এই পয়জন আছে কি না জানা যায়নি এখনও।'

ল্যাব থেকে বেরিয়ে দীর্ঘ করিডর ধরে এগোল রানা, কোয়াজালিয়েন তানুম কেমন আছে দেখে যাবে। যদি সম্ভব হয় দু'একটা প্রশ্নও করবে তাকে। বিশেষ করে জানা দরকার লাটিম আর বুদ্বুদ শব্দ দুটো দিয়ে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছে সে।

ঝগড়াটে চেহারা নিয়ে সেই নার্স এখনও পথ আগলে বসে আছে করিডরে। মুখ তুলে রানাকে দেখে বলল, 'ও, আপনি।' হাসল না।

'কেমন আছে তানুম?' শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'বিকেলের দিকে বেশ ভালই তো দেখেছি। প্রলাপ বকাটা বন্ধ-

হয়েছে। চোখ বুজে শুয়ে আছে।'

'কথা বলা যাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কী জানি। ডাক্তারের ধারণা, তার প্রচুর উন্নতি হয়েছে। এ-ও বলতে পারি যে, বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু তার মনের অবস্থা জানা আমার সাধ্যের বাইরে। সেটা হয়তো জাপানি ডাক্তাররা ভাল বলতে পারবেন।'

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'জাপানি ডাক্তার?'

মাথা ঝাঁকাল নার্স। 'আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে পাঠিয়েছে, স্নেক পয়জনিং আর মেন্টাল হেলথ সম্পর্কে এক্সপার্ট।'

'কোথায় তাঁরা?' জানতে চাইল রানা।

'কোথায় মানে?' বিরস কণ্ঠে বলল নার্স। 'যেখানে থাকার কথা—কেবিনে, রোগীর কাছে।'

নার্সকে পাশ কাটিয়ে তানুমের কেবিনের দিকে এগোল রানা। টুলে বসে ঘুমে ঢুলছে গার্ড, ওর পায়ের শব্দে একটু তাকাল কি তাকাল না, মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ বুজল আবার।

দরজা খুলে কেবিনে ঢুকছে রানা, খসখসে একটা আওয়াজ ঢুকল কানে, তারপর 'ধপ' শব্দে কেউ লাফ দিল নরম মাটিতে।

কেবিনে আলো খুব কম, বেডের মাথার দিকে টিম-টিম করে একটা ল্যাম্প জ্বলছে। খোলা জানালার বাইরে সাগর এখন অন্ধকারে ঢাকা। কামরার ভিতরে ডাক্তারদের কাউকে দেখতে না পেয়ে ধক করে উঠল রানার বুকটা।

বেডে মড়ার মত পড়ে আছে রোগী, আলোটা কমানো বলে দোরগোড়া থেকে তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। দ্রুত আরেকবার চারদিকে চোখ বুলাল রানা, হাত চলে গেছে হোলস্টারে রাখা পিস্তলে। রোগী ছাড়া কামরার ভিতর আর কেউ নেই।

আবছা অন্ধকার ধীরে ধীরে চোখে সয়ে আসছে, রানা দেখল আগের মতই চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে তানুম, তবে চোখ দুটো বন্ধ,

হাত দুটো শরীরের পাশে লম্বা করা...

হঠাৎ লাফ দিয়ে সামনে এগোল রানা। তানুমের ডান কাঁধের দু'ইঞ্চি নীচে, হাতের ফোলা পেশিতে একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জ গাঁথা রয়েছে।

কাছে এসে রানা দেখল, সিরিঞ্জটা প্রায় খালি।

এগারো

পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে হাতে, কামরার চারদিক আরেকবার দেখে নিল রানা। না, কেউ কোথাও লুকিয়ে নেই।

খোলা জানালার উপর একটা চোখ রেখে তানুমের পালস দেখল রানা। স্বাভাবিক। ল্যাম্পের আলো বাড়িয়ে পরীক্ষা করল তাকে, চেহারায় ব্যথা-বেদনার কোনও ছাপ নেই। শান্তিতে ঘুমাচ্ছে লোকটা।

আলো কমিয়ে দ্রুত খোলা জানালার সামনে চলে এল রানা। সাগরের টানা বাতাস লাগায় পতপত করছে পরদাটা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নারকেল গাছের ভিতর দিয়ে হনহন করে এগোচ্ছে কয়েকটা ছায়ামূর্তি। বাঁকা একটা চাঁদের আলো পথ দেখাচ্ছে তাদেরকে।

বাকি সবার চেয়ে একটু পিছিয়ে পড়েছে দুজন, তাদের একজন ঘাড় ফিরিয়ে সরাসরি জানালার দিকে একবার তাকাল।

তবে প্রায় অন্ধকার কেবিনের ভিতর রানাকে সে দেখতে পাবে না।

জানালার গোবরাটে উঠল রানা, ওখান থেকে লাফ দিয়ে নীচের নরম জমিনে নামল, 'ধপ' শব্দটা মনে পড়িয়ে দিল, একটু আগে ঠিক এইরকম একটা শব্দ শুনেছে ও। নিঃশব্দে ছুটল রানা সচল ছায়াগুলোর পিছু নিয়ে।

চিন্তা করছে রানা। সিরিঞ্জে কিছুটা তরল পদার্থ এখনও আছে, পরীক্ষা করলে জানা যাবে কী ওটা। তবে তানুমকে খুন করবার জন্য কেউ পয়জন ইঞ্জেক্ট করে গেল, ব্যাপারটা ঠিক সেরকম মনে হচ্ছে না। তা হলে এতক্ষণে মারা যেত তানুম, কিংবা যন্ত্রণায় ছটফট করত।

সর্পলতা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে কেউ? ওটার সংস্পর্শে কেউ অসুস্থ হলে তাকে সদ্য আবিষ্কার করা অ্যান্টিডোট দিয়ে দেখা হচ্ছে সুস্থ করে তোলা যায় কি না?

অসম্ভব নয়।

কিন্তু মোয়াবুর বেলায় সে চেষ্টা করা হয়নি কেন?

হয়তো সুযোগ পায়নি তারা, পৌঁছবার আগেই মারা গেছে মোয়াবু।

জাপানি লোকগুলো নিজেদের পরিচয় গোপন রাখবার চেষ্টা করছে। এর মানে কি ওরা অবৈধ, অশুভ কিছুর সঙ্গে জড়িত? ওদের একজনকে ধরতে পারলেও অনেক প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যাবে।

লোকগুলো সামরিক শৃংখলা ও ছন্দ ধরে রেখে দুটো গলফ কোর্স-এর একটার দিকে এগোচ্ছে। অন্তত সাতজনকে দেখতে পাচ্ছে রানা। সামনে একজন, দু'পাশে একজন করে দুজন, তারপর তিনজন আর পিছনে একজন; যেন শত্রু-এলাকায় পেট্রল দিতে বেরিয়েছে, কিংবা কমান্ডো হামলা চালিয়ে ফিরে যাচ্ছে সুশৃংখলভাবে।

কোনও একটা গাড়ির হেডলাইটে মুহূর্তে জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সারি সারি নারকেল গাছ। আলোকিত জানালার ভিতর গান-

বাজনায় মেতে আছে কিছু লোক। গলফ ক্লাবে একটা পার্টি হচ্ছে, ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর ওপাশে নাচছে মেয়েরা।

সাতজনের গ্রুপটা সতর্কতার সঙ্গে, নিঃশব্দে এগোচ্ছে, যাতে কারও সামনে পড়ে না যায়; ফলে তাদের হাঁটার গতি খুব একটা দ্রুত নয়।

তবে গলফ কোর্সে পৌঁছে তাদের গতি বেড়ে গেল, কারণ এখানে কারও সামনে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। ইতিমধ্যে ওদের কাছাকাছি চলে এসেছে রানা।

অন্ধকার গলফ কোর্স। চাঁদটা বেশিরভাগ সময় গাছপালার আড়ালে ঢাকা থাকছে। কোর্সের এদিক-সেদিকে অসংখ্য গাছ দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোর আড়াল নিয়ে এগোচ্ছে ও। অন্ধকারে সাদা দেখাচ্ছে প্রতিটি বাঙ্কার, সাবধানে এড়িয়ে যাচ্ছে ওগুলো। সযত্নলালিত গ্রিন পেরুল দ্রুত। তারপর সামনে পড়ল আট-দশটা নারকেল গাছের তলায় মেইন্টেন্যান্স শেড।

পিস্তলের বদলে রানার হাতে এখন ছুরি।

এই প্রথম গ্রুপের বাকি সবার চোখের আড়ালে পড়ে গেল পিছনের গার্ড। ছোট একটা দোচালা আর গাছগুলোকে পাশ কাটিয়ে হনহন করে এগোচ্ছে সে, আরেক পাশের ঘন ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল রানা।

লোকটাকে বন্দি করতে চায় ও। আক্রান্ত না হলে আঘাত করবে না। দুজনের মাঝখানে দূরত্ব খুব কম নয়। চাপা গলায় বলল ও, 'হল্ট!'

পলকের জন্য থমকাল লোকটা, চাঁদ আর তারার আলোয় তার হাতে কিছু একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎ খেলে গেল লোকটার শরীরে।

স্যাৎ করে সরে গেল রানা, দেখল আরেকবার ঝিক করে উঠে ওর কাঁধের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা ছুরি।

রানা ছুরিটাকে ফাঁকি দিয়েছে টের পেয়ে 'শালা কুত্তা' বলে

গালি দিল লোকটা। দাঁতে দাঁত পিষে কাঁধ থেকে ছোট, ভোঁতা চেহারার সাবমেশিন গানটা নামাচ্ছে।

'বোকামি কোরো না!' বিশ হাত দূর থেকে জাপানি ভাষায় বলল রানা। 'হাতের ওটা ফেলে দাও! আমরা শুধু জানতে চাই...'

'মর ব্যাটা!' আবার গালি দিয়ে সাবমেশিন গান তাক করছে লোকটা।

সামান্য একটু ঝাঁকি খেল দুজন, সময়ের ব্যবধান পুরো আধ সেকেন্ডও নয়।

যেন ছুরি নয়, রানার হাত থেকে সদ্য মুক্তি পাওয়া একটা পাখি উড়ে গেছে। এইমাত্র ছিল ওর হাতে, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে লোকটা দেখল সেটার শুধু হাতলটা তার বাম বুক থেকে বাইরে বেরিয়ে রয়েছে।

হাত থেকে সাবমেশিন গান ছেড়ে দিল জাপানি লোকটা। তারপর নিজেও ঢলে পড়ল ঘাসের উপর। বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল রানা ওর পাশে, লোকটাকে সার্চ করে কিছুই পেল না। এক টানে বের করে নিল নিজের ছুরিটা। নিঃশব্দ পায়ে ফিরে গেল যেখানে ছিল সেখানে, ঝোপের আড়ালে; দেখছে সঙ্গীর খোঁজে গ্রুপের কেউ ফিরে আসে কি না।

চারপাশে কোথাও শব্দ হচ্ছে না। গ্রুপের কেউ নিঃশব্দে ফিরে এলেও, গাছ আর দালানটার আড়াল থাকায়, একেবারে শেষ মুহূর্তে টের পাবে রানা।

অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না, তবে একটু পর রানার সন্দেহ হলো লাশটার পাশে ঘন কালো দু'তিনটে আলাদা ছায়া নড়াচড়া করছে, ওর কাছ থেকে বিশ-বাইশ হাত দূরে।

তারপর ওদের অস্ফুট কথা ভেসে এল কানে।

একজন রুদ্ধশ্বাসে বলল, জাপানি ভাষায়, 'মিশকাকে খুন করা হয়েছে! এই দেখো রক্ত!'

'কাপুরুষের মত চুপচাপ করেছে কাজটা, তার মানে খুনি

সম্ভবত এক কি দুজন,' অন্য একটা কণ্ঠস্বর।

'কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে খুনি,' তৃতীয় একজন বলল। 'দাঁড়াও, এখনই খুঁজে বের করছি।'

সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল রানা, ইনফ্রারেড ফিল্ড গ্লাস আছে তাদের সঙ্গে, চোখে সাঁটলে অন্ধকারেও প্রায় দিনের মত পরিষ্কার দেখতে পাবে সব।

ঝোপটা ঘন, তবে এত ঘন নয় যে ফাঁক-ফোকর দিয়ে ওকে দেখা যাবে না। ডালপালা স্পর্শ না করে বসল রানা, তারপর ক্রল করবার ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ল।

শুয়েই টের পেল রানা, জায়গাটা আশপাশের উঁচু জমির চেয়ে সামান্য ডেবে আছে, ফলে ঝোপের বাইরে থেকে সহজে এখন কেউ ওকে দেখতে পাবে না।

যতই সাবধান হোক, পায়ের ঘষা লাগায় খসখস আওয়াজ করল পিছনের একটা ঝোপ।

রাতের নীরবতাকে চিরে গর্জে উঠল একটা সাব-মেশিনগান। ঝোপের একরাশ ডালপালা ভেঙে পড়ল ওর গায়ের উপর, এমনভাবে চাপা দিচ্ছে ওকে যেন জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে।

ব্রাশ ফায়ার থামার আগেই পিস্তল ধরা হাতটা মুক্ত করে নিয়েছে রানা, শত্রুর মাজল্ ফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দিল।

'উহ্!' করে ককিয়ে উঠল কেউ, জখম হয়েছে। তবে পরমুহূর্তে একসঙ্গে গর্জে উঠল আরও দুটো আগ্নেয়াস্ত্র। ডেবে থাকা জমিনে মাথা নিচু করে পড়ে রইল রানা। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট লেগে তিন-চার ফুট সামনের বালি ও মাটি লাফিয়ে উঠছে।

দূরে সাইরেন বাজছে কোথাও। আওয়াজটা দ্রুত কাছে চলে আসছে।

জাপানি লোকগুলোর চেঁচামেচি শুনে রানার মনে হলো, গ্রুপের সবাই জড়ো হয়েছে লাশটার কাছে। তবে গুলি থামায়নি।

মিছেমিছি আর্তনাদ করে উঠল রানা, যেন মারাত্মক আহত

হয়েছে। তাতেও বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ থামল না; তবে মাজল্ ফ্ল্যাশ ও আওয়াজ, দুটোই রানার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

গলফ কোর্সের শেষ মাথায় সৈকত, তির্যক একটা পথ ধরে বোধহয় সেদিকেই ছুটছে ওরা।

ক্রল করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল রানা। এখন আর গুলি হচ্ছে না। সিধে হয়ে ছুটল ও, দেখল যেখানে পড়ে ছিল, সেখানে নেই লাশটা।

দালানটাকে পাশ কাটিয়ে বিশ-পঁচিশ গজ এগোতেই সামনে সৈকত দেখতে পেল, চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে বালি।

আরও খানিক দূরে সাগর। পানির কিনারায় পৌঁছে একজোড়া রাবার বোটে চড়ছে লোকগুলো।

গাছপালার ভিতর থেকে সৈকতে বেরিয়ে এসে বালিতে হাঁটু গাড়ল রানা, হাতটা লম্বা করে দিয়ে ট্রিগার টিপল।

গুলিটা কাউকে লাগল কি না বোঝা গেল না। হঠাৎ একটা স্পটলাইটের আলো ধাঁধিয়ে দিল রানার চোখ, পরমুহূর্তে ভারী একটা মেশিনগান থেকে ফায়ার ওপেন হলো। লাফ দিয়ে উঠল রানার পাঁচ ফুট সামনের বালি।

একছুটে গাছগুলোর পিছনে এসে আড়াল নিল রানা। হেভি মেশিনগান একটানা একঘেয়ে আওয়াজ তুলে গুলি ছুঁড়ছে, সৈকতের উপর অলসগতিতে ওকে খুঁজছে স্পটলাইটের আলো।

সাগরের দিকে তাকাল রানা। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল, ঢেউয়ের দোলায় সেই সেদিনের কুচকুচে কালো সাবমারসিবলটা বারবার উঁচু-নিচু হচ্ছে। স্পটলাইট রয়েছে ওটার কনিং টাওয়ারে, তার পিছনে মেশিনগান।

সঙ্গীর লাশ নিয়ে বাকি ছয় জাপানি রাবার বোটে চড়ে দ্রুত বৈঠা চালাচ্ছে। এরইমধ্যে সাবমারসিবলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তারা।

রানা অসহায়, গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে থাকা

ছাড়া আর কিছু করবার নেই ওর। তবু, নিষ্ফল হলেও, পিস্তলের সব গুলি শেষ করল ও লোকগুলোকে লক্ষ্য করে। রাবার বোট থেকে কালো ভেসেলে চড়ল ওরা, তারপর নীচে নেমে গেল।

রানার পিছনে, গলফ কোর্স ধরে লোকজন ছুটে আসছে। তবে এখন এসে আর কোনও লাভ নেই। ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে সাবমেরিনটা।

'ইউ! স্টপ দেয়ার! এক চুল নড়বে না!'

রানার পিছনে পাঁচজন মিলিটারি পুলিশ, তাদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ওর দিকে তাক করা। ওয়ালথার ফেলে দিল রানা, তারপর মাথার উপর হাত তুলল। এমপি-রা সাবধানে এগোল। এই সময় ওকে দেখতে পেল সার্জেন্ট।

'ওহ্, সরি, সার,' তাড়াতাড়ি বলল সে, ওয়ালথারটা তুলে ধরিয়ে দিল রানার হাতে। 'আমরা অ্যাসল্ট রাইফেল আর মেশিনগানের ফায়ার শুনতে পেয়ে ছুটে এসেছি।'

'একটু দেরি হয়ে গেছে, সার্জেন্ট,' বলল রানা। 'ফ্রগম্যানদের একটা গ্রুপ। এইমাত্র নিজেদের সাবে চড়ে পালিয়ে গেল। একটাকে ফেলেছি, তবে সেটাকেও তুলে নিয়ে গেছে ওরা।'

'বলেন কী, সার!' রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সার্জেন্ট।

'আমাকে হসপিটালে পৌঁছে দিন।'

'ইয়েস, সার!'

হাসপাতালের সামনে জিপ থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামল রানা। দালানটার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভাইস অ্যাডমিরাল ম্যাকমোহন আর মেজর টিমোথি। দুজনেই সশস্ত্র, হোলস্টারে পিস্তল গোঁজা।

'আমরা গোলাগুলির আওয়াজ শুনেছি,' শান্তস্বরে বললেন ভাইস অ্যাডমিরাল।

'নার্স রিপোর্ট করল দুজন জাপানি ডাক্তারের পিছু পিছু তানমের কেবিনে ঢোকেন আপনি,' বলল মেজর। 'দশ-পনেরো

মিনিট পরেও আপনারা কেউ বেরুচ্ছেন না দেখে সন্দেহ হয় তার, কেবিনে ঢুকে দেখে তানুম তার বিছানায় মরে পড়ে আছে। লাশের ডান হাতে, কব্জির উপর তখনও একটা সিরিঞ্জ ঢোকানো।' চট করে একবার ভাইস অ্যাডমিরালকে দেখে নিল সে, তারপর আবার বলল, 'নার্সের ধারণা, আপনারাই খুন করেছেন তানুমকে, তারপর জানালা দিয়ে পালিয়েছেন।'

'স্রেফ প্রলাপ বকছে নার্স,' ভারী গলায় বললেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'অচেনা লোকজনকে ভেতরে ঢুকতে দিয়ে যে অপরাধ করেছে, সেটা ঢাকার জন্যে।' রানার দিকে তাকালেন। 'কারা ওরা, মিস্টার রানা? ঠিক কী হলো বলুন তো?'

যতটুকু জানে, নিজের ধারণা সহ, সংক্ষেপে বলল রানা।

'নিজেদের আবিষ্কার করা অ্যান্টিডোট-এর সাহায্যে তানুমকে সুস্থ করা যায় কি না দেখতে এসেছিল?' ভাইস অ্যাডমিরালের কপালে চিন্তার রেখা। 'তার মানে, তানুম মারা যাওয়ায় প্রমাণ হলো ওদের অ্যান্টিডোট কাজ করছে না!'

'না, করছে না,' বলল রানা, তারপর টিমোথির দিকে ফিরল। 'মেজর টিমোথি, পোস্ট মর্টেমের জন্যে লাশটা কি মর্গে পাঠানো হয়েছে?'

'হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'আর সিরিঞ্জটা? ওটাও ল্যাবে পাঠাতে হবে...

'ওটাও পাঠিয়ে দিয়েছি,' বলল মেজর। 'বলেছি পরীক্ষা করে দেখতে হবে তরল পদার্থটা আসলে কী।'

'আপনাদের তল্লাশির রেজাল্ট কী?' জানতে চাইল রানা।

'শেষ পর্যন্ত দুজন চিনা সারভাইভারকে পেয়েছি আমরা,' বলল মেজর। 'নেহাতই ভাগ্যগুণে...'

দুজনেই ওরা ডাইভার। জাহাজ থেকে একশো গজ দূরে, একটা রাবার বোট থেকে ডাইভ দিতে যাচ্ছিল, পরনে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ওয়েট সুট। বিস্ফোরণের শক ওয়েভ অবশ করে ফেলে

ওদেরকে, স্রোতের টানে বেশ অনেক দূর ভেসে যায়। প্রথম দিকে সার্চ পার্টি ওদেরকে দেখতে পায়নি।

মেজর থামতে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ওদের কাছ থেকে কিছু জানা গেছে?'

মাথা নাড়লেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'না। ওরা বলছে, বিস্ফোরণের পর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ডুবে যায় জাহাজটা। প্রচুর ধোঁয়া আর আগুনের শিখা দেখা গেছে। ওদের ধারণা কোনও ধরনের টর্পেডো আঘাত করেছিল ওটাকে।'

'এবার অন্তত সিউইড নয়,' বলল মেজর টিমোথি।

'জাহাজে যারা ছিল তাদের একজনও বাঁচেনি,' বললেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'বোঝা যায়, যারা ওটাকে ডুবিয়েছে তারা চায়নি কেউ বাঁচুক। দুজন বেঁচেছে, স্রেফ কপাল জোরে।'

'তবে জানা যাচ্ছে যে, এ-সবের পেছনে প্রাকৃতিক কোনও শক্তি নয়, মানুষই দায়ী,' বলল মেজর।

'লোকগুলো জাপানি,' বলল রানা। 'অন্তত জাপানি ভাষায় কথা বলতে শুনেছি।'

'আমার ধারণা পরিবেশবাদী কোনও গ্রুপ পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে এ-সব করছে,' বললেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'আপনি কী বলেন, মিস্টার রানা?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করল রানা। তারপর বলল, 'আমাকে একবার ল্যাবে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ, চলুন, দেখা যাক টেস্ট রিপোর্ট কী বলে।' উৎসাহ দেখিয়ে বললেন ম্যাকমোহন, ছোটখাট শরীর নিয়ে ওদের সামনে থাকলেন তিনি। যেন লিড করছেন।

হাসপাতালের লম্বা করিডর পার হয়ে ল্যাবে চলে এল ওরা। সেই একই টিম-চিফ ফার্মাসিস্ট, তাঁর সহকারী টেকনিশিয়ান আর ডাক্তার-গ্লাভ বক্সের ভিতর লেগুনের পানি আর সামুদ্রিক আগাছার নমুনা নিয়ে কাজ করছেন।

'পানির নমুনা থেকে একটা পদার্থ আলাদা করা গেছে, কিন্তু সেটার পরিচয় জানা নেই আমাদের,' ভাইস অ্যাডমিরালকে রিপোর্ট করলেন ডাক্তার। 'যতদূর বুঝতে পারছি, কোনও পরিচিত কেমিকেল গ্রুপের সঙ্গে খাপ খায় না এটা।'

'তা কী করে হয়, ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তা হলে যে শুনতে পাই সম্ভাব্য সব কেমিকেলেরই গঠন-প্রকৃতি জানা হয়ে গেছে আমাদের?'

'তা হয়েছে, কিন্তু এটা আমার পরিচিত কমপাউন্ডগুলোর মধ্যে পড়ে না, তাই কমপ্লিট অ্যানালাইসিসের জন্যে এটাকে আমি ওয়াশিংটনে পাঠাচ্ছি।'

'আর প্লান্ট?' টেকনিশিয়ানকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'রূপান্তরিত একটা সিউইডকে খাওয়ার উপযোগী করার জন্যে জাপানের কোনও ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছিল, এটা সেই একই জাতের, এটুকু আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি। এই স্পিশিযের কোনও রেকর্ড ওরা রেখেছে কি না জানার জন্যে টোকিও-র সঙ্গে যোগাযোগ করছি আমরা।'

'প্যাথলজিস্টরা কিছু পাননি?'

রানার প্রশ্নের জবাব দিলেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'ওঁরা একঘণ্টা আগে রিপোর্ট দিয়ে পার্ল হারবারে ফিরে গেছেন। ভিক্টিমরা সবাই নার্ভ পয়জনিং-এ মারা গেছে। খুবই কড়া ধরনের নার্ভ পয়জন। তবে সেটা আইডেনটিফাই করতে পারেননি ওঁরা, অথচ টিমে বিশ্বমানের দুজন পয়জন এক্সপার্ট ছিলেন।'

'এ তো দেখছি ভারি মুশকিলে পড়া গেল।'

'হাওয়াই-এ ফিরে কাজ করার জন্যে টিস্যু স্যাম্পল নিয়ে গেছেন ওঁরা,' বললেন ভাইস অ্যাডমিরাল। 'শুধু তাই নয়, দেশি-বিদেশি নামকরা কয়েকজন টক্সিকোলজিস্টকেও ওই নমুনা পাঠাবেন।'

মাথা ঝাঁকাল রানা. তারপর টেকনিশিয়ানের দিকে তাকাল।

'মেজর টিমোথির পাঠানো সিরিঞ্জে যে মেডিসিন পেয়েছেন, সেটা টেস্ট করা হয়েছে?'

'জী,' জবাব দিল টেকনিশিয়ান। "ওটা সাদামাঠা একটা অ্যান্টিসিরাম, সাধারণত সাপে কামড়ালে ব্যবহার করা হয়। এই মাত্র পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পেলাম, তাতেও বলা হয়েছে তানুমের শরীরে ওই অ্যান্টিসিরাম আছে।'

'এটা তা হলে পরিষ্কার,' বলল রানা, 'তানুমকে কেউ খুন করতে চায়নি। বড়জোর বলা যেতে পারে ভুল চিকিৎসায় মারা গেছে সে।'

'ডাক্তারদেরও তাই ধারণা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ম্যাকমোহনের দিকে ফিরল রানা। 'ভাইস অ্যাডমিরাল, আপনার অফিস থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, মিস্টার রানা। আমাকে যদি আপনার দরকার হয়, কোয়ার্টারে যোগাযোগ করবেন, প্লিজ।'

ভাইস অ্যাডমিরালের পিছু নিয়ে বেরিয়ে গেল মেজর টিমোথিও। অজানা রহস্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যস্ত হয়ে উঠল ল্যাব টিম। ওদেরকে কাজ করতে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল রানা, গায়ে উজ্জ্বল জ্যোছনা মেখে হেডকোয়ার্টার বিল্ডিঙের দিকে যাচ্ছে।

ওখানে খুব ব্যস্ত সময় কাটছে অফিসারদের। স্টাফের একটা গ্রুপ চিনা ক্রুযারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। সেটা নোঙর ফেলেছে ওদের সার্ভেইলান্স শিপ যেখানে ডুবেছে তার কাছাকাছি।

মার্কিন ঘাঁটির কর্মকর্তারা সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না চিনা ক্রুযারকে কোয়াজালিয়েনের ডকে ভিড়তে দেওয়া যাবে কি না। এই মুহূর্তে বেইজিং আর ওয়াশিংটনের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপানোর চেষ্টা চলছে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসুক তারা।

ভাইস অ্যাডমিরালের অফিসে শুধু একজন গার্ডকে পেল রানা, করিডরে ডিউটি দিচ্ছে। দরজার তালা খুলে দিল সে।

কমপিউটার অন করে নুমা চিফ জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। ও কিছু বলবার আগেই অ্যাডমিরাল প্রশ্ন করলেন: 'কিছু জানা গেল, রানা?'

'বোধহয়,' টাইপ করল রানা, তারপর আজ সারাদিন যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে তার বর্ণনা দিল। 'এখন আমরা জানি সিউইড সহ সব কিছুর পেছনে ওই সাবমারসিবলটার ভূমিকা আছে। আর ওটার পেছনে রয়েছে জাপানিদের একটা গ্রুপ। ওই আগাছা প্রাকৃতিক কোনও বিপদ নয়।'

'না,' সায় দেওয়ার সুরে বললেন নুমা চিফ। 'লোকগুলো জাপানি ভাষায় কথা বলছিল?'

'জী,, আগাছাটারও জাপানি একটা কানেকশন আছে।'

'আমি যতটুকু জানি আন্ডারওয়াটার রিসার্চে অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে জাপানিরা।'

'ওয়েট সুট ওদেরকে প্রোটেকশন দিচ্ছে?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, সেটা যদি ওয়াটারটাইট হয়,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তবে মোটিভটা কী? এ থেকে কী পেতে চাইছে ওরা?'

'ব্ল্যাকমেইল? গুরুত্বপূর্ণ জলপথে আগাছা ছেড়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে সুপারপাওয়াগুলোকে কিছু করতে বাধ্য করতে চাইবে?'

'পিস মুভমেন্ট?'

'ভাইস অ্যাডমিরাল ম্যাকমোহনের তা-ই ধারণা।'

'তিনি তো চিনকেও কালপ্রিট বলছিলেন,' শুকনো গলায় বললেন জর্জ হ্যামিলটন।

রানা বুঝল, এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সবই জানা আছে নুমা চিফের। ম্যাকমোহন প্রসঙ্গে নিজে থেকে কিছু বলতে চাইছে না ও। 'ল্যারি কিংকে খোঁজ নিতে বলা হয়েছিল এই আগাছা আর

কোথাও দেখা যাচ্ছে কি না, সে কি রিপোর্ট দিয়েছে, সার?'

'হ্যাঁ, নিয়েছে খোঁজ,' বললেন নুমা চিফ। 'ভাল-মন্দ দুরকম রিপোর্টই দিয়েছে সে। না, পৃথিবীর আর কোথাও আগাছাটা ছড়াচ্ছে না। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সুন্দরবন থেকে গায়েব হয়ে যাবার পর কীভাবে যেন আবার নতুন করে গজাতে শুরু করেছে ওগুলো।'

'ওহ্ গড!' চিন্তায় পড়ে গেল রানা। 'তা হলে তো, সার, আমাকে একবার দেশে ফিরতে হয়...'

'ওগুলো আবার ফিরে আসছে ঠিকই, তবে সংখ্যায় খুব কম,' বললেন নুমা চিফ। 'তা ছাড়া, রহস্যময় সাবমারসিবল বা এয়ার ট্যাংক ছাড়া ডাইভার দেখা যাচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরে, বঙ্গোপসাগরে নয়। আমি মনে করি ওখানেই তোমার থাকা দরকার।'

'জী।' যুক্তিটা বুঝতে পারছে রানা। 'ঠিক আছে।'

'তোমাকে একটা খবর দিই, রানা। পার্ল হারবার থেকে আগাছা আর লেগুনের পানির নমুনা এসে পৌঁছেছে নুমা হেডকোয়ার্টারে,' জানালেন অ্যাডমিরাল। 'আমাদের বিজ্ঞানীরা পয়জনটার অ্যান্টিডোট আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন। দেখা যাক কতদূর কী করতে পারেন ওঁরা।'

'বিষ থাকলে বিষক্ষয়ের উপায়ও থাকবে,' বলল রানা।

'ওখানে এখন তুমি কী করবে, রানা?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'ঠিক বুঝতে পারছি না, সার,' বলল রানা। 'ইরিয়ান জায়ার সেই দ্বীপটার কী যেন নাম...কুরুডু, সেটা সম্পর্কে কিছু জানা গেল?'

'না,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তুমি বরং ওখান থেকে একবার ঘুরে এসো।'

'ওখানকার সিউইড সম্পর্কে নতুন কোনও রিপোর্ট পাওয়া

গেছে? জিজ্ঞেস করল রানা, ভাবছে অতদূরে যাব কীভাবে? কোয়াজ থেকে ইন্দোনেশিয়ার ওই দ্বীপ প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার দূরে!

'না, নতুন কিছু জানা যায়নি। শোনো, কাল সকালে ব্রিটিশ নেভির একটা ভি-টি-ও-এল নিয়ে বেরিয়ে পড়ো তুমি।'

'ভার্টিকাল টেক-অফ অ্যান্ড ল্যান্ডিং এয়ারক্রাফট?' অবাক হয়ে রানা জানতে চাইল। 'কোথায় পাব, সার?'

'একটা ব্রিটিশ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার শুভেচ্ছা সফরে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছে, ওটায় ওদের হ্যারিয়ার জেট প্লেন আছে। আমি ব্যবস্থা করছি, ভোরবেলাই কোয়াজে পৌঁছে যাবে একটা।'

'ধন্যবাদ, সার। তবে ওটার সঙ্গে আরও একটা জিনিস পেলে খুশি হতাম,' ম্লান সুরে বলল রানা।

'কী, রানা?'

'অ্যান্টিডোট,' বলল রানা। 'কিংবা এমন কিছু, যা দিয়ে ওই আগাছাকে থামানো যায়।'

বারো

হ্যারিয়ার জেটের ব্রিটিশ পাইলট গভীর বনভূমির দিকে হাত তুলে তীররেখাটা দেখাল রানাকে। বারো কিলোমিটার লম্বা কুরুড়ু দ্বীপের প্রায় সবটুকুই জঙ্গল। সরু একটা নদী বা খাল চোখে পড়ল, ঘন গাছপালার ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে রানার, সভ্যতার এত কাছাকাছি থেকেও

এ-ধরনের কিছু দ্বীপের মানুষ আজও আদিম যুগে বাস করে।

'ওখানে, মিস্টার রানা,' ইন্টারকম থেকে ভেসে এল তরুণ জেট পাইলটের গলা। 'গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের নির্দেশে আপনাকে আমি ওখানে নামিয়ে দেব-ফাদার উইলিয়াম লিন্ডসের কাঁধে।'

দ্রুত নীচে নামছে হ্যারিয়ার। তিনদিক ঘেরা ছোট একটা খাঁড়ি চোখে পড়ল রানার। খানিক পরপর এরকম ছোট খাঁড়ি আরও বেশ কটা আছে। ম্যাপে অন্তত তাই দেখেছে ও।

হ্যারিয়ার থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা ছোট খাঁড়িটার পানি কালচে হয়ে আছে। পানির উপর মাথা তুলে রয়েছে সরু লিকলিকে সামুদ্রিক আগাছার সবুজ মাথা, যেন অসংখ্য সাপ দৌড়-প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ওগুলোর চারপাশে ভেসে রয়েছে মরা মাছ আর পশুপাখি।

'আরেকবার সাগরের দিক থেকে ঘুরিয়ে আনুন, লেফটেন্যান্ট,' পাইলটকে নির্দেশ দিল রানা।

'ইয়েস, সার,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো শ্বেতাঙ্গ পাইলট।

ঘুরে গিয়ে আবার সাগরের উপর ফিরে এল হ্যারিয়ার জেট। রানা দেখল ছোট খাঁড়িটা থেকে গাঢ় একটা কালচে ছায়া বেরিয়েছে সাগরের দুদিকে। সিউইডের উপস্থিতি প্রকাশ করছে ছায়াটা, বুঝতে কোনও অসুবিধে হলো না ওর। এরইমধ্যে দ্বীপের দু'দিকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে বিষাক্ত সর্পলতা।

পুরু আগাছার উপর শুধু মরা মাছ নয়, বড় আকৃতির পশুর লাশও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

'চলুন, লাইটহাউসের ওদিকটায় যাই,' বলল রানা। 'গ্রামের মাঝখানে ওটা।'

'চলুন।'

সাগরকে পিছনে ফেলে জঙ্গলের মাথার উপর চলে এল

হ্যারিয়ার। আগাছা ভর্তি খাঁড়ি থেকে পাঁচশো গজ দূরে বিশ-পঁচিশটা কুঁড়েঘর নিয়ে আদিবাসীদের গ্রাম, গ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ ছোঁয়া লাইটহাউস।

গ্রামের একপাশে সবচেয়ে বড় বাড়িটার ছাদ বাঁশ আর নারকেল গাছের পাতা দিয়ে তৈরি, দেয়ালগুলো পাকা। নিঃশব্দে হেসে ইঙ্গিতে নীচেটা দেখাল পাইলট, তারপর ধীরে ধীরে খাড়াভাবে নামতে শুরু করল আধ পাকা বাড়িটার সামনের ফাঁকা জায়গায়।

এক সময় সরাসরি জায়গাটার উপর স্থির হলো জেট, তারপর অলসভঙ্গিতে ল্যান্ড করল। 'পিস অভ কেক,' সহাস্যে বলল পাইলট।

'নাইস জব,' প্লেন থেকে নামবার সময় আন্তরিক সুরে বলল রানা।

ককপিটে বসে হাসছে পাইলট, নীচে নামছে না। 'ফ্রেন্ডলি নেভির অনুরোধ রক্ষা করতে সব সময় একপায়ে খাড়া আমরা। তবে থাকতে পারছি না বলে দুঃখিত।' নীরব, নির্জন গ্রামটার উপর চোখ বুলাল সে। 'খুব লোভনীয় লাগছে জায়গাটা। কিন্তু কর্তব্যের ডাক অগ্রাহ্য করতে পারছি না।'

অলসভঙ্গিতে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরল রানা। 'কোথাও কিছু নড়ছে না। আপনাকে সত্যিই যেতে হবে?'

'হুকুম, বোঝেনই তো। পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসো, এরকম নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সি ইউ, লাকি ওয়ান!'

হাত নাড়ল পাইলট, বোতাম টিপল, সঙ্গে সঙ্গে ভার্টিকাল টেক-অফ শুরু করল হ্যারিয়ার–মাটি থেকে আকাশের দিকে খাড়া উঠে গেল, তারপর তির্যক একটা পথ ধরে ছুটল। দেখতে দেখতে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল জেট।

নিজের সি ব্যাগটা তুলে নিয়ে আরেকবার চারদিকে চোখ বুলাল রানা। ঘাস দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘরগুলো ছিমছাম, দেখতে

বেশ সুন্দর। প্রতিটি কুঁড়ে উঁচু ভিটির উঁপর দাঁড়িয়ে আছে, জঙ্গল থেকে খানিক দূরে।

কুঁড়ের সামনেই রান্নার জায়গা। চুলোয় পাতিল চাপানো। এদিক সেদিক কয়েকটা সতর্ক কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মানুষজনের কোনও সাড়া-শব্দ নেই।

হাতে ব্যাগ নিয়ে গ্রামের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে রানা, উঁকি দিয়ে দেখছে কুঁড়েগুলোর ভিতর কেউ আছে কি না।

প্রতিটি কুঁড়ের ভিতর যা যা থাকার কথা সব আছে–হাতে বোনা মাদুর, বর্শা, দা, তীর-ধনুক, মাটির হাঁড়ি-পাতিল, মুখোশ, পালক দিয়ে সাজানো মুকুট ইত্যাদি।

চুলোয় বসানো পাতিলে ভাত বা তরকারি রয়েছে, তবে পচে গেছে সব, চুলোতেও আগুন জ্বলছে না। খাবারসহ বাসন পড়ে আছে মাটিতে, যেন খাবার ফেলে হঠাৎ ছুটে পালাতে হয়েছে।

লাইটহাউসটাও চেক করল রানা। সেখানেও নেই কেউ।

গ্রামের চারদিক এক পাক ঘুরে এসে বড় বাড়িটার সামনে দাঁড়াল ও। আদিবাসীদের গ্রামে শ্বেতাঙ্গ ফাদাররা সাধারণত এরকম বাড়িতেই থাকেন। একতলা, আধপাকা দালান, তিন দিকে ছাদসহ বারান্দা। জানালায় কাঁচের বদলে মশা-মাছি ঠেকাবার জন্য তারের জাল দেখতে পাচ্ছে রানা, পরদার বদলে বাঁশের তৈরি ব্লাইন্ড।

কাঠের বারান্দা ওর পায়ের চাপে মচমচ করছে। দরজায় তালা দেওয়া নেই। ব্যাগটা বারান্দার মেঝেতে নামিয়ে রেখে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল ও, ঠেলা দিয়ে পুরোপুরি খুলল কবাটটা। ভিতরে কিছু নড়ছে না।

ছায়ার মত ভিতরে ঢুকল রানা, দেয়ালে পিঠ সেঁটে দাঁড়াল, কামরার ভিতরটা খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। বেশ বড় ঘর। বাঁশ আর বেত দিয়ে তৈরি করা ফার্নিচারে ধুলো জমেছে। নিচু একটা পার্টিশনের ওদিকটায় কিচেন। পরিষ্কার হলেও, জিনিস-পত্র সব

স্তূপ করে রাখা। বোধহয় এখানে কোনও লোক একা থাকে। তবে দিনকয়েক কারও হাতের ছোঁয়া লাগেনি।

বেডরুমে যাওয়ার দরজাটা খোলা। দরজা-জানালায় তারের জাল থাকলেও, বিছানার উপর হলুদ রঙের মশারি টাঙানো রয়েছে।

কিচেনের দিকটায় চলে এল রানা। ব্রেকফাস্ট-এর জন্য সাজানো ডাইনিং টেবিলে ভাজা ডিম, হাতে বেলা আটার রুটি, গ্লাসভর্তি দুধ—দুধে সর জমেছে। সব ঠাণ্ডা। চেয়ারের সামনে ভাঁজ করা ন্যাপকিন।

পিস্তলটা হোলস্টারে গুঁজে রেখে সামনের বড় কামরায় ফিরে এল ও। গ্রামের বাকি ঘরগুলোরও একই অবস্থা। সকালের নাস্তা তৈরি করছিল, কিংবা খেতে বসেছিল, এই সময় সব ফেলে গায়েব হয়ে গেছে লোকজন। কোথায়? কেন? বড় কামরাটা আরেকবার সার্চ করেও কোনও ক্লু পেল না ও।

ব্যাগটা ওখানে রেখে বাইরে বেরিয়ে এল। বারান্দার ছায়ায় দাঁড়িয়ে নীরব গ্রামটার উপর চোখ বুলাচ্ছে। সন্দেহ হলো বাম দিকে কিছু একটা নড়ল। গ্রামকে ঘিরে থাকা জঙ্গলের পাঁচিল একটু বোধহয় ঝাঁকি খেয়েছে।

ওই আবার!

রানা কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না, ভাব করল যেন কিছু দেখেনি। তবে যতটুকু দেখবার দেখা হয়ে গেছে ওর।

জঙ্গলের কিনারা থেকে কেউ একজন ওর উপর নজর রাখছে। তার নড়াচড়াটা এত ক্ষীণ, ট্রেনিং পাওয়া চোখ ছাড়া দৃষ্টিতে ধরা পড়বে না। একটা চোখের চকচকে ভাব ধরতে পেরেছে রানা। পলকের জন্য দেখতে পেয়েছে খানিকটা কালো চামড়া—হয়তো কেউ হাত দিয়ে পাতা সরাচ্ছিল।

ধাপ বেয়ে বারান্দা থেকে নেমে উল্টোদিকে এগোল রানা। একটা করে কুঁড়ে সার্চ করছে, সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে

যেদিকটা নড়তে দেখেছে জঙ্গল। এক সময় এমন একটা কুঁড়েতে ঢুকল, যেটার পিছনদিকটা জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

কুঁড়ের ভিতর গাঢ় ছায়ায় ঢুকেই ডান হাতটা ঝাঁকাল রানা, চোখের পলকে তালুতে চলে এল ওর ছুরির হাতল। দ্রুত, যতটা পারা যায় কম শব্দ করে, কুঁড়ের পিছনের দেয়াল কেটে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর চুপিসারে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে ভিতর।

ঘন জঙ্গলের উপর দিকটা এত নিবিড় যে নীচে রোদ নামার সুযোগ খুব কম। সাবধানে, কোনও শব্দ না করে, বড় একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে এগোচ্ছে রানা। লুকিয়ে থাকা লোকটার পিছনে পৌঁছাতে চাইছে ও।

ঘন বনভূমির সবুজ আলোয় ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে গেল চোখ। ওর অনুভূতি বলছে যেখানে নড়াচড়া দেখেছে তার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। প্রকাণ্ড একটা গাছের মোটা ডালের নীচে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকাল রানা। জোঁক আর ছত্রাক ওটার গা ঢেকে রেখেছে। চোখ-কান খোলা রেখে অপেক্ষা করছে ও।

এদিকটায় অল্প হলেও নিস্তেজ খানিকটা রোদ আছে। সব জঙ্গলেই শব্দ হয়, কিছু না কিছু নড়েও সারাক্ষণ। কতরকমের পোকা, পাখি, ইঁদুর, গিরগিটি আর মাছি নিজেদের কাজে ব্যস্ত। বাতাসও থেমে নেই, শাখা-প্রশাখায় দোল দিচ্ছে।

সময় অলস হয়ে উঠল।

রানার দৃষ্টিসীমার ভিতরই যেন ছায়া থেকে আকৃতি তৈরি হচ্ছে। আরেকটা। তারপর আরও একটা।

তিনজন শক্ত-সমর্থ, অর্ধ-নগ্ন লোককে দেখতে পাচ্ছে রানা; এত ধীরগতিতে নড়ছে যেন জঙ্গলের ভারী বাতাসে ভেসে আছে তারা, আলোছায়ার অংশবিশেষ, নেহাতই দৃষ্টিভ্রম।

তবে না, জলজ্যান্ত বাস্তব তারা; কোনও শব্দ না করলে কী হবে, গ্রামের দিক থেকে জঙ্গলের আরও গভীরে ফেরার জন্য রানাকে পাশ কাটানোর সময় একটা ট্রেইল রেখে যাচ্ছে পিছনে।

পাশ কাটানোর সঙ্গে সঙ্গে চোখের আড়ালে হারিয়ে গেল ওরা। এই পথ দিয়ে যে কেউ গেছে, তা নুয়ে পড়া ঘাস আর কাঁপতে থাকা পাতা দেখে বুঝে নিতে হবে।

পিছু নিতে রানার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। তাদের চেয়ে কম শব্দ করছে ও, ছায়ার ভিতর স্রেফ আরেকটা ছায়া।

দূরত্বটা একবারও এত বেশি কমল না যে লোকগুলোকে দেখতে পাবে রানা, কিংবা তাদের আওয়াজ পাবে; তবে প্রায় অদৃশ্য ট্রেইল ধরে অনায়াসেই এগোতে পারছে।

সৈকত আর গ্রাম পিছনে ফেলে পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে রানা। অবশ্য পাহাড়গুলো দূরে থাকতেই ট্রেইল শেষ হয়ে গেল। এখানে আরও ছোট একটা গ্রাম দেখতে পাচ্ছে ও।

অল্প কিছু নারী-পুরুষ তাদের পরিচিত তিন ছায়ামূর্তিকে দেখে দুর্বোধ্য ভাষায় হইচই করে উঠল। লোক তিনজন উত্তেজিতভাবে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল তাদের, ইঙ্গিতে পিছনে ফেলে আসা বড় গ্রামটাকে দেখাচ্ছে।

রানা বুঝল, গায়েব হয়ে যাওয়া গ্রামবাসীকে খুঁজে পাওয়া গেছে। অন্তত কিছু লোককে।

জঙ্গলের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ও, হাতের পিস্তল সরাসরি লোক তিনজনের দিকে ধরা। প্রথমে কয়েকটা মেয়ে দেখতে পেল রানাকে। আতংকে চেঁচিয়ে উঠল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো যে যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে।

ওই তিনজন দৌড়ায়নি। ওরা আন্দাজ করতে পারছে কে হতে পারে রানা, অন্তত বুঝতে পারছে কী চায় ও।

'কী হয়েছিল?'

ভাল করে লোকগুলোকে দেখছে রানা। তাদের মধ্যে যার বয়স সবচেয়ে বেশি সে-ই এগিয়ে এল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলছে।

'ওরা এল। দৌড় দিলাম। প্লেন শুনলাম। দেখতে গেলাম।

আপনাকে দেখলাম। জানলাম না আপনি কে, তাই ফিরে এলাম।'

'আমি আসার আগে কী হয়েছিল?' জানতে চাইল রানা। 'খাঁড়ির পানিতে তোমরা আগাছা দেখার পর?'

দুজনকে দেখে রানার মনে হলো, পিস্তলটাকে গ্রাহ্য না করে যখন-তখন দৌড় দিতে পারে। বয়স্ক লোকটা কাঁপছে, তবে তার মধ্যে পালাবার কোনও লক্ষণ নেই।

'বসতে আজ্ঞা হোক। বলছি সব। ঠিক আছে, বস্?'

ইঙ্গিতে গাছের ছায়া দেখাল প্রৌঢ় লোকটা। ঘাস ঢাকা সমতল জায়গাটায় এসে বসল সবাই। রানাকে ডাবের পানি আর শাঁস খেতে দেওয়া হলো।

পানিটুকু খেয়ে আবার জিজ্ঞেস করল রানা। 'খাঁড়িতে ওই বিষলতা দেখার পর কী হলো?'

প্রৌঢ় আদিবাসীর চেহারা থমথমে হয়ে উঠল। বাকি দুজন মচমচ শব্দ করে নারকেল চিবাচ্ছে, মাঝে মধ্যে চোখ তুলে দেখে রাখছে পালাবার পথটা।

'মাছ মরল, পশু মরল। আগাছা ভয়ানক বিপদ, বস্,' বলল প্রৌঢ়। 'ফাদার বললেন, পানি থেকে দূরে থাকো। সবাইকে নিয়ে চলে এলেন বড় গ্রামে। লাইটহাউস রেডিও খুললেন। আবহাওয়া অফিসকে ডাকলেন। বললেন খাঁড়িতে আগাছা নড়ে। সব মাছ মরে।'

'তারপর?'

'খেতে বসেছি। ওরা এল।'

'ওরা কারা?'

বাকি দুজনের একজন ভয় কাটিয়ে উঠে এই প্রথম মুখ খুলল। 'এল অনেক লোক।'

'অনেক মানে কজন?' জানতে চাইল রানা।

'অনেক মানে অনেক,' বলল প্রৌঢ়, চোখে এখনও ভয়ের ছাপ লেগে রয়েছে। 'ওরা এল। সবাই দৌড়ালাম। আমি লুকালাম।

আমি দেখলাম।'

'কী দেখলে?'

'অনেক লোক। খাঁড়ির দিক থেকে এল। সবাইকে কালো দেখলাম। তবে কেউ কালো লোক নয়। গায়ে ওয়াটার ড্রেস। হাতে গান। লোকজনকে ক্যাক্ ক্যাক্ করে ধরল। ফাদারকে ধরল। নিয়ে গেল। আমরা দেখলাম। আমরা পালালাম। আর কেউ ধরা পড়লাম না।'

'কালো ওয়েট সুট পরা লোকগুলো ওদেরকে নিয়ে চলে গেল?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কীভাবে গেল। তোমরা যেতে দেখোনি?'

'আমরা পিছু নিলাম। খাঁড়িতে নামতে দেখলাম ওদেরকে! বিরাট এক কালো দানব পানির নীচ থেকে ভেসে উঠল। সেটার চোখ থেকে আলো বেরোয়। সেই দানবের পেটে ঢুকে পড়ল লোকগুলো। দানব মাছটা সাঁতরাতে লাগল। তারপর ডুব দিল।'

সম্ভবত সে-ই সাবমারসিবলটা, ভাবল রানা।

ওর মনে হচ্ছে, কোনও একটা এক্সপেরিমেন্টে ভুল করেছে কেউ, খাঁড়িটার অবস্থা স্রেফ সেই ভুলেরই পরিণতি। কী ভুল?

হয়তো ধারণার চেয়ে সাফল্যের হার অস্বাভাবিক বেশি হওয়ায় সেটাই এরকম বিপত্তি ডেকে এনেছে। কিংবা তারা হয়তো জানত না কুরুডু দ্বীপে এখনও একজন শ্বেতাঙ্গ ফাদার রয়ে গেছেন, তিনি আবার লাইটহাউসের রেডিও ব্যবহার করে বাইরের দুনিয়াকে জানিয়ে দেবেন তাদের এক্সপেরিমেন্টাল আগাছার কথাটা।

'তোমরা বড় গ্রামটায় ফিরে যেতে পারো,' আদিবাসী তিনজনকে বলল রানা। 'শয়তানগুলো আর ফিরে আসবে বলে মনে হয় না।'

আশ্বস্ত হয়ে মাথা ঝাঁকাল তারা।

প্রৌঢ় জানতে চাইল, 'ফাদার কোথায়? আমাদের লোকজন?

ওরা আর ফিরে আসবে না, বস্?'

'জানি না,' বলল রানা। 'তবে আমরা ওদের খোঁজ করব। যদি বেঁচে থাকে, ফিরে আসবে।'

'ইউ গুড ম্যান,' বলল লোকটা। তারপর ওকে দোয়া করল, 'ইউ লিভ লং, বস্। লিভ লং। গড সেভ ইউ। ইউ গুড লাক।'

ওদেরকে ওখানে রেখে ফাঁকা বড় গ্রামটায় ফিরে আসছে রানা। আশপাশ থেকে ভেসে আসা আওয়াজ শুনে বুঝল ওকে দেখে পালিয়ে যাওয়া আদিবাসীরা একজন-দুজন করে ফিরে যাচ্ছে ছোট গ্রামটায়।

বড় গ্রামে পৌঁছেও থামল না রানা, হাঁটতে হাঁটতে খাঁড়িটার কাছে চলে এল। কিনারার শক্ত হয়ে যাওয়া কাদায় সুইম ফিন-এর অস্পষ্ট ছাপ দেখতে পেল ও, বুঝতে পারল ওয়েট সুট পরা হামলাকারীরা এখান দিয়েই ফিরে গেছে পানিতে।

পিছু হটে আবার গ্রামটায় ফিরছে রানা, সূত্রের খোঁজে মাটির প্রতিটি ইঞ্চিতে তল্লাশি চালাচ্ছে। এমন সূত্র দরকার ওর যা থেকে জানা যাবে কী তাদের পরিচয়, কোত্থেকে এসেছিল।

কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

এরপর বড় বাড়ির বড় কামরাটা সার্চ করল। বৃথা।

বেডরুমে ঢুকল। চারদিকে কোথাও কিছু নেই। মশারি টাঙানো বিছানাতেও কিছু নেই।

স্টোররুমে ঢুকল রানা, নানান জিনিসের উপর চোখ বুলাচ্ছে। পিছনে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ হলো। বোধহয় বড় কামরাটায় কেউ ঢুকেছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দরজা দিয়ে উঁকি দিল ও।

কামরার ভিতর কালো ওয়েট সুট পরা একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতটা ঝাঁকাতেই রানার বগলের কাছে আটকানো স্ট্র্যাপ থেকে তালুতে চলে এল ছুরি। ওর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে ছোটখাট মূর্তিটা।

তাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা। পিঠের কাছে পৌঁছে এক হাতে তার গলা পেঁচিয়ে ধরছে। পরক্ষণে, যেন প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক খেয়ে, ছিটকে গেল দেয়ালের দিকে।

তেরো

দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল রানা, নীরব প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে ছুরি চালাল।

ক্ষিপ্রগতিতে পা ছুঁড়ল আগন্তুক। রানার ছুরি ধরা হাতের কবজিতে লাগল জুতোর ডগা। ছুটে গেল ছুরি, তালু আর কবজি অবশ হয়ে গেছে।

কাজেই পা ব্যবহার করল রানা, পাঁজর লক্ষ্য করে একটা ফ্লাইং কিক ছুঁড়ল, লাগাতে পারলে অন্তত দুটো হাড় তো ভাঙবেই।

লাগল কিকটা, তবে সেটার ধাক্কাকে কাজে লাগিয়ে মুখোশ আর ওয়েট সুট পরা প্রতিপক্ষ শরীরটাকে এক পাক ঘুরিয়ে ডিগবাজি খেল শূন্যে। হাঁপাচ্ছে সে, কিন্তু এখনও অক্ষত।

দু'পা এগিয়ে তার চিবুক লক্ষ্য করে লাথি চালাল রানা, কিন্তু লাগাতে পারল না। ঠিক সময়মত স্যাৎ করে সরে গিয়ে রানার ঘাড়ে হাতের কিনারা দিয়ে একটা কোপ মারল শত্রু।

কোপ লাগায় পাক খেয়ে বসে পড়ছে রানা, যেন ঢলে পড়ে যাবে। কিন্তু শত্রুকে চমকে দিয়ে ওর দুই হাতের ভিতরে হঠাৎ সিধে হলো ও, কঠিন আলিঙ্গনে ভেঙে ফেলতে চাইছে সরু,

একহারা কাঠামোটাকে। তারপর দেখল মাস্কের ভিতর তার চোখ দুটো হাসছে। ওয়েট সুটের ভিতর লুকানো নরম স্তনের অস্তিত্বও অনুভব করল।

'জানার ইচ্ছে ছিল, কতটা ফর্মে আছো।' মুখোশ খুলে ফেলল উর্বশী, হাসছে। 'তবে কৌতূহলটা মৃত্যু ডেকে আনছিল। বোধহয় মা-বাবার কোনও পুণ্যের কারণে বেঁচে গেছি।'

'আমি টের পেলাম, তোমার ট্রেনিংও কারও চেয়ে কম নয়,' বলল রানা, এখনও উর্বশীকে নিজের বুকে ধরে রেখেছে। 'ভাগ্যকে ধন্যবাদ যে জখম করিনি বা হইনি।'

উর্বশীকে চুমো খেল রানা। উর্বশীও রানাকে।

'ফিরে এলে যে?' জানতে চাইল রানা।

'হুকুম,' জবাব দিল উর্বশী। 'জানোই তো অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে আমার বসের খাতির আছে। দুজন পরামর্শ করে আবার এখানে পাঠালেন আমাকে।'

'কীভাবে এলে?'

'আমাদের একটা কপ্টার পৌঁছে দিয়ে গেল।'

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'মানে? আমরা কেউ কোনও আওয়াজ শুনিনি!'

'ব্রিটেনের হ্যারিয়ার যেমন রানওয়ে ছাড়াই ওঠা-নামা করতে পারে,' বলল উর্বশী, 'তেমনি লালচিনের তৈরি লেটেস্ট ফোর-সিটার কপ্টারগুলোও প্রায় কোনও শব্দ না করে উড়তে পারে। আমরা এক ঝাঁক কিনেছি, তারই একটা আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল।'

'কী কাজে, উর্বশী?' জিজ্ঞেস করল রানা, আড়চোখে পরিচ্ছন্ন বিছানাটার দিকে তাকাল একবার। 'কারও মনোরঞ্জনের জন্যে নয় তো?'

রানার পিঠে হালকা ঘুসি মারল উর্বশী। 'খুঁজে বের করতে হবে আগাছা আর সাবমারসিবলের পেছনে কে বা কারা আছে।

আর মনোরঞ্জন প্রসঙ্গ যখন তুললেই,' হঠাৎ নাটকীয় একটা ভঙ্গি নিল সে, 'এখন যৌবন যার–কার না চাহিদা আছে ওটার?' হাসল মধুর করে, 'তোমার নেই?'

'আবার জিগায়,' বলে একটা হাত ধরল উর্বশীর, ঠোঁটের কাছে তুলে চুমো দিল, তারপর কুর্নিশের ভঙ্গিতে সামান্য ঝুঁকে অপর হাতে দেখাল ওকে তৈরি বিছানাটা।

বাথরুম থেকে একেবারে স্নান সেরে বেরোল রানা। দেখল, হাসিমুখে ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ইন্দোনেশীয় নৌ-বাহিনীর তুখোড় এসপিওনাজ এজেন্ট, অপ্সরা অপরূপা।

'তুমি জানো, ওঁরা আমাদেরকে এখানে কেন আসতে বললেন?' জিজ্ঞেস করল উর্বশী।

'কারণ এখানেই প্রথম ওই বিচিত্র আগাছা দেখা গেছে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ। ভগবানই জানেন কী জিনিস ওটা,' শুকনো গলায় বলল উর্বশী। 'জ্যান্ত প্রাণীর চেয়ে কম কীসে!'

'হেড অফিসে ফিরে কমপিউটার খুলে খোঁজ করোনি এ-ধরনের সামুদ্রিক লতার কোনও ইতিহাস কারও জানা আছে কি না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল উর্বশী। 'কমপিউটার বলছে, এ বিষয়ে জাপান থেকে আমাদের একজন ইনফরমার এক বছর আগে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছিল। জাপানের প্রত্যন্ত কোনও এলাকায় দ্রুত বাড়ে এমন এক জাতের সামুদ্রিক আগাছা দেখা গিয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে তখন কোনও হইচই হয়নি।'

'কাভারআপ?'

'হতে পারে,' বলল উর্বশী। 'কাল আমাদের ওই লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করি আমরা। কোনও রকম লুকোচুরির আভাস পায়নি সে. কিন্তু প্রাথমিক ওই রিপোর্টটা ছাড়া আর কিছুর কোনও

রেকর্ড নেই।'

'ব্যাপারটা স্রেফ ভুলে যাওয়া হয়েছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

সিলিঙের দিকে তাকাল রানা, কপালে চিন্তার রেখা। 'গোটা ব্যাপারটার মধ্যে কড়া জাপানি গন্ধ আছে।'

'কিন্তু কোনও পরিষ্কার সূত্র নেই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা উর্বশীকে বুড়ো আঙুলের ইশারায় বাথরুম দেখাল। 'স্নানটা সেরে নাও। আবার কবে সুযোগ হয় কে জানে!'

'ঠিক বলেছ,' চাদর সরিয়ে উঠে পড়ল উর্বশী। রানাকে ওর উপর আপাদমস্তক চোখ বুলাতে দেখে রমণীর ক্লাসিকাল ভঙ্গিতে দু'হাতে ঢাকল লজ্জা, তারপর কপট ভ্রূকুটি হেনে ছুটে চলে গেল বাথরুমে। দশ মিনিটেই গা ভিজিয়ে, পোশাক পরে, গুন গুন বোম্বে ফিলমের একটা জনপ্রিয় সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বেরিয়ে এল ও। শিশির ভেজা ফুলের মত তরতাজা লাগছে দেখতে।

'একটা সূত্র দরকার,' বলল রানা, খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে। 'চলো, কাজ শুরু করা যাক।'

'চলো।'

ফাদার উইলিয়াম লিন্ডসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওরা, দুজনের পরনেই ক্যামোফ্লাজ কভারঅল। দিগন্তের কাছে নেমে যাওয়া সূর্যের তেজ এখন অনেক কম, প্রকৃতি ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

রানা খেয়াল করল জঙ্গলের পাঁচিল ভেঙে কালো কয়েকটা মুখ উঁকি দিচ্ছে, তবে নিজেদের গ্রামে ফিরে আসতে এখনও সাহস পাচ্ছে না তারা। শুধু কদিন আগের তিক্ত স্মৃতি নয়, ওদের দুজনের উপস্থিতিও আড়ষ্ট করে তুলেছে লোকগুলোকে।

এক এক করে আবার ওরা কুঁড়েগুলো সার্চ করল। কিছু পাওয়া গেল না। ফাদার লিন্ডসের বাড়িতে ফিরে দুজন দুদিক

থেকে বড় কামরাটায় তল্লাশি চালাচ্ছে। কাজের ফাঁকে জানালা দিয়ে রানা দেখল গোধূলির আলো ফুরোবার আগেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একজন-দুজন করে গ্রামে ঢুকছে আদিবাসীরা।

অত্যন্ত সাবধানে এগোচ্ছে তারা। এতটাই ইতস্তত ভঙ্গিতে পা ফেলছে, যেন সন্দেহ করছে সামনে কোথাও চোরাবালি থাকতে পারে।

কিচেনে চলে গেল উর্বশী। রানা গেল স্টোর রুমে। বিশ মিনিট পর বড় কামরায় ফিরে এল দুজন। কেউ কিচ্ছু পায়নি।

'এরপর কী, রানা?'

'বাকি খাঁড়িগুলো দেখা দরকার,' বলল রানা।

'সেখানে নতুন কী পাবে বলে আশা করো তুমি?' জানতে চাইল উর্বশী।

'হয়তো জানা যাবে ওদিকেও গেছে জাপানি ডাইভাররা, হয়তো কোনও ক্লু ফেলে গেছে।'

'ফেলে যদি গিয়েও থাকে, ভেবেছ সে-সব এখনও পড়ে আছে সেখানে?' মাথা নাড়ল উর্বশী। 'বাইরের লোকজন যা-ই ফেলে যাক, দেখামাত্র তুলে নিয়ে লুকিয়ে ফেলবে আদিবাসীরা।'

'তোমার বোবা কপ্টার সেখানে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবে না?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' হাসল উর্বশী। 'কাল সকালে গেলে চলবে তো?'

'তার আগে বুঝি সম্ভব নয়?'

কাঁধ ঝাঁকাল উর্বশী, ঠোঁটে দুষ্টামি ভরা হাসি। 'আমি চাই না তার আগে সম্ভব হোক।'

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ইতিমধ্যে গ্রামের প্রায় সব লোক ফিরে এসেছে। যে যার কুঁড়ে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। কেউ কেউ চুলো জ্বেলে রান্নাও চড়িয়েছে। তবে অনেকেই সতর্ক কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখছে উর্বশীকে। ওকে তারা আসতে

দেখেনি, ওর সম্পর্কে রানাও তাদেরকে কিছু বলেনি, অস্বস্তি বোধ করবার সেটাই কারণ।

গ্রামের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা, এক সময় খেয়াল করল রানা, সেই তিন অর্ধ-নগ্ন আদিবাসী ওদের পিছু নিয়েছে।

একটা গাছের তলায় থামল উর্বশী আর রানা। নিজের ব্যাগ থেকে রেডিওটা বের করে নিজের হেড অফিসের সঙ্গে কথা বলল উর্বশী। আলাপ শেষ হতে আবার ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটু পর প্রৌঢ় লোকটা ওদেরকে ডেকে এক জায়গায় বসাল। 'আপনি খুব চালাক, বস্,' রানাকে বলল সে। 'সঙ্গে করে মেয়েমানুষ নিয়ে এসেছেন।'

'ওঁর নাম উর্বশী দাশা,' বলল রানা। 'তোমাদের নৌবাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার। তোমাদের ওপর যারা হামলা করেছে, আমার মত উনিও তাদেরকে খুঁজছেন।'

উর্বশী একজন সামরিক কর্মকর্তা, এ-কথা শুনে ঘাবড়ে গেল লোকটা। সে যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না–স্যালিউট দেবে, নাকি ছুটে পালাবে!

ঠোঁটে জিভের ডগা বুলিয়ে নার্ভাস একটু হাসল লোকটা, মোড়ায় বসে থাকা উর্বশীকে আড়চোখে দেখছে। রানা লক্ষ্য করল তার বন্ধ ডান মুঠোয় কিছু একটা আছে।

'তুমি কিছু দেখাতে চাও আমাদের,' বলল ও। তারপর জিজ্ঞেস করল ও, 'নাম কী তোমার?'

'কোমাল। ডেভিড কোমাল বাও।'

'আমি মাসুদ রানা। কোমাল, হাতে করে তুমি আমাকে কী দেখাতে নিয়ে এসেছ?'

'রানা, বস্?' আদিবাসী কোমাল ভয় কাটিয়ে হেসে উঠল।

তার হাতের দিকে আঙুল তাক করল রানা। 'কী ওটা?'

নিজের মুঠোটা দেখল কোমাল। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে খুলল সেটা। তার কর্কশ তালুতে ছোট্ট একটা বলপয়েন্ট কলম দেখল

রানা। রঙটা সাদা, বেশ দামী মনে হলো ওর। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে।

'লেগুনের ধারে পেলাম আমি,' বলল কোমাল। 'ফাদারকে কালো লোকগুলো দানব মাছের পেটে তোলার পর।'

কলমটা বেশ ভারী। সাদা এনামেলের উপর সোনালি বর্ডার রয়েছে। ব্যারেলের গায়ে সোনালি হরফে লেখা **রাইজিং সান রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজ**।

'উর্বশী!' কলমটা ওকে দেখতে দিল রানা।

নেড়েচেড়ে দেখে রানার দিকে তাকাল উর্বশী। 'এটা একটা নামকরা জাপানি রিসার্চ সেন্টার। আসলে এনজিও, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করে। সি ফার্মিং আর আন্ডারওয়াটার রিসার্চে বেশ নাম করেছে। তুমি চাও আজই আমরা রওনা হই? মেসেজ পাঠিয়ে কপ্টার আনাব?'

হাসল রানা। 'এক রাতে কী আসে যায়।'

মাথা কাত করে একমত হলো উর্বশী, তারপর জানতে চাইল, 'কী খাবে ভেবেছ কিছু?

'ফাদারের বাড়িতে ডাইনিং টেবিল আছে,' বলল রানা। 'স্টোর রুমে রসদেরও কোনও অভাব নেই। আর আছে রান্না করার জন্যে মেয়েমানুষ।'

কিল দেখাল উর্বশী, তারপর ব্যাগ খুঁলে টু-ওয়ে রেডিওটা বের করল।

'খাওয়াদাওয়ার পর,' বলল রানা, 'আমাদের রাতের প্রোগ্রাম ঠিক করা যাবে, কেমন?'

কথাটায় কান না দেওয়ার ভান করলেও, ওর চোখ ফাঁকি দিয়ে একটা ঢোক গিলতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল উর্বশী।

রানা বুঝল, ওরই মত প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে আছে মেয়েটি।

রেডিও অন করে মেসেজ পাঠাচ্ছে উর্বশী: 'কাল ভোরে আমাকে তুলে নিয়ে যেতে হবে। আমার সঙ্গে একজন প্যাসেঞ্জার

থাকবেন বিসিআই-এর মাসুদ রানা। ওভার অ্যান্ড আউট।'

নিজের ব্যাগ খুলে সারভাইভাল ছুরিটা বের করল রানা, কোমাল বাওকে বলল, 'এটা তোমাকে আমরা উপহার দিলাম।'

হাত ধরাধরি করে ফাদার উইলিয়াম লিন্ডসের বাড়ির দিকে এগোচ্ছে উর্বশী আর রানা। ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে হাতের ছুরিটা দেখছে প্রৌঢ় কোমাল, সঙ্গীদেরও দেখাচ্ছে; কলমের বদলে এরকম একটা কাজের জিনিস পেয়ে ভারি খুশি ও।

পরদিন, ভোরবেলা।

পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার একটা প্রদেশ ইরিয়ান জায়া দ্বীপপুঞ্জ, কুরুডু দ্বীপ থেকে চারশো কিলোমিটার দূরে। ইন্দোনেশীয় নেভির প্রায় নীরব একটা হেলিকপ্টার প্রাদেশিক রাজধানী জায়াপুরা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল ওদেরকে।

রানওয়েতে প্যাসেঞ্জার প্লেনের চেয়ে জেট ফাইটার আর ট্রুপস ক্যারিয়ারের সংখ্যাই বেশি দেখতে পাচ্ছে ওরা, সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে।

রানাকে ভ্রূ কোঁচকাতে দেখে উর্বশী জানাল, ওদের দ্বীপের সংখ্যা কয়েক হাজার; তার মধ্যে বেশ কয়েকটায় মাওবাদী বিদ্রোহীরা তৎপর, কখনও বা হঠাৎ খবর আসে অমুক দ্বীপে ইসলামী মৌলবাদীরা গোপনে ট্রেনিং নিচ্ছে, কাজেই যখন-তখন ডাক পড়ে সেনাবাহিনীর।

খোঁজ নিতে গিয়ে রানা জানতে পারল, আজ সারাবেলা জাপানে যাবে এমন কোনও ফ্লাইট নেই। অগত্যা নুমা কোনও প্লেন পাঠাতে পারবে কি না জানার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফকে টেলিফোন করল ও।

দশ মিনিট পর কোয়াজালিয়েন মার্কিন ঘাঁটির ডক থেকে কল-ব্যাক করলেন রেডক্লিফ। বললেন, 'না, কাছাকাছি নুমার কোনও প্লেন নেই। আপনারা এক কাজ করুন, একটা প্লেন চার্টার

করে টোকিও চলে যান।

যোগাযোগ কেটে দিয়ে সঙ্গিনীর দিকে তাকাল রানা। 'আমি যত্দূর জানি, জায়াপুরায় কোনও চার্টার কোম্পানি নেই। এখন করা?'

উর্বশী বলল, 'সত্যিই নেই। আচ্ছা, দাঁড়াও, দেখি আমার বস্ কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন কি না।'

অপেক্ষা করছে রানা।

রেডিও অন করে নেভির ইন্টেলিজেন্স চিফের সঙ্গে বেশ কয়েক মিনিট কথা বলল উর্বশী। তারপর এক সময় হাসিমুখে রানার দিকে তাকাল । 'বস্ সব ব্যবস্থা করছেন। এয়ারফোর্সের একটা হাই অলটিচ্যুড ট্রুপস ক্যারিয়ার নিয়ে যাবে আমাদের।'

'সামরিক জেট প্লেন?' বিস্মিত হলো রানা। 'জাপান তোমাদের সামরিক প্লেনকে ওদের এয়ার স্পেসে ঢুকতে দেবে কেন?'

'দেবে,' বলে হাসল উর্বশী। 'বস্ বললেন, আমাদের নেভির কিছু অফিসার ট্রেনিং নিয়েছে ওখানকার আমেরিকান ঘাঁটিতে। ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে, কাল সকালে ওদেরকে নিয়ে আসার জন্যে একটা ট্রুপস ক্যারিয়ার পাঠাবার কথা। ব্যবস্থা হচ্ছে, আজই সেটা যাতে ওখানে পৌঁছাতে পারে।'

উর্বশীর পাসপোর্টটা চেয়ে নিল রানা, তারপর ওকে জেট প্লেনের অপেক্ষায় থাকতে বলে নিজে রওনা হলো জাপানি কনসুলেট-এর উদ্দেশে, ট্যুরিস্ট ভিসা সংগ্রহ করতে হবে।

দেড় ঘণ্টা পর ভিসা নিয়ে এয়ারপোর্টে ফিরে রানা দেখল রওনা হওয়ার প্রস্তুতি শেষ করে টারমাকে অপেক্ষা করছে পেটমোটা একটা ট্রুপস ক্যারিয়ার।

প্লেনের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে এয়ারফোর্সের পাইলট। কী নিয়ে যেন তার সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হচ্ছে উর্বশীর।

ওদের কথা শুনে রানা বুঝল, উর্বশীকে প্লেনে উঠতে মানা

করছে পাইলট। আর উর্বশী কারণ জানতে চাইছে।

ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাইলট বলছে, 'সময় হলে আমি জানাব, তখন উঠবেন।'

'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না, ফ্লাইট সার্জেন্ট রাশেদ!' উর্বশীর গলায় লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সুলভ কর্তৃত্ব, লোকটার পরা ফ্লাইট সুটের কাঁধে লেখা রয়েছে তার নাম ও পদ।

'আপনি শুধু শুধু মেজাজ খারাপ করছেন, ম্যাডাম,' বেজার মুখে বলল পাইলট। 'তাতে আপনাদের প্লেজার ট্রিপের মজাটাই শুধু নষ্ট হচ্ছে।'

'প্লেজার ট্রিপ!' মুহূর্তের জন্য ভাষা হারিয়ে ফেলল উর্বশী।

কথা না বলে শ্রাগ করল পাইলট।

'প্লেন টারমাকে চলে এসেছে, কাজেই আমি যে-কোনও সময় তাতে উঠব, ফ্লাইট সার্জেন্ট!' ঠাণ্ডা সুরে বলল উর্বশী। 'এবং আমি বলছি, আমরা এখনই উঠব!'

'দেখুন, ম্যাডাম...'

'স্টপ ইট, ফ্লাইট সার্জেন্ট! আপনি আমাকে ম্যাডাম নয়, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার বলুন!'

চেহারাটাকে বাংলার পাঁচ বানিয়ে রেখেছিল পাইলট, উর্বশীর কথা শুনে মুহূর্তের জন্য থতমত খেয়ে গেল। তারপর চাঁছাছোলা ভাষায় বলল, 'এখনও কো-পাইলট আসেনি, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার।' এমনভাবে তাকাল সে, যেন মোক্ষম একটা অস্ত্র ছেড়েছে, উর্বশীর আর কিছু বলবার থাকবে না।

'আসেনি তো যান, ডেকে আনুন!' হিসহিস করে উঠল উর্বশী।

তারপরেও কয়েক সেকেন্ড উর্বশীর দিকে তাকিয়ে থাকল পাইলট, তবে আর কিছু না বলে কো-পাইলটকে ডাকতে গেল সে।

বানার দিকে ফিরল উর্বশী রাগ সামলে নেওয়ার চেষ্টা

করছে। 'চলো, গিয়ার নিয়ে আসি।'

মিনিট দশেক হেঁটে রানাকে নিয়ে এয়ারফোর্সের ডিপোয় পৌঁছাল উর্বশী। একজন সুপারভাইজার ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল, পরিচয়-পত্র দেখাতেই এক প্রস্থ করে ফ্লাইট সুট আর প্যারাশুট দিল দুজনকে। ওগুলো নিয়ে ট্রুপস ক্যারিয়ারের কাছে ফিরে এল ওরা।

সিঁড়ির গোড়ায় পাইলটের পাশে একজন তরুণ অফিসার দাঁড়িয়ে রয়েছে, উজ্জ্বল চোখ দুটোয় রাজ্যের কৌতূহল। তার নাম সমুদ্র।

সে-ও ফ্লাইট গিয়ার পরে নিয়েছে, সারভাইভাল হারনেস-এ আটকানো রয়েছে ছোট আকৃতির সাবমেশিন গান।

'ফ্লাইট প্ল্যান?' গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল পাইলট।

কাগজটা বের করে বাড়িয়ে ধরল উর্বশী। 'টোকিও, ফ্লাইট সার্জেন্ট।'

'বেশ, ঠিক আছে, চলুন তা হলে...'

দশ মিনিট পর কন্ট্রোল টাওয়ারের অনুমতি নিয়ে টেক-অফ করল ট্রুপস ক্যারিয়ার।

দেখতে না দেখতে ইরিয়ান জায়াকে পিছনে ফেলে এল ওরা। নীচে উত্তাল প্রশান্ত মহাসাগর, যতদূর দৃষ্টি যায়। ধীরে ধীরে আকাশের ত্রিশ হাজার ফুট উপরে উঠে এল ওদের প্লেন।

জায়াপুরা থেকে টোকিও প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূরে, রিফুয়েলিং-এর জন্য যাত্রাবিরতি করতে হলো ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের গুয়াম-এ।

মার্কিন দ্বীপ গুয়ামের প্রায় বৃত্তাকার সৈকত আর প্রাকৃতিক দৃশ্য এত সুন্দর, রানার মনে হলো পাইলট যেন ভুল করে ওদেরকে স্বর্গে নিয়ে এসেছে।

এয়ারপোর্টের একটা রেস্তোরাঁয় বসে কফি খাচ্ছে ওরা, বেফাঁস কথা বলবার জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে উর্বশীর কাছে ক্ষমা

চেয়ে নিল পাইলট, স্বীকার করল পারিবারিক অশান্তির কারণে তার মন ভাল ছিল না।

উর্বশী জানাল, সে কোনও অভিযোগ করবার কথা ভাবেনি।

পরিবেশটা হালকা করবার জন্য কো-পাইলট শুরু করল, 'টোকিও দারুণ মজার জায়গা, গেইশা মেয়েগুলো... উর্বশীর সামনে প্রসঙ্গটা তোলা উচিত হয়নি বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বলল, 'মানে, গেইশা মেয়ে পুতুলগুলো এত সুন্দর না, কী বলব!'

সবার আগে হেসে উঠল উর্বশী, ওর দেখাদেখি বাকি সবাই।

ওয়েটার বিল নিয়ে আসতে রানা বলল, 'আমি দিচ্ছি।'

আবার টেক-অফ করে সোজা টোকিওর দিকে ছুটে চলা। ছোট একটা জাপানি দ্বীপ আইয়ো জিমা, ওখানে মাথা তুলে রয়েছে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি, মাউন্ট সুরিবাচি। সরাসরি ওটার জ্বালামুখের উপর দিয়ে ওদেরকে উড়িয়ে নিয়ে এল ফ্লাইট সার্জেন্ট রাশেদ।

'আশা করি পুতুলগুলো তোমাকে যথেষ্ট খাতির করবে, সমুদ্র,' দৃষ্টিসীমার ভিতর জাপানের উপকূল চলে আসতে সকৌতুকে বলল পাইলট। প্লেনটাকে বিশ হাজার ফুটে নামাল সে।

এই সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ট্রুপস ক্যারিয়ার, চারদিকে ছড়িয়ে পড়া বড় টুকরোগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। রানা দেখল উপরদিকে ভেসে যাচ্ছে সে, ইজেক্ট হওয়া সিটের সঙ্গে এখনও স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা শরীরটা।

সিট বাঁকা হলো, তারপর খসে পড়তে শুরু করল। হঠাৎ ঝাঁকি দিয়ে খুলে গেল প্যারাশুট, তবে সিটের ভারে নামছে দ্রুত। সিটবেল্টের বাকল্ খুলে স্ট্র্যাপমুক্ত হলো রানা।

এত উপরে বাতাস খুব পাতলা, অক্সিজেনের অভাবে হাঁপিয়ে

উঠল রানা। ওর অক্সিজেন মাস্ক ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। শ্বাস-প্রশ্বাস আপনা থেকেই দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। এরইমধ্যে বিশ হাজার থেকে পনের হাজার ফুটে নেমে এসেছে ও, বাতাসের প্রচণ্ড চাপ লাগছে ফুসফুসে।

ওঁকে নিয়ে ভারী বাতাসে ঢুকছে প্যারাশুট। নীচে নামবার গতি এখন ধীর। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছে। বিধ্বস্ত প্লেনের ধূমায়িত টুকরোগুলো ওর বেশ অনেকটা নীচে রয়েছে, পাক খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে সাগরে।

রানার ডানদিকে বাতাসে ভাসছে ভেঙে অর্ধেক হয়ে যাওয়া ক্ষতবিক্ষত একটা সিট। সিটের মাথার উপর প্যারাশুট খোলা। সিটে বসে আছে পাইলটদের কারও মাথাবিহীন শরীর–উঁচু আকাশে লাল নায়েগ্রার মত রক্ত ঢালছে। রানা দেখল রক্তের সেই ধারা মাটির দিকে পড়বার সময় ফাঁকা বাতাসে নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে।

বাম দিকে, আরও দূরে, আরেকটা প্যারাশুট ফুলে আছে বাতাসে। ওটার নীচে ঝুলছে ইজেকশন সিট। খালি। কার সিট ওটা?

'ভুল করলে তার মাসুল তো দিতেই হবে!'

প্রায় সরাসরি মাথার উপর আরেকটা ইজেকশন সিট দেখল রানা, সিটের উপরে একটু কাত হয়ে আছে খোলা প্যারাশুট। তরুণ সার্জেন্ট সমুদ্র রাগে গজ্‌গজ্ করছে, নামবার গতি বাড়িয়ে দিয়ে রানার পাশে চলে এল।

'প্লেনটাকে অরক্ষিত রেখে পাইলট কোথাও যায় নাকি? আমি তো আসতামই, আমাকে খুঁজতে যেতে হবে কেন? নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও ওত পেতে ছিল বোমাবাজ লোকটা, পাইলটকে চলে যেতে দেখে টাইম বোমাটা প্লেনের ভেতরে রেখে গেছে!'

ওহ্ গড! রানার মনটা হু-হু করে উঠল: তা হলে ওই খালি,

সিটটা...

দূরে তাকিয়ে প্যারাশুটের নীচে ঝুলন্ত খালি সিটটার দিকে আবার তাকাল রানা।

যে মেয়েটার সঙ্গে ছিল ও, যাকে আপদে-বিপদে পাশে পেয়েছে, পেয়েছে বিছানায়, একান্ত করে? মাত্র একদিন আগে? কয়েক ঘণ্টা আগে? যে মেয়েটার সঙ্গে প্রতি সেকেণ্ডে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছিল? মেধাবি, সপ্রতিভ, আত্মবিশ্বাসী, নিজের কাজে সুদক্ষ, ভাল ট্রেনিং নেয়া অপরূপ সুন্দরী?

নেই!

আর কখনও উর্বশীর হাসি শুনতে পাবে না ও। ওর স্পর্শ অনুভব করবে না। কী মানে এর? কেন এই নিষ্ঠুরতা?

'রেডি হন, মিস্টার রানা, প্যারাশুটের বাক্‌ল্ খুলতে হবে!' সার্জেন্ট সমুদ্রের চড়া গলা শুনে সংবিৎ ফিরল রানার, দেখল আরও ডান দিকে সরে যাচ্ছে ও। 'আমরা সাগরে পড়তে যাচ্ছি!'

নীচে তাকাল রানা। সরাসরি সামনে জাপান উপকূল—যেন মনে হচ্ছে লোকে লোকারণ্য সৈকত। তারপর, ধীরে ধীরে, সকালের রোদে স্পষ্ট হতে শুরু করল দৃশ্যটা।

গাড়ি আর বাড়ি দেখতে পাচ্ছে রানা। ওরা যেখানে নামবে তার কাছাকাছি তীরে পৌঁছাবার জন্য পুলিশের ইমার্জেন্সি ট্রাকও ছুটে আসছে বলে মনে হলো। অস্পষ্ট হলেও, সাইরেনের আওয়াজ চিনতে পারছে ও।

তবে পানিতেই পড়তে যাচ্ছে ওরা। সেটা মারাত্মক বিপদও ডেকে আনতে পারে। কারণ ওরা সম্ভবত পড়বে যেখানে পাথরে বাড়ি খেয়ে বিস্ফোরিত হচ্ছে একের পর এক ঢেউ। ডুবো পাথরও ছড়িয়ে আছে চারপাশে।

এরইমধ্যে ওর নীচে চলে গেছে কো-পাইলট সমুদ্র, বাক্‌ল্ খুলে সাঁতরানোর জন্য প্রস্তুত।

নানা বাতাসের সঙ্গে থাকতে চাইছে রানা, যাতে বেশিক্ষণ

ভেসে থাকতে পারে। একই সঙ্গে আড়াআড়ি এগোবার চেষ্টা করল, যাতে তীরের আরও কাছাকাছি পৌঁছানো যায়।

নীচে তাকিয়ে দেখল চারদিকে পানি ছিটিয়ে সাগরে পড়ল কো-পাইলট।

জাপানিদের রেসকিউ অপারেশনও শুরু হলো। ঝকঝকে একটা পেট্রল বোট পিছনে ফেনার লম্বা রেখা তৈরি করে ছুটে আসছে লেফটেন্যান্টের দিকে।

বাতাসের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে এখনও একপাশে এগোচ্ছে রানা। আগের চেয়ে অনেক কাছে চলে এসেছে তীর। ওর সামনে দৃষ্টিপথ জুড়ে একটা খোলা প্যারাশুটের ছাদ রয়েছে। খালি সিটটা? উর্বশীকে হারাবার ব্যথায় আরেকবার মোচড় খেল বুকটা।

পরমুহূর্তে তীর ছাড়িয়ে এল রানা, দ্রুত বেগে নামছে খোলা একটা জায়গায়। সৈকতের ঠিক পিছনে ঘাস মোড়া জায়গাটাকে কোনও পার্কের অংশ মনে হলো।

অনায়াসে, যতটা সম্ভব নরমভাবে, মাটি স্পর্শ করল ওর পা। বাকল্ খুলে ঘাসের উপর ডিগবাজি খেয়ে ভাল করে দাঁড়াতেও পারেনি রানা, জাপানি রেসকিউ টিমের লোকজন ছুটে কাছে চলে এল। তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন চটপটে একজন অফিসার।

'সব ঠিক আছে, সার? আপনি সুস্থ আছেন তো?'

'হ্যাঁ, আমি ভাল আছি,' বলল রানা। 'আমাদের আর সবাই, প্লিজ?'

'পানি থেকে একজনকে উদ্ধার করেছি আমরা। আরেকজন বিস্ফোরণে মারা গেছেন। কী হয়েছিল আপনি বলতে পারবেন?'

'প্লেনে বোমা ছিল। আর কিছু বলতে পারব না।'

'ওটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, কিছুই উদ্ধার করতে পারিনি আমরা। কেন কেউ আপনাদের প্লেনে বোমা রাখতে যাবে, মিস্টার—?'

'মাসুদ রানা, নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর,' বলল রানা।

'আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তদন্ত করতে আসছিলাম। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কারও স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাই তারা বোমা ফিট করেছে প্লেনে।'

'আই সি,' বললেন অফিসার। 'হ্যাঁ, আপনার টিমের অপর সদস্যের বক্তব্যের সঙ্গে ব্যাপারটা মিলে যাচ্ছে। প্লিজ, আমাদের সঙ্গে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে চলুন। টোকিও থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাউকে ডেকে পাঠাই, যদি সম্ভব হয় নুমার কর্মকর্তাদেরও কেউ আসবেন...

'অপর সদস্য?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'লেফটেন্যান্ট কমান্ডার উর্বশী দাশা।'

চোখ মিটমিট করল রানা। 'উর্বশী... উর্বশী বেঁচে আছে?'

'আমার তো তা-ই ধারণা,' রানার পিছন থেকে উর্বশীর উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

বন্ করে আধ পাক ঘুরল রানা। ওর দু'হাতের ভিতর সেঁধিয়ে গেল উর্বশী। জাপানি পুলিশ অফিসার হেসে উঠলেন। দেখাদেখি বাকি পুলিশও।

'সিট থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। দু'হাজার ফুটের মত খসে পড়ার পর দম ফিরে পাই, তারপর ইমার্জেন্সি প্যারাশুট খুলি।' রানার চোখে চোখ রাখল উর্বশী। 'ওঁরা বললেন একজন মারা গেছে। জানতাম না কে সে।'

নরম জাপানি রোদের মধ্যে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রাখল ওরা–যতক্ষণ না দৃষ্টিকটু লাগে।

টোকিও থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্পেশাল ব্রাঞ্চের দুজন এজেন্টকে পাঠিয়েছে। দুজনেই যথেষ্ট বিনয়ী, তবে তাদের শ্যেন দৃষ্টি ভারি অস্বস্তিকর।

'আপনারা আসছেন, এটা আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নুমা হেডকোয়ার্টার থেকে আগেই জানানো হয়েছিল.' স্পেশাল ব্রাঞ্চের

সিনিয়র এজেন্ট রানাকে বলল। 'আমাদের আকাশে বোমার বিস্ফোরণ দিয়ে যেভাবে শুরু করলেন, প্রথমে আমরা দেখব জাপানের স্বার্থ কোথাও বিঘ্নিত হচ্ছে কি না। তবে আপনাদের নিরাপত্তার দিকটাও আমাদেরকে দেখতে বলা হয়েছে।'

উর্বশীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা, চোখে প্রশ্ন—আমাদের নিরাপত্তার দিকটা ওদেরকে দেখতে হবে কেন? 'আমাদের কাজে যাতে কোনও বাধা সৃষ্টি না হয়, সেদিকটা দেখাই জরুরি,' বলল ও। 'নিরাপত্তার দিকটা আমরা নিজেরাই সামলাব।'

এসবি-র জুনিয়র এজেন্ট বলল, 'নুমা আরও প্রজেক্টে কাজ করছে জাপানে, সে-সব প্রজেক্টেও নিরাপত্তা দিচ্ছি আমরা।'

'এই ব্যাপারটা এত জটিল, নিজেদের নিরাপত্তার দায়িত্ব অন্য কাউকে দেয়া সম্ভব নয়,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা।

এজেন্টদের দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হলো, তবে এ প্রসঙ্গে ভাল-মন্দ কিছু বলল না আর।

'এবার শুরু করুন, প্রথম থেকে,' অনুরোধ করল সিনিয়র এজেন্ট।

উর্বশী আর রানা পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল; তবে দুজনেই সতর্ক থাকল গোপন কোনও তথ্য যাতে প্রকাশ না পায়। নিজেদের কোড দিয়ে জানাল ওয়াশিংটন, ঢাকা আর জাকার্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিতে পারে ওরা সত্যি কথা বলছে কি না।

সবশেষে সার্জেন্ট সমুদ্রের ভাল চিকিৎসার দাবি জানাল উর্বশী, বলল ওদের টোকিও দূতাবাসকে প্লেন স্যাবটাজের খবরটা যেন যত শিগ্‌গির সম্ভব দেওয়া হয়।

এক ঘণ্টা বিশ মিনিট পর স্থানীয় পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ফাঁকা উঠানে একটা হেলিকপ্টার ল্যান্ড করল। অফিস, কামরার জানালা দিয়ে রানা দেখল কপ্টারের গায়ে নুমার লোগো আঁকা রয়েছে।

নুমার একজন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এসেছেন, রিয়ার অ্যাডমিরাল পল মাইলাম। তবে একা আসেননি তিনি, তাঁর সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার দূতাবাস প্রধান আবদুল্লাহ আল হাশিমও এসেছেন।

দুজনের চেহারাতেই গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। স্থানীয় পুলিশ চিফের চেম্বারে ঢুকে সবার সঙ্গে পরিচয় এবং কুশলাদি বিনিময় করলেন ওঁরা।

তারপরেই পুলিশ চিফের চেম্বারের দরজা বন্ধ করে দিয়ে একটা গোপন মিটিং শুরু হলো।

মাত্র পাঁচ মিনিটের বৈঠক শেষে আবার কপ্টারে উঠলেন দুই ভদ্রলোক, এবার ওঁদের সঙ্গে উর্বশী আর রানা রয়েছে। ওদেরকে নিয়ে টোকিওতে ফিরছে পাইলট।

মিটিঙের শুরুতেই রিয়ার অ্যাডমিরাল পল মাইলাম জাপানি প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে ইস্যু করা একটা লিখিত নির্দেশ দেখিয়েছেন স্থানীয় পুলিশচিফকে। সেই নির্দেশে বলা হয়েছে: 'মাসুদ রানা ও উর্বশী দাশা নুমার পক্ষ থেকে জাপানের মাটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে তদন্ত করবেন, এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অনুরোধ করা হচ্ছে ওঁদেরকে যেন সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা করা হয়।' লেখাটার নীচে যথারীতি প্রধানমন্ত্রীর সিল সহ স্বাক্ষর আছে।

কপ্টার তখনও ভাল করে আকাশে ওঠেনি, গলা চড়িয়ে অ্যামব্যাসাডার বললেন, 'কোয়াজালিয়েন আর জাকার্তা থেকে আপনাদের দুজনের নামে দুটো প্যাকেট পৌঁছেছে আমাদের দূতাবাসে। খুলতে মানা, তাই খোলা হয়নি।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা।

'রাইজিং সান, রিয়ার অ্যাডমিরাল?' জিজ্ঞেস করল উর্বশী।

হাতঘড়ির উপর চোখ বুলালেন পল মাইলাম। 'আর দু'ঘণ্টা পর রাইজিং সান রিসার্চ ল্যাবরেটরির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে

অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আপনাদের।'

'তার আগে পরিচ্ছন্ন হতে চাইবেন আপনারা, কাপড় পাল্টাবেন, খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রামও দরকার,' বললেন অ্যামব্যাসাডার আল হাশিম। 'আশা করি আমার বাড়িতে অতিথি হতে আপনাদের কোনও আপত্তি নেই।'

কেউ কিছু বলবার আগে পল মাইলাম পাইলটকে বললেন, 'ওহে, মিস্টার অ্যামব্যাসাডারের বাড়ির লনে ল্যান্ড করতে হবে।'

'ইয়েস, সার!' রোটরের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল পাইলটের গলা।

ইন্দোনেশীয় দূতাবাসের গেস্ট হাউসে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা। বেডরুমে ফিরে দেখল বিছানার উপর কে যেন সাদা পপলিনের শার্ট, জিনসের প্যান্ট, আন্ডারঅয়্যার ইত্যাদি গুছিয়ে রেখে গেছে।

পাশের কামরায় গুন গুন করে গান গাইছে উর্বশী। ব্যাপারটা রীতিমত প্ররোচিত করলেও, নিজেকে সামলে নিল রানা। রাইজিং সান রিসার্চ ল্যাবরেটরির ডিরেক্টরের সঙ্গে জরুরি মিটিং আছে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেইল করা যাবে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

'রেডি?' দোরগোড়ায় এসে হাজির হলো উর্বশী। এত সুন্দর ফিগার ওর–নতুন জিনস, শার্ট আর জ্যাকেটে দারুণ মানিয়েছে।

'রেডি।'

রিয়ার অ্যাডমিরাল পল মাইলামকে নিয়ে ওদের জন্য নীচতলায় অপেক্ষা করছিলেন অ্যামব্যাসাডার আল হাশিম। ওদের তিনজনকে অফিশিয়াল লিমাযিনে তুলে দিলেন তিনি।

ইন্দোনেশিয়ার লাল-সাদা পতাকা উড়িয়ে দূতাবাস থেকে বেরুল ঝকঝকে গাড়িটা। আগে-পিছে জাপানি সশস্ত্র পুলিশের দুটো ভ্যান রয়েছে। তৃতীয় একটা গাড়িতে রয়েছে এসবি-র সেই

দুই এজেন্ট।

জাপানের আকাশে সামরিক বিমানটা বিধ্বস্ত হওয়ায় রানা ও উর্বশীকে কড়া সিকিউরিটির মধ্যে রাখা হয়েছে। আপাতত ব্যাপারটা মেনে নিচ্ছে ওরা।

ব্যস্ত টোকিও শহরের মাঝখানে বিশাল একটা অফিস বিল্ডিঙের নীচে থামল লিমাযিন। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের একজন সেক্রেটারি ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

ওদের সামনে এসে জাপানি কেতা অনুসারে বার কয়েক মাথা নোয়াল সেক্রেটারি, তারপর নিজের পরিচয় দিল। পথ দেখিয়ে ওদেরকে একটা প্রাইভেট এলিভেটরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, বলল, 'আসুন, প্লিজ। আমাদের ডিরেক্টর, মিস্টার ওকিনাওয়া আশামুশি, আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

একটা হার্টবিট মিস করল রানা। পরক্ষণে ভাবল, ভুল শুনেছে। 'ডিরেক্টরের নামটা... কী যেন বললেন, প্লিজ?' সাবধানে জানতে চাইল ও।

'ডক্টর ওকিনাওয়া আশামুশি।'

সঙ্গে সঙ্গে তিক্ত একটা স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেল রানার। দু'বছর আগের ব্যাপার, কিন্তু মনে পড়ে যাওয়ায় লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ও।

জীবনে কখনও কোনও স্বনামধন্য ব্যক্তিকে ওভাবে অপমান করেনি রানা, সেদিন যেমন করেছিল প্রফেসর ওকিনাওয়া আশামুশিকে। সেই বিব্রতকর, অপ্রস্তুত অবস্থার কথা কোনওদিন ভুলবে না ও।

চোদ্দো

দু'বছর আগের কথা।

সব দেশেই এমন কিছু বরেণ্য মানুষ থাকেন যাঁদের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, এক নামে সবাই তাঁদেরকে চেনে, জাপানিদের কাছে সেরকম একজন মানুষ হলেন ডক্টর ওকিনাওয়া আশামুশি। সম্মানিত, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি তিনি। হিমালয়ের মত আকাশ ছোঁয়া যাঁর খ্যাতি ও সম্মান।

শুধু জাপানেই নয়, গোটা বিশ্বেই জীবিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম প্রতিভাবান হিসাবে মান্য করা হয় ডক্টর আশামুশিকে। স্বয়ং সম্রাট বিশেষভাবে তাঁর সঙ্গ পছন্দ করেন, রাজকীয় যে-কোনও অনুষ্ঠানে দাওয়াত পান তিনি।

ডক্টর আশামুশি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আশ্চর্য সব যুগান্তকারী আবিষ্কার রয়েছে তাঁর।

জাপানিদের একটা বড় সমস্যা হলো পাকস্থলির ক্যান্সার, প্রতি বছর অনেক মানুষ এই রোগে মারা যায়। ডক্টর আশামুশির দুটো আবিষ্কার দু'ভাবে রোগটাকে ঠেকাবার ব্যবস্থা করেছে।

আগেই জানা গিয়েছিল, রান্নার কাজে একই তেল বারবার ব্যবহার করবার কারণে জাপানিরা এই রোগটায় অন্যদের চেয়ে বেশি ভোগে। ডক্টর আশামুশি কয়েক বছর গবেষণা করে জানালেন, কেমিকেল রিয়্যাকশন-এর সাহায্যে মলিকিউল-এর পরিবর্তন ঘটিয়ে বহুবার ব্যবহার করা ভোজ্য তেল থেকে ক্ষতিকর

উপাদান দূর করতে সমর্থ হয়েছেন তিনি। অর্থাৎ বিশোধিত এই তেল খেলে আর স্টমাক ক্যান্সার হবে না।

এক বছর পর ডক্টর আশামুশি আরও চমকপ্রদ ঘোষণা দিলেন: 'আমি স্টমাক ক্যান্সার-এর অ্যান্টিডোট টিকা আবিষ্কার করেছি।'

ডক্টর আশামুশির দুটো আবিষ্কারই সময়ের পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উতরে গেছে। জাপানে পাকস্থলির ক্যান্সারে মৃত্যু আগের তুলনায় নেমে এসেছে এখন দশ ভাগের এক ভাগে।

তবে টিকাটা প্রতি বছর নিতে হয়, দামটাও একটু বেশি পড়ে যায়; তা ছাড়া, দশ বছর পর এই টিকায় আর কোনও কাজ হয় না। ওষুধটার এই ত্রুটি দূর করবার জন্য এখনও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে ফ্যাট ও ক্ষতিকর কোলেস্টরল ছাড়া খাসি আর গরুর মাংস পাওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন ডক্টর আশামুশি—যত খুশি খাও, হার্টঅ্যাটাকের ভয় নেই। তবে এখনই নয়, গরুর-ছাগলের রোগ-প্রতিরোধক শক্তি বাড়ানোর পর ওগুলোর মাংস বাজারে ছাড়া হবে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে আরও বহু জিনিস আবিষ্কার করেছেন তিনি—আলো আর শব্দ থেকে এনার্জি তৈরি করেছেন, সেই এনার্জি দিয়ে ট্রেন আর প্লেন চালানো যায়; বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য মিনি অ্যাটমিক রিয়্যাক্টর আবিষ্কার করেছেন; প্রচলিত মডেলের চেয়ে একশো গুণ কম খরচে তৈরি করা যাচ্ছে; বাগদা চিংড়ির চাষ করছেন, একেকটার ওজন পাঁচ কেজিরও বেশি; তাঁর আবিষ্কার করা নতুন ধরনের একটা ব্যাটারি ব্যবহার করে নাসা শীঘ্রি মঙ্গলগ্রহে রকেট পাঠাতে যাচ্ছে, তাতে খরচ পড়বে অন্যান্য ফুয়েলের চেয়ে পঞ্চাশ শতাংশ কম; সাগরের তলায় বসবাসের জন্য গম্বুজ আকৃতির শহর আর সামুদ্রিক ফসল ফলাবার জন্য খেত তৈরির পাইলট প্রজেক্টও তাঁর

সফল হয়েছে।

এভাবে তাঁর অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের তালিকা আরও অনেক লম্বা করা যায়।

ডক্টর আশামুশি সম্পর্কে এ-সব কথা জানা ছিল রানার। মনে মনে ওর খুব ইচ্ছে ছিল, সুযোগ পেলে এরকম একজন বিরল প্রতিভা ও মহৎব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হবে। ওর এই ইচ্ছের কথা ঘনিষ্ঠ দু'একজন বন্ধুকে বলেও ছিল ও।

ওই সময় নুমার একটা প্রজেক্টের কাজ শেষ করে ওয়াশিংটনে রয়েছে রানা। ওর নেতৃত্বে অভিযানটা শেষ হলেও, রিপোর্ট ডিকটেট করার কাজটুকু বাকি ছিল। এক সকালে নুমার হেডকোয়ার্টারে বসে সেক্রেটারিকে সেটারই ডিকটেশন দিচ্ছিল ও, হঠাৎ ওর সেল ফোনটা বেজে উঠল।

সেটটা চোখের সামনে তুলে রানা দেখল নাম-নম্বর ওর অতি পরিচিত। 'কী ব্যাপার, ল্যারি? একটু আগেই না কথা হলো?'

প্রকাণ্ডদেহী ল্যারি কিং নুমার কমপিউটার উইযার্ড। রানার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 'ডক্টর তাকিনাওয়া আশামুশির লেকচার শুনতে চাও?' সরাসরি জানতে চাইল ও।

আগ্রহে চকচক করে উঠল রানার চোখ দুটো। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। কোথায়, কবে...

'পরশু সন্ধ্যায়, এখানেই...মানে, ওয়াশিংটনে। সিয়্যাটল ভার্সিটির কনফারেন্স হল-এ বিজ্ঞানীদের একটা সেমিনার শুরু হতে যাচ্ছে, সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ডক্টর আশামুশি। সারা দুনিয়া থেকে বড় বড় বিজ্ঞানীরা আসছেন তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যে।'

'কিন্তু আমাকে সেখানে ঢুকতে দেবে কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি তো বিজ্ঞানী নই। চাঁটি মেরে...

'নুমার নামে ইনভিটেশন লেটার পাঠিয়েছেন ওঁরা,' বলল কিং, একটু যেন দ্বিধা করছে। 'আমাদের যে-কেউ ওই সেমিনারে যেতে

পারবে—মানে, বিজ্ঞানী না হলে যাওয়া যাবে না, এমন কিছু লেখা নেই।'

'তুমি যাচ্ছ?'

'রক্ষে করো, ও-সব লেকচার শুনলে আমার ঘুম পায়!' হেসে উঠল কিং। 'তা ছাড়া, পরশু আমি ওয়াশিংটনে থাকছি না; মেয়ে দুটোকে নিয়ে কালই নিউ ইয়র্কে যাচ্ছি ভিনাস উইলিয়ামের খেলা দেখতে।'

'ঠিক আছে, ওটা তা হলে পাঠিয়ে দাও।'

'দিচ্ছি। তুমি আরেকটা কাজ করতে পার,' বলল কিং। 'সেমিনারে তুমি যাবে অফিসের একটা লিমাযিনে চড়ে। নুমার গাড়ি থেকে নামতে দেখলে কেউ আর তোমার পরিচয় জানতে চাইবে না।'

'তথাস্তু, দোস্ত!'

পরদিন রাতে নিজের হোটেল রুমে বসে ইন্টারনেট ব্রাউয করছে রানা। খেয়াল নেই কোন্ ওয়েবসাইটে চলে গেছে, হঠাৎ ওকে হতভম্ব করে দিয়ে কমপিউটারের স্ক্রিনে আশ্চর্য একটা লেখা ফুটে উঠল।

প্রথমেই যেটা মনে হলো রানার, এরচেয়ে কাকতালীয় কিছু হতে পারে না। যেন ওকে লক্ষ্য করেই মেসেজটা ওয়েবসাইটে প্রচার করছে কেউ।

সেটা হুবহু এরকম:

আপনি জানেন, বর্তমান দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় প্রতারক কে? সে হচ্ছে জাপানের ভণ্ডবিজ্ঞানী ওকিনাওয়া আশামুশি। সবাই জানে, এই লোকটি মাত্র দশ বছরে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কীভাবে? সত্যিকার প্রতিভাবান একজন বিজ্ঞানীর সমস্ত আবিষ্কার চুরি করে। তাঁর সমস্ত আবিষ্কার নিজের বলে চালিয়ে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—তাঁর থিসিস, বক্তৃতা, আবিষ্কার, উদ্ভাবন, আইডিয়া, স-ব নিজের বলে চালাচ্ছে

ওই নরকের কীট শয়তান আশামুশি।

বর্তমান যুগে এরকম প্রতারণার ঘটনা ঘটতে পারে, শিক্ষিত মানুষকে তা বিশ্বাস করানো সত্যিই খুব কঠিন। তবে পুবদিকে সূর্যের উদয় যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যি হলো: আশামুশি সাধুর মুখোশ পরা মস্ত একটা বিবেকহীন চোর।

সরলমতি, বিষয়বুদ্ধিহীন, অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড এক বিজ্ঞানী ডক্টর নিশিকাওয়া ফাকুদা। তিনি আমার স্বামী। গত দশ বছর ধরে তাঁর প্রতিভার সমস্ত ফসল নির্লজ্জভাবে নিজের বলে চালিয়ে দিচ্ছে আশামুশি।

আমি তাঁর স্ত্রী, মিসেস সুসমি ফাকুদা, একটা স্যানাটোরিয়াম থেকে বলছি। আমার স্বামীকে ঠকানো হচ্ছে দেখে প্রতিবাদ করায় শয়তান আশামুশি কয়েকজন ডাক্তারের সহযোগিতায় জোর করে আমাকে এই পাগলদের আস্তানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর ভাল মানুষ কে কোথায় আছো জানি না, প্লিজ, হেলপ মাই হ্যাজবেন্ড! প্লিজ, হেলপ মি।

গত দু'বছর ধরে আমার স্বামী যে-সব গবেষণায় সফল হয়েছেন, ওই ভণ্ড শয়তান আশামুশি সিয়াটল ভার্সিটিতে বক্তৃতা দিতে উঠে সেগুলো নিজের সাফল্য বলে দাবি করবে!

ঈশ্বরের দোহাই, এই নরাধম প্রতারকের হাত থেকে আমার আত্মভোলা সরল স্বামীকে বাঁচান আপনারা! আমাকে আর আমাদের সন্তানকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে আমাদের সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে লোকটা, আপনারা তার মুখোশ খুলে দিন! জানি, হয় ব্রিফকেস ভর্তি টাকা দিয়ে, নয়তো প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে মানুষের মুখ বন্ধ করে রাখে সে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এত বড় দুনিয়ায় সৎসাহসী এমন কেউ নিশ্চয়ই আছেন যিনি এ-সব তোয়াক্কা না করে আসল সত্য জানার চেষ্টা করবেন। তাঁর প্রতিই আমার এই আবেদন...

শুনুন, আমার হাতে সময় খুব কম। হঠাৎ সুযোগ পেয়ে গিয়ে

লুকিয়ে ওয়েবসাইটে মেসেজটা প্রচার করছি। আমার স্বামীর কী কী আবিষ্কার শয়তান আশামুশি মেরে দিতে যাচ্ছে এখানে আমি তার একটা তালিকা দিচ্ছি...

এরপর লম্বা একটা তালিকা, পড়তে গিয়ে রানার চোখ বড় হয়ে গেল। তালিকার পর আর কিছু নেই।

মেসেজটা আরও দুবার পড়ল রানা। তা কী করে হয়? নিজেকে প্রশ্ন করল। এই যুগে কি এটা সম্ভব? একজনের আবিষ্কার এভাবে অন্য একজন নির্বিঘ্নে মেরে দিতে পারে?

চেয়ারে হেলান দিয়ে দু'মিনিট চিন্তা করল রানা। সিদ্ধান্ত নিল, যতই অসম্ভব মনে হোক, ব্যাপারটা যখন ওর নজরে এসেছে, খোঁজ নিয়ে দেখবে ও।

দুই শিশুকন্যাকে নিয়ে নিউ ইয়র্কে চলে গেছে বন্ধু ল্যারি কিং, তার সঙ্গে সেল ফোনে কথা বলল রানা। 'নিশিকাওয়া ফাকুদা,' কোনও ভূমিকা না করে সরাসরি জানতে চাইল, 'কে?'

'এই নামে বেশ কয়েকজনকে চিনি আমি,' জবাব দিল কিং। 'তুমি কার কথা জানতে চাইছ?'

'ইনি একজন বিজ্ঞানী।'

'ও, আচ্ছা, আত্মভোলা ডক্টর ফাকুদার কথা বলছ তুমি!' হাসল কিং। 'তাঁর পরিচয়, তিনি স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ডক্টর ওকিনাওয়া আশামুশির প্রিয় সহকারী।'

ওয়েবসাইটে পাওয়া তথ্যগুলো সংক্ষেপে বলে গেল রানা। তারপর কিং কী বলে শোনার জন্য কান পেতে থাকল।

কিন্তু অপরপ্রান্ত থেকে কিং কোনও শব্দ করছে না।

'হ্যালো? কিং?'

'দুঃখিত, দোস্ত!' অবশেষে সাড়া পাওয়া গেল কিং-এর। 'আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

'আমি তোমার মতামত জানার অপেক্ষায় আছি।'

'এটা অসম্ভব, রানা! ডক্টর আশামুশি এত ছোট কাজ কখনোই

করতে পারেন না। গোটা জাপানে তুমি এমন একজন লোককেও পাবে না, যাকে ব্যাপারটা বিশ্বাস করানো যাবে।' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে আবার বলল কিং, 'তবে এ-কথা ঠিক যে কিছুদিন আগে এরকম একটা অবাস্তব অভিযোগ নিয়ে মিসেস সুসমি ফাকুদা মিডিয়াতে হইচই ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। কোনও লাভ হয়নি।'

'ঠিক কী হয়েছিল জানো?'

'অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ছে, পিস্তল নিয়ে তিনি বোধহয় একদিন ধাওয়া করেছিলেন ডক্টর আশামুশিকে—স্বামীর আবিষ্কার মেরে দেয়ার অপরাধে খুন করবেন তাঁকে। পুলিশ অ্যারেস্ট করে মিসেস ফাকুদাকে। পরে ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা যায় তিনি আসলে স্কিৎযোফ্রেনিয়ায় ভুগছেন। সেই থেকে ভদ্রমহিলাকে বোধহয় কোনও পাগলাগারদে রাখা হয়েছে।'

'এ-ব্যাপারে ডক্টর ফাকুদার বক্তব্য পাওয়া যায়নি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'একটু একটু মনে পড়ছে... স্ত্রীর পাগলামির জন্যে তিনি বোধহয় ডক্টর আশামুশির কাছে মাফ চেয়ে নিয়ে নিজের চাকরি বজায় রেখেছিলেন।'

'ঠিক আছে, দোস্ত, অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

আবার কমপিউটারের দিকে ফিরল রানা। মিসেস সুসমি ফাকুদার প্রচারিত বক্তব্য প্রিন্ট করল ও, তারপর ওয়েবসাইট-এর ঠিকানাটা লিখে রাখল নোটবুকে। সময়মত কোনও এক সময় স্যানাটোরিয়াম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

পরদিন। সিয়াটল ভার্সিটির কনফারেন্স হল। নুমার একটা লিমাযিন নিয়ে ঠিক সময়মতই পৌঁছে গেল রানা।

চারদিকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রাজধানীর পুলিশ, ভার্সিটির

নিজস্ব গার্ড আর প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানির সশস্ত্র প্রহরীরা দায়িত্ব পালন করছে। গাড়ি থেকে নামা মাত্র প্রত্যেকের পরিচয়-পত্র আর ইনভিটেশন কার্ড, দুটোই পরীক্ষা করা হচ্ছে।

নুমার গাড়ি থেকে নামল বলে রানাকে বিশেষ খাতির করা হলো না। ওকেও পরিচয়-পত্র আর ইনভিটেশন কার্ড দেখাতে হলো। আইডেনটি কার্ডে লেখা রয়েছে—নুমার স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর। কার্ড দুটো দেখে নিঃশব্দ ইঙ্গিতে এগিয়ে যেতে বলল ওকে ইউনিফর্ম পরা শ্বেতাঙ্গ সিকিউরিটি অফিসার।

কনফারেন্স হলে ঢোকার মুখেও চেকিং চলছে, নতুন করে আবার সব দেখাতে হলো রানাকে। এখানে যারা ডিউটি দিচ্ছে তারা সবাই জাপানি। একটা জাপানি প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানির সশস্ত্র গার্ড।

ভিতরে ঢুকেও এই ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা। এই মুহূর্তে আমন্ত্রিত অতিথির চেয়ে সিকিউরিটির লোকজনই বেশি, এবং তারা সবাই ইউনিফর্ম পরা জাপানি গার্ড। তবে প্রতি মুহূর্তে অতিথির সংখ্যা বাড়ছে। এবং দেখতে দেখতে একসময় কনফারেন্স হল কানায় কানায় ভরে উঠল।

দুনিয়ার প্রায় সব দেশ থেকে খ্যাতিমান বিজ্ঞানীরা এসেছেন সেমিনারে যোগ দিতে। তাঁদের অনেকেই ভাষণ দেবেন, বলবেন কার কী সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সম্ভাবনার দুয়ার কতটুকু খুলল।

তবে সবারই মনোযোগ থাকবে প্রধান অতিথি ডক্টর ওকিনাওয়া আশামুশির দিকে। তাঁর বক্তৃতার সময় সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যাবে কনফারেন্স হল।

তার কারণ, সবাই জানেন ডক্টর আশামুশি প্রতি দু'বছর অন্তর নিজের নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানান। গত দশ বছর ধরে এভাবে চারবার ভাষণ দিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন তিনি। আরও একবার মুখ খোলার সময় হয়েছে তাঁর।

প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে আছেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। সবার

ধারণা এবারও ডক্টর আশামুশি অবিশ্বাস্য কিছু আবিষ্কারের খবর দিয়ে সবাইকে আনন্দে মাতিয়ে তুলবেন।

হাতে কমপিউটার প্রিন্ট-আউট, কল্পনার চোখে দেখবার চেষ্টা করছে রানা একটু পর কী ঘটবে। ভাবছে, এই কাগজে যে আবিষ্কারগুলোর কথা বলা হয়েছে, ডক্টর আশামুশি কি সেগুলোর কথাই বলবেন? বলবেন ওগুলো সব তাঁর নিজের আবিষ্কার?

একটু পরেই সেমিনার শুরু হতে যাচ্ছে। কনফারেন্স হলে তিল ধারণের জায়গা অবশিষ্ট নেই। পাশে বসা প্রবীণ এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোককে হাতের প্রিন্ট-আউটটা দেখাল রানা। 'আচ্ছা, এতে যা বলা হয়েছে তার কতটুকু বিশ্বাস করব?'

ঘাড় ফিরিয়ে একবার শুধু কাগজটা দেখলেন ভদ্রলোক, সঙ্গে সঙ্গে মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'আরে, উন্মাদের কথা কোন্ দুঃখে আপনি বিশ্বাস করতে যাবেন! ছিঁড়ে ফেলে দিন!'

রানা ভাবল, অর্থাৎ এই ভদ্রলোক ব্যাপারটা জানেন!

আরেক পাশে বসেছেন আরও এক প্রবীণ ব্যক্তি। ইনি জাপানি। তাঁকেও কাগজটা দেখাল রানা।

'ওহ্, গড! ব্রাউজ করতে গিয়ে আমিও দেখেছি!' চোরা চোখে চারদিকটা একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে ফিসফিস করলেন তিনি। 'স্রেফ চেপে যান!'

'কেন? চেপে যেতে বলছেন কেন? এর একটা বিহিত হওয়া দরকার না?' জানতে চাইল রানা।

কথাটা শুনতে না পাওয়ার ভান করে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেন ভদ্রলোক।

এই সময় শুরু হয়ে গেল অনুষ্ঠান। সুসজ্জিত, উঁচু মঞ্চে এসে বসলেন মাননীয় অতিথিরা।

সেমিনার উদ্বোধন করবার জন্য ভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরকে আহ্বান জানাল সুদর্শন উপস্থাপক।

সংক্ষেপেই সারলেন ভাইস চ্যান্সেলর–পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ

একজন বিজ্ঞানীকে প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা হিসাবে পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় গর্বিত। সবশেষে তাঁকে, অর্থাৎ ডক্টর ওকিনাওয়া আশামুশিকে, তাঁর বক্তৃতা শুরু করবার অনুরোধ জানালেন তিনি।

প্রধান অতিথির আসন ছেড়ে ডায়াসের সামনে এসে দাঁড়ালেন সৌম্যমূর্তি ডক্টর আশামুশি। দীর্ঘদেহী তিনি, সুঠাম চেহারা, গায়ের রঙ উজ্জ্বল সোনালি। তাঁর প্রাপ্তি আর অর্জন বিশাল, সেই তুলনায় বয়স খুব কম–সবে মাত্র পঞ্চাশ পেরিয়েছেন।

ডক্টর আশামুশির ঠোঁটের কোণে সারাক্ষণ সূক্ষ্ম কিছু হাসির রেখা ফুটে থাকে, বড় বড় চোখ দুটোকেও ছুঁয়ে থাকে সেই হাসি, তাঁর ভিতরে যে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে এ যেন তারই প্রচ্ছন্ন প্রকাশ।

পরপর তিনবার সবিনয়ে মাথা নত করে উপস্থিত অতিথি ও শ্রোতাদের সম্মান জানালেন ডক্টর আশামুশি। বক্তৃতা শুরু করলেন নিজস্ব, বিশেষ ঢঙে–ধীর, প্রায় অলস একটা ভঙ্গি; কথার ফাঁকে বিরতিগুলো বেশ দীর্ঘ।

বক্তৃতার শুরুতেই বর্তমান দুনিয়া কী দুর্দশার মধ্যে পড়েছে তার একটা ভয়াবহ চিত্র ফুটিয়ে তুললেন ডক্টর আশামুশি।

মানুষের প্রথম ও প্রধান শত্রু এখন পরিবেশ। অথচ এই পরিবেশ ছিল তার সবচেয়ে বড় বন্ধু। নিজেকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করছি না, সংযমী হতে রাজি নই, আরও বেশি করে ভোগবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছি, এইসব কারণে প্রকৃতি বিরূপ হয়ে উঠছে।

এই বিরূপ প্রকৃতির কারণে ডাঙায় উঠে আসছে সাগর। তাঁর দৃষ্টিতে এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় বিপদ।

তবে এই বিপদকে ভয় পেলে চলবে না। এর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

সমাধান কি আছে? থাকলে সেটা কী? শ্রোতাদের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন ডক্টর আশামুশি। তারপর বললেন, আমি মনে করি সাগরকে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। পৃথিবীকে মানুষ আরও গরম

করবে, মেরুপ্রদেশের জমাট বরফও বেশি করে গলতে থাকবে, কাজেই সাগর ফুলে উঠে কিছুদিনের মধ্যেই এক-তৃতীয়াংশ জমিন গিলে খেয়ে নেবে। এসব জায়গার লোকজন যাবে কোথায়? এরা সরে আসতে চাইবে উঁচু জমিতে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে: এত লোক ধারণ করবার ক্ষমতা নেই ধরিত্রীর অবশিষ্টাংশের।

এটা একটা মহাবিপদ। সাগরকে বাধা দিয়ে এই বিপদ থেকে বাঁচা যাবে না। 'দূর হটো!' বলে চেঁচালেই কি সাগর দূরে সরে যাবে? কক্ষনো না! বাঁচতে হলে সাগরকে আপন করে নিতে হবে। হ্যাঁ, সাগরই হতে পারে মানবজাতির আশ্রয়দাতা। এমনকী আমাদের সবার ভরণপোষণের দায়িত্বও সাগরের উপর দিব্যি ছেড়ে দেওয়া যায় নিশ্চিন্তে।

'আমি আমার ক্ষুদ্র মেধা আর শ্রম দিয়ে চেষ্টা করছি, কীভাবে সাগরের তলায় মানুষ আরাম-আয়েশের সঙ্গে বসবাস করতে পারে,' বললেন ডক্টর আশামুশি। 'ছোট ছোট সাফল্য পাচ্ছি, এখনই গর্ব করে বলার মত কিছু নয় সেগুলো। তবে মানবজাতির কল্যাণে অবদান রাখবে, আমার এমন কিছু নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছুটা ধারণা দিতে চাই আমি...'

খোলা প্রিন্ট-আউটে চোখ, রানা দেখল মিসেস সুসমি ফাকুদা বলেছেন—'*গত দু'বছর ধরে আমার স্বামী যে-সব গবেষণায় সফল হয়েছেন, ওই শয়তান আশামুশি সিয়াটল ভার্সিটিতে বক্তৃতা দিতে উঠে সেগুলো নিজের সাফল্য বলে দাবি করবে!...*'

সত্যিই কি তাই? এখানে, এই মুহূর্তে, সেরকম কিছু ঘটতে যাচ্ছে? ঝট করে রানার চোখ নেমে গেল প্রিন্ট-আউটের আরও নীচে, যেখানে বিভিন্ন আবিষ্কারের তালিকা রয়েছে।

...এক সময় ডাঙা বলতে সামান্যই থাকবে, এটা ধরে নিয়ে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের সাহায্যে মানুষের জন্যে সাগরতলেও মাংসের ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি। গৃহপালিত কিছু পশুর ফুসফুস আমি বদলে দেব,' বলে চলেছেন ডক্টর ওকিনাওয়া

আশ্যমুশি, 'ফলে সাগরের গভীর ও লোনা পানিতে সুস্থভাবে, স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারবে ওগুলো, বংশবৃদ্ধি করবে।

'রাইজিং সান রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজের ল্যাবে, আমার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে, এটার সফল এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে। প্রথমে অপারেশন করে ফেলে দেয়া হয়েছে কয়েকটি পশুর ফুসফুস, যেগুলো তারা জন্মসূত্রে পেয়েছিল। তারপর ওগুলোর শরীরে ক্লোন-এর মাধ্যমে তৈরি জলচরের ফুসফুস প্রতিস্থাপন করা হয়।

'সফল সার্জারির পর ওগুলোকে লোনা পানি ভর্তি একটা জলাশয়ে একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা রাখা হয়; অথচ একটি পশুও মারা যায়নি, ওদের শ্বাস-প্রশ্বাসে কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি...'

'সরি, সার!' সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, একটা হাত তুলল মাথার উপর; বিনীত ও মার্জিত ভঙ্গিতে, পরিশীলিত ইংরেজি উচ্চারণে প্রতিবাদ জানাচ্ছে ও। 'এক্সট্রিমলি সরি, সার। বাট আই বেগ ফর আ লিট্‌ল্ কারেকশন।'

কনফারেন্স রুমে বোমা পড়লেও কেউ বোধহয় এরচেয়ে বেশি বিস্মিত হত না।

'বসুন, বসুন আপনি! প্লিজ, ডিসটার্ব করবেন না!' চারদিক থেকে রানার দিকে এগিয়ে আসছে সশস্ত্র জাপানি গার্ডরা, ওদের নাকি গলায় ধমকের সুর।

'গার্ডদের বলছি, থামো তোমরা!' অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে ডক্টর আশামুশির ভরাট কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'কেউ যদি কিছু বলতে চান, তাঁকে অবশ্যই সে সুযোগ দিতে হবে। ইয়েস, ইয়াং ম্যান? আপনার পরিচয়, সার? আমার কোন্ কথাটার সঙ্গে আপনি দ্বিমত পোষণ করছেন, প্লিজ?'

'কিছু যদি মনে না করেন, ডক্টর ওকিনাওয়া আশামুশি, সার, আমি জানতে পেরেছি এই মাত্র আপনি যে আবিষ্কারটির কথা বললেন সেটা আসলে আপনার নিজের আবিষ্কার নয়। ওটা ডক্টর নিশিকাওয়া ফাকুদা নামে একজন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার।'

ঝাড়া তিন সেকেন্ড বোবা হয়ে থাকল কনফারেন্স হলে উপস্থিত প্রতিটি মানুষ। কেউ একচুল নড়ল না, কেউ এমনকী নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলল না।

তারপর শুরু হলো চাপা গুঞ্জন। ফিসফিস করছে সবাই–হোয়াট ইজ দিস? কে ওই লোকটা? কী তার উদ্দেশ্য? এমন একজন সনামধন্য ব্যক্তিকে এভাবে আক্রমণ করতে এতটুকু দ্বিধা নেই! লোকটা পাগল নাকি?

আবার সবাই নীরব হয়ে গেল, কারণ অ্যাড্রেস সিস্টেমে ডক্টর আশামুশি কথা বলছেন: 'আপনার পরিচয়, প্লিজ, ইয়াং ম্যান?'

'মাসুদ রানা,' বলল ও। 'নুমার সঙ্গে আছি–স্পেশাল প্রজেক্ট ডিরেক্টর।'

'আপনার অভিযোগ শুনে স্বভাবতই আমি কৌতুক বোধ করছি, মিস্টার রানা,' ধীরে ধীরে বললেন ডক্টর আশামুশি। 'এ বিষয়ে আর কী জানা আছে আপনার?'

'রাইজিং সান রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজের ল্যাবেও নয়, আপনার তত্ত্বাবধানেও নয়; এক্সপেরিমেন্টটা করা হয় একটা প্রাইভেট পশু হাসপাতাল ও সাগর সংলগ্ন জলাশয়ে–আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডক্টর ফাকুদার তত্ত্বাবধানে,' প্রিন্ট-আউটে ছাপা লেখা পড়ে জবাব দিচ্ছে রানা। 'ছত্রিশ ঘণ্টা পানিতে রাখার পরেও কোনও সমস্যা হয়নি, তবে ইনফেকশনের কারণে পশুগুলোর চোখ ফুলে নষ্ট হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল।'

অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে মৃদু হাসির শব্দ বেরুল। 'এ-সব তথ্য আপনি কোথায় পেলেন, মিস্টার রানা?' জানতে চাইলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আশামুশি।

'মিসেস ফাকুদার কাছ থেকে,' বলল রানা।

'ও, আচ্ছা, তাই বলুন! বেচারি, বেচারি মিসেস ফাকুদা! ঈশ্বর ওঁর প্রতি সদয় হোন,' কোমল সুরে বললেন ডক্টর আশামুশি। 'আসুন আমরা সবাই ওঁর জন্যে প্রার্থনা করি। প্রায়

বছরখানেক হলো পাগলাগারদে আছেন তিনি, আর আমার এক্সপেরিমেন্টটা করা হয়েছে তাঁর পাগলামি শুরুর আগে। যার যা বোঝার এ থেকেই বুঝে নিন, আমার আর কিছু বলার নেই। ধন্যবাদ।'

হল ভর্তি শ্রোতা হেসে উঠল। তারা যেন ব্যঙ্গ করে রানাকে বলছে–পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়!

একটু বিরতি নিলেন প্রধান অতিথি, এক ঢোক পানি খেয়ে আবার তাঁর এক্সপেরিমেন্টের বর্ণনা দিতে শুরু করলেন।

ধীরে ধীরে নিজের সিটে বসে পড়ল রানা। ওর ধারণা ছিল অনেকেই সমর্থন করবে ওকে, কিন্তু তা তো করেইনি, বরং স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত হয়েছে ও সবার চোখে।

নিজেকেও কম তিরস্কার করল না রানা। কথা তো সত্যি, মানসিক প্রতিবন্ধী একজন মহিলার কথা কি বিশ্বাস করা উচিত হয়েছে ওর? আরও একটু খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত ছিল না?

'...আমার আরও একটা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার–সাগরের তলায় ধানের চাষ,' বলে চলেছেন বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানী। 'আমরা এখন জানি, বুনো ঘাসের শস্য বা ধানগাছ হয়ে ওঠার রহস্য–তিনটে জেনেটিক পরিবর্তনের ফল। প্রাচীন যাযাবর মানুষকে গৃহী করে তোলে এই পরিবর্তন।

'এবার আমি আধুনিক ধানের দুটো জিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে সাগরের তলায় ওগুলোর বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা করেছি, নাম দিয়েছি জলজ ধান....'

'সরি!' আবার দাঁড়াল রানা; আবার হাত তুলল মাথার উপর। 'আই য়্যাম রিয়েলি সরি, ডক্টর আশামুশি! আপনার কথার প্রতিবাদ না করে পারছি না, সার, কারণ এ বিষয়েও আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে।'

এবার মাত্র এক সেকেন্ড থমকে থাকলেন শ্রোতারা। অনেকেই ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালেন–কেউ বিরক্ত, কেউ বিস্মিত,

তবে বেশিরভাগই চিন্তিত। চাপা গুঞ্জন ভেসে আসছে চারদিক থেকে।

গার্ডরা সতর্ক, নিঃশব্দে রানার দিকে এগিয়ে আসছে।

চোখ নামিয়ে আরেকবার প্রিন্ট-আউটটা দেখে নিল রানা। 'এটাও আপনার আবিষ্কার নয়,' পরিবেশটা যতই আড়ষ্ট আর অবাস্তব বলে মনে হোক, রানার আচরণে দৃঢ়তা আর আত্মবিশ্বাসের এতটুকু অভাব নেই। 'এক্সপেরিমেন্টটা করা হয় মাস ছয়েক আগে। আপনি সুপারভাইজ করেছেন, কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট থেকে শুরু করে রিসার্চ পেপার তৈরি করা পর্যন্ত প্রতিটি কাজ করেছেন আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডক্টর নিশিকাওয়া ফাকুদা। এটা ওঁর কয়েক বছরের সাধনার ফসল, আরেকজনের গবেষণালব্ধ আবিষ্কার আপনি স্রেফ নিজের বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন...'

'সোর্স, মিস্টার মাসুদ রানা?' ভরাট, অথচ শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানী। 'কোত্থেকে আপনি এ-সব কথা জানতে পারলেন?'

'আমার সোর্স মিসেস সুসমি ফাকুদা,' রানার সেই একই উত্তর।

'মানসিক প্রতিবন্ধী একজন ভদ্রমহিলার কথা তুলে নিজেকে আপনি বারবার বিড়ম্বিত করছেন কেন, ইয়াং ম্যান?' স্বাভাবিক আলাপচারিতার সুরে জানতে চাইলেন ডক্টর আশামুশি, এতটুকু উত্তেজিত বা নার্ভাস নন তিনি।

তাঁকে সমর্থন করে অনেকেই রানার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করল। গার্ডরা ইতিমধ্যে আরও কাছে চলে এসেছে। রানার দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে আছে তারা।

'তার আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, প্লিজ,' বলল রানা। 'স্যানাটোরিয়ামে বন্দি ওই মানসিক প্রতিবন্ধী আপনার এই আবিষ্কারগুলো সম্পর্কে জানলেন কীভাবে? এ-সব যদি আপনার

আবিষ্কারই হবে, ওঁর তো কোনওভাবেই তা জানার কথা নয়।'

এবার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মৃদু শব্দে হেসে উঠলেন ডক্টর আশামুশি। 'আপনিই বলুন, ইয়াং ম্যান, কীভাবে তিনি জানলেন?'

'নিশ্চয়ই আসল আবিষ্কারক, ডক্টর নিশিকাওয়া ফাকুদা, স্যানাটোরিয়ামে স্ত্রীকে দেখতে গিয়ে এ-সব কথা জানিয়েছেন তাঁকে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, আপনার কথায় যুক্তি আছে,' বললেন ডক্টর আশামুশি। 'স্যানাটোরিয়ামে একমাত্র ফাকুদাই তাঁর স্ত্রীকে দেখতে যেতে পারেন, আর কারও যাবার অনুমতি নেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'এখন বলুন আপনি কী চান, ইয়াং ম্যান?'

'আমি চাই,' বলল রানা। 'যেটা সত্যি সেটাই সবাই জানুক। যেহেতু একটা সংশয় দেখা দিয়েছে, ব্যাপারটার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন।'

'কীভাবে এটার ফয়সালা হতে পারে, কোনও আইডিয়া দিতে পারেন?' হাসিমুখে জানতে চাইলেন ডক্টর আশামুশি।

'আমি শুনেছি এই সেমিনারে ডক্টর ফাকুদা উপস্থিত আছেন,' বলল রানা। 'আমি চাই, এই মুহূর্তে মঞ্চে উঠে সত্যি কথাটা আমাদের জানাবেন তিনি।'

'ও, আচ্ছা! আমাকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্র!' বলে হেসে উঠলেন জাপানের নমস্য ব্যক্তি ডক্টর আশামুশি। 'না-না, এমনি ঠাট্টা করলাম! বেশ, ঠিক আছে। ডক্টর ফাকুদাকেই ডাকা হোক। দেখা যাক তিনি কী বলেন। ডক্টর ফাকুদা, প্লিজ, দয়া করে স্টেজে চলে আসুন।'

সবাই বুঝতে পারছে পরিস্থিতির মধ্যে নাটকীয়তার উপাদান চলে এসেছে। পণ্ডিত ও সুধী সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত শ্রোতারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছেন। না জানি কী হয় এরপর! কেউ একটু নড়াচড়া করছেন না।

সেজন্যই রানার কাছ থেকে মাত্র দুই সারি সামনে, একটু

ডানদিকে, কারও নড়ে ওঠাটা সবার চোখে একযোগে ধরা পড়ল।

সিট ছেড়ে দাঁড়াতে গিয়ে আনাড়ি, অপ্রতিভ এক জাপানি কিছু একটার সঙ্গে পা বাধিয়ে ফেলেছেন। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে কোনওরকমে নিজেকে রক্ষা করলেন তিনি। পরমুহূর্তে পাশে বসা এক লোকের গায়ে ঢলে পড়লেন।

জাপানি ভদ্রলোকের আশপাশ থেকে সহানুভূতিসূচক আওয়াজ ভেসে আসছে। কয়েক জোড়া হাতের সাহায্য নিয়ে সিধে হলেন তিনি, তারপরও আড়ষ্ট ভাব দূর হচ্ছে না।

'ওই তো আমার সুযোগ্য সহকারী, ডক্টর নিশিকাওয়া ফাকুদা,' অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে ডক্টর আশামুশির স্বস্তিভরা গলা ভেসে এল। 'উপলক্ষ্য যখন পেয়েছি, ওঁকে সম্মান জানাবার এই সুযোগ আমি হাতছাড়া করব না। অন্তত ডক্টর ফাকুদা সম্পর্কে আমার ধারণার কথাটা দয়া করে বলতে দিন আমাকে। এই, ডক্টর ফাকুদাকে তোমরা কেউ অ্যাড্রেস সিস্টেমের একটা মাউথপিস দিয়ে এসো।'

একটু পরেই মাউথপিস নিয়ে স্টেজ থেকে নেমে এল একজন অ্যাটেনড্যান্ট।

'প্রথমেই বলি,' শুরু করলেন ডক্টর আশামুশি, 'ডক্টর ফাকুদাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে পেয়ে আমি খুশি নই। খুশি নই এই জন্যে যে আমি জানি উল্টোটা হলে বেশি মানাত—অর্থাৎ, আমার ওপরে তিনি থাকলে, আমি ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট হলে। তার কারণ, আমার চেয়ে শতগুণ বেশি যোগ্য তিনি। ওঁর পাণ্ডিত্যের কাছে আমি এখনও শিশু মাত্র। উনি যে-সব বই লিখেছেন সেগুলো আগামী কয়েকশো বছর সারা দুনিয়ার ভার্সিটিতে পড়ানো হবে। প্রতিভার বিচারে স্টিফেন হকিঙের সমকক্ষ বলে মনে করি ওঁকে আমি নানামুখী গবেষণার কারণে। আমার বিশ্বাস, আমাদের ডক্টর ফাকুদা বর্তমান দুনিয়ার জীবিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

'কিন্তু বাস্তব দুনিয়াটাকে আজও আমরা যুক্তিগ্রাহ্য করে

সাজাতে পারি না। সেজন্যেই ওঁকে আমার নীচে থাকতে হয়েছে। উনি কলেজ ও ভার্সিটি থেকে যে-সব ডিগ্রি পেয়েছেন সেগুলোর একটাও ফার্স্ট ক্লাস নয়, কারণ হলো ওঁর লেখায় পাণ্ডিত্যের মাত্রা এত বেশি ছিল যে যাঁরা খাতা দেখেছেন তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য লাগায় নম্বর দিয়েছেন কম।'

'অপ্রাসঙ্গিক কথা বাদ দিলে হয় না, ডক্টর আশামুশি?' গলা চড়িয়ে বলল রানা, চোখের কোণ দিয়ে দেখল মাউথপিস নিয়ে ডক্টর ফাকুদার কাছে পৌঁছে গেছে অ্যাটেনড্যান্ট।

'সত্যি দুঃখিত, ইয়াং ম্যান,' আন্তরিক সুরে বললেন ডক্টর আশামুশি। 'না, আপনাকে আর অপেক্ষা করিয়ে রাখা ঠিক নয়। ডক্টর ফাকুদা, সবই তো আপনি শুনেছেন। সাগরের তলায় ডাঙার প্রাণীর বেঁচে থাকার উপযোগী ফুসফুস আর ধানচাষ, এই দুটো আবিষ্কার নাকি আমার নয়, আপনার। কথাটা কি সত্যি? আমি কি আপনার আবিষ্কার নিজের বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি?'

কনফারেন্স হলে একটা পিন পড়লেও শোনা যাবে এখন।

সময় বয়ে যাচ্ছে। ডক্টর ফাকুদা জবাব দিচ্ছেন না। পুরো একটি মিনিট তিনি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

তারপর ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালেন তিনি। ওঁকে ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে দেখল রানা। 'না, মিস্টার রানা, কথাটা ঠিক নয়। কে বলল ওগুলো আমার আবিষ্কার? দুঃখিত, আপনি নিশ্চয়ই ভুল তথ্য পেয়েছেন। ধন্যবাদ।'

চুপসে গেল রানা, শীতের রাতে কেউ যেন ওর গায়ে এক বালতি ঠাণ্ডা পানি ছুঁড়ে মেরেছে। দেখল, ওর দিকে যেমন জাপানি গার্ডের একটা গ্রুপ এগিয়ে আসছে, তেমনি ডক্টর ফাকুদার দিকেও এগিয়ে যাচ্ছে আরেকটা গ্রুপ।

গলা চড়িয়ে রানা বলল, 'এক মিনিট! মিসেস সুসমিকে দেখতে গিয়ে আপনিই ওঁকে এ-সব বলেছেন, অথচ এখন স্বীকার

করছেন না—কেন? কাকে ভয় পাচ্ছেন আপনি?'

আইল ধরে অনিশ্চিত পায়ে হাঁটছেন ডক্টর ফাকুদা, সশস্ত্র গার্ডরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে ওঁকে। একবার থেমে ঘাড় ফেরালেন তিনি, সরাসরি রানার দিকে তাকালেন। 'আপনি ভুল করছেন। আশামুশি মহৎপ্রাণ মানুষ, জ্ঞানের সাগর, গোটা জাপানের আদর্শ পুরুষ, তাঁর বিরুদ্ধে এরকম একটা ভিত্তিহীন অভিযোগ...না, আপনি যে-ই হন, কাজটা ভাল করলেন না।'

'মুখ খুললে আপনার ছেলে আর স্ত্রীকে খুন করা হবে, এটাই কি আপনার ভয়ের আসল কারণ, ডক্টর ফাকুদা?'

'স্টপ ইট, সার!' কঠোর গলায় ধমকে উঠল একজন জাপানি গার্ড।

ডক্টর ফাকুদা আর রানার মাঝখানে আড়াল তৈরি করে ফেলেছে ওরা, ঘিরে ধরেছে রানাকেও। 'একটা গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স এভাবে পণ্ড করতে দেয়া যায় না,' তাদের একজন বলল। 'আপনাকে আমরা বাইরে নিয়ে যাচ্ছি, সার। আপনার গাড়িতে তুলে দেব।' গলা নামিয়ে কানের কাছে বলল, 'স্বেচ্ছায় না গেলে জোর খাটাতে বাধ্য হব আমরা।'

কথা না বলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, দেখল ডানদিকের একটা দরজা দিয়ে ইউনিফর্ম পরা প্রহরীরা ডক্টর ফাকুদাকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। অসহায় ভঙ্গিতে শ্রাগ করল ও। তারপর ডায়াসের তাকাল দিকে।

ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন ডক্টর আশামুশি।

'ডক্টর আশামুশির কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত,' গার্ডদের বলল রানা।

কিন্তু ওর কথায় কান না দিয়ে বুকে ধাক্কা মারল একজন গার্ড, বাকি তিনজন ঠেলা-গুঁতো দিয়ে কনফারেন্স হল থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। অবাক হলো রানা, নিমন্ত্রিত একজন

অতিথিকে অপদস্থ হতে দেখেও কেউ সামান্য আপত্তি জানাল না।

সেমিনার শেষ হওয়ার পর আর মাত্র একদিন আমেরিকায় ছিলেন ডক্টর আশামুশি আর ডক্টর ফাকুদা। ওঁদের সঙ্গে দেখা করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল রানা, কিন্তু সফল হয়নি।

পনেরো

টোকিও, জাপান।

রাইজিং সান রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজের হেড অফিস। প্রাইভেট এলিভেটরে চড়ে টপ ফ্লোরে উঠল ওরা–রানা আর উর্বশী তো আছেই, আরও আছেন নুমার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক রিয়ার অ্যাডমিরাল পল মাইলাম। করিডর ধরে ওদেরকে পথ দেখাচ্ছে ডক্টর আশামুশির সেক্রেটারি।

নরম চামড়া ও মখমল দিয়ে সাজানো বড়সড় একটা কামরায় নিয়ে এল ওদেরকে সুন্দরী সেক্রেটারি। ঘরের চার দেয়ালে সদ্য পালিশ করা কাঠের প্যানেল আলো পড়ে ঝিকমিক করছে।

মেহগনি কাঠের বিরাট একটা ডেস্ক ওপাশে বসে কাজ করছিলেন, ওদের দেখে কলম নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন সৌম্যমূর্তি ডক্টর আশামুশি। রানার উপর চোখ পড়তেই তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। সবিনয়ে হাসলেন তিনি, যেন রানার অস্বস্তিবোধ দূর করবার জন্যই; তারপর জাপানি সংস্কৃতি অনুসারে সবার উদ্দেশে মাথা নোয়ালেন।

'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ফোন করে বললেন, কী একটা সমস্যা হয়েছে, আমি নাকি আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারব,' বললেন তিনি। তাঁর ইংরেজি বিশুদ্ধ, বাচনভঙ্গিতে কোনও টান নেই বললেই চলে। তারপর যেন এই প্রথম উর্বশী আর মাইলামকে দেখতে পেলেন। টেবিলের পিছন থেকে সামনে চলে এলেন। 'ওহ্, দুঃখিত। আমি ওকিনাওয়া আশামুশি, রাইজিং সান রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর...'

ওর দুই সঙ্গীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল রানা। হাসিমুখে হ্যান্ডশেক করলেন সবাই। ওদেরকে খাতির করে বসালেন ডক্টর আশামুশি। ইঙ্গিত পেয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সেক্রেটারি। নিজের সুইভেল চেয়ারে ফিরে গেলেন বিজ্ঞানী।

দু'বছর আগের সেই ব্যাপারটা তুলতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওকে থামিয়ে দিলেন ডক্টর আশামুশি। 'অতীতের ভুল-ভ্রান্তি ভুলে থাকাই ভাল; তাতে আয়ু বাড়ে, ইয়াং ম্যান। আপনারা বরং কী কাজে এসেছেন সেটা খুলে বলুন, প্লিজ।'

উর্বশী বলল, 'আমরা জানি সান রাইজ রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজ আধা-সরকারী স্বায়ত্তশাসিত একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আপনাদের বেশিরভাগ প্রজেক্টই সমুদ্র আর সামুদ্রিক খাবার নিয়ে।'

'ওহ্—ফুড, কেমিকেল, ক্লোদিং কী নয়! মানবজাতির জন্যে সাগরই তো হতে যাচ্ছে নতুন ফ্রন্টিয়ার। এমনকী আমরা হয়তো একসময়ে সাগরের তলাতেই বসবাস করব। বাস করব, খামার তৈরি করব, শিল্প গড়ে তুলব।' হাসছেন তিনি, রঙিন স্বপ্ন ভরা দুই চোখ একটু যেন ঢুল ঢুলু হলো।

হাতের কেসটা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ডেস্কের উপর তুলল রানা, ঢাকনি খুলল, ভিতর থেকে বের করে আনল সিল করা কাঁচের তৈরি একটা কন্টেইনার। ওটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ওকিনাওয়া আশামুশি। তাঁর ভ্রূ জোড়া একটু কুঁচকে আছে।

এরপর দ্বিতীয় কেসটা ডেস্কের উপর তুলল উর্বশী, আরেকটা গ্লাস কন্টেইনার বের করে প্রথমটার পাশে রাখল। দুটোর ভিতরেই সবুজ সাপের মত ডাঁটা আর চৌকো পাতা নড়ছে, মোচড় খাচ্ছে, যেন চেষ্টা করছে কাঁচ ভেঙে বেরিয়ে আসতে।

কী ওগুলো, কোথায় পাওয়া গেছে, শুধু এই দুটো তথ্য দিল রানা। বিষ আর দ্রুত বেড়ে ওঠা সম্পর্কে কিছু বলল না।

তবে বিজ্ঞানী আশামুশি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন গ্লাসের ভিতর কী হারে বাড়ছে ওগুলো। 'এত দ্রুত ছড়াচ্ছে, কন্টেইনারে জায়গা হচ্ছে না!' রুদ্ধশ্বাসে বললেন তিনি।

'হ্যাঁ, খালি চোখেই ধরা যায়,' বলল রানা। 'এই লতা কি আপনি চিনতে পারছেন, সার?'

সামনে ঝুঁকলেন আশামুশি, বোতলের ভিতর ভাল করে তাকালেন, তারপর মাথা ঝাঁকালেন। 'ওহ্, ইয়েস! একটা স্যাম্পল নিয়ে বহুবছর ধরে এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম আমরা। অত্যন্ত উঁচু মাত্রার প্রোটিন সোর্স, নানা রকম ভিটামিন ও মিনারেলে ভর্তি, আর বাড়েও খুব দ্রুত। ওটাকে নিয়ে অনেক আশা ছিল আমাদের। তবে না, এটা ঠিক সেটা নয়—না। এর রঙ আরও গাঢ়, পাতার আকৃতিও দেখছি কিছুটা অন্যরকম। অনেকটা মেলে, হয়তো বেসিক প্লান্ট একই, তবে হুবহু নয়।'

'প্লান্টটা নিয়ে কাজ করার সময় কোনও সমস্যা হয়েছিল?' জানতে চাইল উর্বশী।

'না।'

'কোনও দুর্ঘটনা?' প্রশ্ন করল রানা।

'না।'

'আপনাদের আন্ডারওয়াটার রিসার্চের কাজ কোথায় করা হয়, সার?' জানতে চাইল রানা।

'আমাদের আন্ডারওয়াটার ফার্মিং আছে উশি-শিমা দ্বীপের 'আরিয়াকেনো-উমিতে,' বললেন আশামুশি। 'ওটা আরাও-এর

কাছাকাছি।' হঠাৎ জেদি আর ক্রুদ্ধ দেখাল তাঁকে। 'আপনারা কী যেন আমাকে বলছেন না। কী সেটা, মিস্টার মাইলাম?'

'দুঃখিত, সার,' বললেন পল মাইলাম। 'এই পর্যায়ে সব কথা এমনকী আপনাকেও বলা যাচ্ছে না।'

মাইলাম থামতেই রানা জানতে চাইল, 'উশি-শিমায় এমন কোনও এক্সপেরিমেন্ট কি হয়েছিল, যেটা চেপে যাওয়া হয়?'

'চেপে যাওয়া হয়? কী বলছেন আপনি! যতই বিপজ্জনক হোক, কোনও এক্সপেরিমেন্টের কথা আমি চেপে যাব কেন?'

'মারাত্মক কিছু একটা হয়তো ঘটেছিল, আপনাকে জানানো হয়নি, এমন কি হতে পারে?' প্রশ্ন করল উর্বশী।

অকস্মাৎ পাথর হয়ে গেলেন ওকিনাওয়া আশামুশি। তাঁর সরু চোখ দুটো আরও সরু হয়ে গেল, তীব্র দৃষ্টিতে উর্বশী আর রানাকে দেখছেন। একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি। ভিতরে ঢুকল সেক্রেটারি মেয়েটা। এতটাই বিচলিত হয়েছেন বিজ্ঞানী মহোদয়, নির্দেশ দিলেন জাপানি ভাষায়।

'ইমিডিয়েট টেক-অফ করতে হবে, আমার প্লেন রেডি করতে বলো!'

সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে গেল মেয়েটা। পল মাইলাম, উর্বশী আর রানার দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকালেন রাইজিং সান রিসার্চ ল্যাব-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 'উশি-শিমায় গিয়ে সরেজমিনে দেখব আমরা।' চেয়ার ছাড়লেন তিনি।

'মানে,' নুমার স্থানীয় ব্যবস্থাপক মাইলাম জিজ্ঞেস করলেন, 'এখনই, সার?'

'হ্যাঁ, এক্ষুনি!'

'কিন্তু, দুঃখিত, আমার যে আরও কাজ আছে...'

'ঠিক আছে, মিস্টার মাইলাম, আপনাকে ছাড়াই চালিয়ে নেব আমরা,' বলল রানা, তারপর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে তাকাল। 'আপনি যখনই বলবেন, আমরা রেডি, সার।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে রানার উদ্দেশে মাথা নোয়ালেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 'এখনই, ইয়াং ম্যান।'

পল মাইলামকে পথ দেখিয়ে ইন্দোনেশীয় দূতাবাসের লিমাযিনের কাছে নিয়ে যেতে বলা হলো বেয়ারাকে, ড্রাইভার তাঁকে তাঁর গন্তব্যে পৌঁছে দেবে।

উর্বশী ও রানাকে সঙ্গে নিয়ে একটা প্রাইভেট এলিভেটরে উঠলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। নামল না এলিভেটর, উঠল। টপ ফ্লোরে সাদা পোশাক পরা দুজন লোক অপেক্ষা করছে, রানা দেখেই বুঝল সশস্ত্র দেহরক্ষী।

এলিভেটর থেকে বেরিয়েই দ্রুতপায়ে একটা হেলিকপ্টারের দিকে হাঁটছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর, উর্বশী আর রানা ঠিক তাঁর পিছনে। রোটর এরইমধ্যে ঘুরতে শুরু করেছে। মাথা নিচু করে কপ্টারে চড়ল ওরা। দেহরক্ষী দুজন সামনে, পাইলটের সঙ্গে বসল।

ব্যগ্র কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 'গো! গো!'

যতই ব্যস্ততা দেখান ভদ্রলোক, তাঁর প্রতিটি নড়াচড়ার মধ্যে কৃত্রিম কী যেন আছে বলে মনে হচ্ছে রানার।

ধীরে ধীরে আকাশে উঠল কপ্টার। কর্মব্যস্ত শহরের উপর দিয়ে ছুটল ওরা। দুপুরবেলার নীল আকাশে গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাউন্ট ফুজির তুষার ঢাকা চূড়া। সেটাকে পিছনে ফেলে টোকিও এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে ওরা।

বিমানবন্দরের নিষিদ্ধ এলাকায় ল্যান্ড করল কপ্টার। বাইরে বেরিয়েই হন হন করে এগোল ওরা। ওদের জন্য একটা জেট প্লেন রেডি রাখা হয়েছে। দূর থেকেই দেখা গেল, ওটার গায়ে ডক্টর আশামুশির নাম লেখা রয়েছে। ওটা তাঁর ব্যক্তিগত প্লেন।

নীরব দুই দেহরক্ষী প্রথমে ঢুকল প্লেনে, তারপর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ইঙ্গিত পেয়ে উর্বশী ও রানা।

আকাশে ওঠার পর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রওনা হলো প্লেন।

হনসু এলাকার খেতগুলোর উপর দিয়ে ছুটছে ওরা। ওসাকা শহরটাকে পাশ কাটিয়ে এল, যাচ্ছে ইনল্যান্ড সি-র দিকে। দূর থেকেই দেখা গেল বিশাল জলাশয়ে গিজগিজ করছে অসংখ্য ফ্রেইটার আর ফিশিং বোট।

ওদের প্লেনের তলা দিয়ে দ্রুত পিছিয়ে গেল ছোট একটা দ্বীপ, শিকোকু। খানিক পর আরাও শহরে, আরিয়াকেনো-উমির তীরে, রাইজিং সান রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজের এয়ারফিল্ডে পৌঁছে গেল ওরা।

এখানে ওদের জন্য আরেকটা হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে। সাগরের উপর দিয়ে অন্য একটা ছোট দ্বীপে চলে এল ওরা। জেটিতে কয়েকশো বোট ভাসছে। বিল্ডিংগুলো একতলা কি দোতলা, তার বেশি নয়। সাগরের পানিতে অসংখ্য ভাসমান র‍্যাক দেখল রানা, গাছের চারা বড় করা হচ্ছে।

হেলিপ্যাডে সাদা কোট পরা কয়েকজন বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ান অপেক্ষা করছেন, একজন দাঁড়িয়ে আছেন বাকি সবার চেয়ে একটু সামনে। তাঁদের সবাইকে উত্তেজিত, নার্ভাস ও উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো রানার।

কপ্টার থেকে প্রথমে নামল দেহরক্ষীরা, তাদের পিছু নিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

সামনে দাঁড়ানো সাদা কোট পরা বিজ্ঞানী আরও এক পা এগোলেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর আশামুশির উদ্দেশে মাথা নত করলেন তাড়াহুড়ো করে, তারপর জাপানি ভাষায় মুখে খই ফোটাতে শুরু করলেন। যে-কোনও কারণেই হোক, ভয়ানক অস্থির বোধ করছেন তিনি। এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা বললেন ভদ্রলোক, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের জুতোর দিকে চোখ রেখে।

প্রথমে রানা ও উর্বশীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন আশামুশি রিসার্চ ডিরেক্টর ডক্টর টয়োমার সঙ্গে, তারপর সরাসরি কাজের কথা পাড়লেন। 'শুনতে পাচ্ছি গত বছর এখানে খুব বড় একটা

সমস্যা হয়েছিল, অথচ আমাকে ব্যাপারটা জানানো হয়নি—কেন, প্রফেসর টয়োমা?' শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন তিনি।

রিসার্চ ডিরেক্টরকে ইতস্তত করতে দেখল রানা। আবার একবার মাথা নত করলেন তিনি; এখনও ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে তাকাচ্ছেন না। 'এখানে এমন কোনও সমস্যা কখনোই হয়নি যেটার কথা আপনি জানেন না, ডক্টর আশামুশি, সার।'

রানার দিকে ফিরলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 'মিস্টার রানা। মিস দাসা।'

রানা নয়, নিজের কেস নিয়ে উর্বশীই এগিয়ে গেল। কেসটা খুলল ও, ভিতর থেকে গ্লাস কন্টেইনার বের করে উঁচু করে দেখাল সবাইকে।

'না! না! না-আ-আ-আ-আ!'

আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে রিসার্চ ডিরেক্টরের পিছনে দাঁড়ানো সাদা কোট পরা বিজ্ঞানীদের গলা থেকে। তাঁদের সেই আতংকিত চিৎকার ছোট দ্বীপটার চারদিক থেকে প্রতিধ্বনি তুলল।

আগে থেকেই কী কারণে যেন সন্ত্রস্ত হয়ে ছিলেন, এখন ভয়ে রীতিমত ঠক-ঠক করে কাঁপছেন রিসার্চ ডিরেক্টর।

'না! অসম্ভব! না!' বিড় বিড় করছেন রিসার্চ ডিরেক্টর মিশাকা টয়োমা, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখছেন গ্লাসের ভিতর মোচড় খাওয়া বন্দি সর্পলতার নমুনাগুলো।

তাঁর পিছনে দাঁড়ানো বিজ্ঞানীরাও ভয়ে ফিসফিস করছেন, বিস্ফারিত চোখে দেখছেন গ্লাস কন্টেইনারে ভরা রহস্যময় লতাপাতার অবিশ্বাস্য আচরণ। বোঝাই যাচ্ছে এই সবুজ সর্পলতা তাঁদের অত্যন্ত পরিচিত।

'আপনারা সবাই এই জিনিস আগে দেখেছেন,' বলল রানা।

'কী সম্ভব নয়, প্রফেসর টয়োমা?' জেরা করবার সুরে জানতে চাইলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 'আমার কাছে কিছু একটা গোপন

করেছেন আপনি, কী সেটা?'

এমন কাঁপছেন রিসার্চ ডিরেক্টর প্রফেসর টয়োমা, দুজনের কারও কথাই বোধহয় শুনতে পেলেন না। কন্টেইনারের উপর চোখ রেখে কথা বলছেন, যেন কোনও ভূতের সঙ্গে। 'সব ধ্বংস হয়ে গেছে, কিছুই অবশিষ্ট নেই। এ স্রেফ সম্ভব নয়। ধ্বংস হয়ে গেছে, আর নেই। ফিরে আসবার কোনও উপায়ই রাখা হয়নি। না...

'কে ধ্বংস করেছিল চারাটা?' জানতে চাইল রানা।

'সেটা আপনারা পানই বা কোত্থেকে?' উর্বশীর প্রশ্ন।

'কী চেপে রাখছেন, প্রফেসর টয়োমা?' গর্জে উঠলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 'আপনারা সবাই ব্যাপারটা গোপন করে গেছেন আমার কাছ থেকে। আমি কি ধরে নেব, এটা একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র?'

রানার কানে বাজল, ডক্টর ওকিনাওয়া আশামুশির গর্জনের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন সামান্য একটু কৃত্রিম, বেসুরো সুর।

রিসার্চ ডিরেক্টর টয়োমা এখনও কাঁপছেন, এখনও তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে তাকাচ্ছেন না। তাঁর পিছন থেকে বিজ্ঞানীদের একজন সামনে এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের বয়স বাকি সবার চেয়ে কম, চেহারায় দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের কোনও অভাব নেই; ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে শ্রদ্ধা করলেও, ভয় পান না।

'আমাদের আর কিছু করার ছিল না, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সার,' বললেন তিনি। 'প্রাইম মিনিস্টার স্বয়ং আমাদেরকে গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্যে শপথ করিয়েছিলেন—জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে।'

'কী? প্রাইম মিনিস্টার?' ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে হতচকিত দেখাচ্ছে।

'ব্যাপারটার মধ্যে সরকার জড়াল কীভাবে?' জানতে চাইল রানা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর হঠাৎ রেগে গেলেন। 'আপনারা সরকারকে রিপোর্ট করলেন, অথচ আমাকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করলেন না?'

'আসলে,' তরুণ বিজ্ঞানী বললেন, 'বিপদটা আমাদের আগেই সরকার টের পেয়ে গিয়েছিল।'

এতক্ষণে বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে উঠে রিসার্চ ডিরেক্টর তরুণ বিজ্ঞানীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন। 'আমাদের সবারই বোধহয় এখন কনফারেন্স রুমে যাওয়া দরকার, ডক্টর আশামুশি। আপনাকে আমি পুরো ব্যাপারটা খুলে বলব।' নিজের জুতোর দিকে চোখ রেখে কথা বলছেন তিনি।

'তবু ভাল যে এতক্ষণে আপনার বোধোদয় হয়েছে, প্রফেসর টয়োমা,' বেসুরো গলায় বললেন ডক্টর আশামুশি, বুঝতে অসবিধে হলো না বহু কষ্টে রাগের লাগাম টেনে রেখেছেন।

গ্লাস কন্টেইনারটা কেসে ভরল উর্বশী, তারপর সবার পিছু নিয়ে রিসার্চ কমপ্লেক্স-এর মেইন বিল্ডিঙে চলে এল।

পথ দেখিয়ে ওদেরকে পশ্চিমা ধাঁচের কনফারেন্স রুমে নিয়ে এলেন ডক্টর টয়োমা। ওঁদেরকে দেখামাত্র কিমোনো পরা তরুণীরা ছোট আকৃতির কাপে চা পরিবেশন শুরু করল। কথা বলবার সময় একদৃষ্টে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডক্টর টয়োমা।

'এক বছর আগেও এই চারার আদি পাঁচটা জাত নিয়ে কাজ করছিলাম আমরা। সি ফুডের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল উৎস ছিল ওগুলো। প্রচুর পুষ্টিগুণ আছে এমন চারার মধ্যে ওগুলোর ছিল সবচেয়ে ভাল রেট-অব-গ্রোথ। কাজেই আমেরিকান নাসা যখন বলল, আমাদের কেউ তাদের স্পেস শাটল ট্রিপ-এ অংশগ্রহণ করতে রাজি কি না–ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সার, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে–আমরা আপনার সহকারী ডক্টর নিশিকাওয়া ফাকুদাকে এই চারাগুলো দিয়ে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিই। ওগুলোকে মহাশূন্যে পাঠাবার উদ্দেশ্য ছিল ওগুলোর ওপর আউটার স্পেসের নানামুখি

রেডিয়েশন-এর প্রভাব পরিমাপ করা।'

'কই, আমার তো কিছু মনে পড়ছে না,' ম্যানেজিং ডিরেক্টর বললেন। 'তবে তাতে কিছু এসে যায় না। আপনি প্রসঙ্গে থাকুন, প্রফেসর টয়োমা।'

'জী!' মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর টয়োমা।

'আর দয়া করে কথা বলার সময় মাঝে-মধ্যে আমার মুখের দিকে তাকান,' আবার বললেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 'আমি বাঘ-ভাল্লুক নই যে এতগুলো মানুষের সামনে আপনাকে খেয়ে ফেলব।'

বড় করে শ্বাস টেনে বাতাসে বুক ভরে নিলেন রিসার্চ ডিরেক্টর। 'চারার নমুনা ও বীজ স্পেস এক্সপেরিমেন্টের শেষে এখানে ফিরে এল। আমরা ওগুলোকে অবজারভেশনে রাখলাম, নতুন চারা জন্মানোর প্রক্রিয়াও শুরু হতে যাচ্ছে এখানে।' দৃষ্টি তুলে ডক্টর আশামুশির দিকে তাকালেন তিনি, চোখ দুটো যেন ভূতে পাওয়া কোনও মানুষের।

'প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা পার্থক্য লক্ষ করলাম আমরা,' আবার শুরু করলেন প্রফেসর টয়োমা। 'পাঁচ রকম চারারই আকৃতি ও চেহারা বদলে গেছে। মহাশূন্য থেকে ঘুরে আসা বীজ থেকে তৈরি চারাও ওই পরিবর্তিত আকৃতি আর চেহারা পাচ্ছে, বেড়ে ওঠার গতি এককথায় অবিশ্বাস্য। এরকম কিছু আগে কখনও দেখিনি আমরা। ওগুলো এত দ্রুত বাড়তে লাগল, আপনি খালি চোখেই দেখতে পাবেন।

'উল্লাস বোধ করি আমরা। পরিবর্তিত চারাগুলো সাগরের পানিতে ডোবানো বড় ট্যাংকে সরিয়ে ফেলি। ওখানেও অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকল ওগুলো!' পালা করে সবার দিকে একবার তাকালেন প্রফেসর টয়োমা। 'তারপর ব্যাপারটা ঘটল। রূপান্তরিত ওই চারার নমুনা নিয়ে গ্লাভ বক্সে, সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পরিবেশে কাজ করছিলাম আমরা. প্রত্যেকে অ্যান্টিসেপটিক গ্লাভ

ব্যবহার করছিলাম, মাথায় হুড পরা ছিল। নমুনা পরীক্ষা করার সময় এটাই নিয়ম। কাজেই সাগরের তলায় রাখা খোলা ট্যাংকে পরিবর্তিত চারা ট্র্যান্সফার করার সময়ই প্রথম ওগুলো পৃথিবীর অ্যাটমস্ফিয়ারে এক্সপোজড্ হয়।'

রিসার্চ ডিরেক্টরকে আতংকিত দেখাচ্ছে। 'মাছের মড়ক শুরু হলো। ট্যাংকের কাছাকাছি ভেসে থাকতে দেখলাম ওগুলোকে। তারপর ট্যাংকে যারা চারা ট্র্যান্সফার করেছিল তাদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়ল, মারা গেল একদিন পর। এত বাড় বাড়ল ওগুলো, ট্যাংক থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল চারাগুলো। সব কিছু খুব দ্রুত ঘটল—রাতারাতি। প্রথমে ডিফেন্স ফোর্স-এর পেট্রল বোট মরা মাছ দেখতে পেয়ে সতর্ক করল আমাদের। নতুন চারার কথা শুনে আর দেরি করেনি তারা, সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করল টোকিওকে। খবরটা প্রাইম মিনিস্টারের কানেও উঠল। শোনা মাত্র আদেশ দিলেন তিনি, এই মুহূর্তে সমস্ত চারা ধ্বংস করে ফেলতে হবে—পাঁচ রকমই। বললেন, সবাইকে নিষেধ করে দেয়া হোক, কেউ যেন এ বিষয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ না করে।'

'আপনার বসদের কাউকে কিছু না জানিয়ে?' প্রশ্ন করলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 'তাঁর তো সে অধিকার নেই!'

'প্রাইম মিনিস্টার বললেন, এরকম আদেশ দেয়ার অধিকার তাঁর আছে, সার। তিনি যুক্তি দেখালেন, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয়ানক আতংক ছড়াবে। তা ছাড়া, জাপান সাগরও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বিদেশী জাহাজ বন্দরে ভিড়বে না। কাজেই আমরা মুখ বুজে থাকি।'

'পাঁচ রকম চারাই ধ্বংস করা হয়?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনাদের সামনে?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে একটা ঢোক গিললেন রিসার্চ ডিরেক্টর প্রফেসর টয়োমা। 'জী,' মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'পাঁচ রকম চারাই ধ্বংস করা হয়। হ্যাঁ আমাদের সামনেই।'

পরিষ্কার ধরতে পারল রানা, প্রফেসর টয়োমা সত্যি কথা বলছেন না। কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে থাকল ও।

'এক্সপেরিমেন্টের রেকর্ডগুলো একবার দেখতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়লেন ডক্টর টয়োমা। 'সব রেকর্ড নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।'

কনফারেন্স রুমে দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল। শুধু হালকা স্যান্ডেল পরা পায়ের মৃদু শব্দ হচ্ছে, ছোট ছোট কেক পরিবেশন করছে কিমোনো পরা তরুণীরা। অবশেষে নীরবতা ভাঙল রানা।

'তা হলে এই চারাটা এল কোত্থেকে?' জানতে চাইল ও। 'একই নমুনা নিয়ে অন্য কেউ কি কাজ করছিলেন?'

'না, ওটা রাইজিং সানের একার ডেভেলাপ করা হাইব্রিড ছিল। এই জিনিস আর কেউ মহাশূন্যে পাঠায়নি। এ-সব ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকে নাসা–কেউ যাতে কোনও এক্সপেরিমেন্ট ডুপ্লিকেট করতে না পারে।'

'কিন্তু কেউ নিশ্চয়ই আপনাদের কাজ ডুপ্লিকেট করছিল,' বলল উর্বশী। 'হয়তো রাইজিং সানের ভেতরই অন্য একটা রিসার্চ সেকশন, ডক্টর আশামুশি, সার?'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাথা নাড়লেন। 'সেটা ইকোনমিকাল হবে না, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার। সাগর আর সাগরের তলা নিয়ে আমাদের সব গবেষণা এখানেই হয়।'

'এমন কেউ থাকতে পারেন,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'এক সেট রেকর্ড হয়তো রেখে দেয়ার সুযোগ ছিল তাঁর? কিংবা ভুলবশত রেখে দিয়েছেন?'

'না,' মাথা নেড়ে বললেন প্রফেসর টয়োমা। 'তেমন সুযোগ কারও ছিল না।'

'এমন কেউ ছিলেন কি, এই প্রজেক্টে আপনাদের সবার চেয়ে বেশি কাজ করেছেন?' জানতে চাইল রানা।

এবার জাপানি গবেষকদের মধ্যে নীরবতা নেমে এল। একসময় মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর টয়োমা। 'হ্যাঁ। ডক্টর নিশিকাওয়া ফাকুদা। গোটা প্রজেক্ট সুপারভাইজ করেন তিনি। ওই চারা তিনিই তো সঙ্গে করে মহাশূন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু না, তাঁর পক্ষেও প্রজেক্টের কোনও রেকর্ড রেখে দেয়া বা কাউকে কিছু জানানো সম্ভব ছিল না।'

চট করে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে একবার দেখে নিল রানা। ভাবছে, ঘুরেফিরে আবার তাঁর সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট নিশিকাওয়া ফাকুদার প্রসঙ্গ এসে গেল। তবে ডক্টর আশামুশির চেহারায় সহানুভূতি আর বিষাদের ছায়া ছাড়া অন্য কিছু নেই।

'কেন?' প্রফেসর টয়োমাকে প্রশ্ন করল রানা।'

'কারণ, মিস্টার রানা, মারাত্মক সমস্ত চারা নিঃশেষে ধ্বংস করার পর মর্মান্তিক একটা দুর্ঘটনায় মারা যান ডক্টর ফাকুদা।'

রানার শিরদাঁড়ার কাছটা শিরশির করে উঠল। 'দুর্ঘটনা?'

'কী ধরনের দুর্ঘটনা, ডক্টর টয়োমা?' প্রশ্ন করল উর্বশীও।

দুজনের সুরেই প্রবল সন্দেহ। ওদের পেশায় কাকতালীয় ব্যাপার খুব কমই ঘটে।

'ও, বুঝেছি কী ভাবছেন আপনারা,' বললেন ডক্টর টয়োমা। 'তবে না, ব্যাপারটায় সন্দেহ করার কোনও সুযোগ ছিল না। একটা লঞ্চে ছিলেন ডক্টর ফাকুদা, শেলফিশের একটা কলোনি খুঁজছিলেন। ওই জাতের শেলফিশ এতটা উত্তরে পাওয়ার কথা নয়, তাই রিপোর্ট পাওয়ামাত্র লঞ্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি। পানির নীচে কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায় ওটা। ফাকুদা নিশ্চয়ই মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। এক হপ্তা পর এখান থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল উত্তরে তাঁর লাশ পাওয়া যায়। বিরাট একটা ক্ষত ছিল মাথায়। খুবই দুঃখজনক। বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ভদ্রলোক।'

'আপনারা নিশ্চিত হন, ওই লাশ ডক্টর ফাকুদারই ছিল?'

জিজ্ঞেস করল রানা।

'অবশ্যই। আমরা সবাই তাঁকে সনাক্ত করি। মাথার ওই ক্ষতটাই আঘাতের একমাত্র চিহ্ন ছিল। তাঁর পরিবারের দুজন সদস্যও লাশ সনাক্ত করেন।'

'তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই ডক্টর ফাকুদার স্ত্রী মিসেস সুসমি ফাকুদা ছিলেন না?' জানতে চাইল রানা, আড়চোখে ডক্টর আশামুশির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে। 'কিংবা ওঁদের একমাত্র সন্তান ইমুনু?'

উদাস দৃষ্টিতে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর, চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই এই মুহূর্তে বাস্তব দুনিয়ায় তিনি আছেন কি না।

'না, দুঃখিত,' বললেন ডক্টর টয়োমা। 'মিসেস ফাকুদা কী করে স্বামীর লাশ সনাক্ত করবেন...'

'ও, হ্যাঁ,' তাঁকে বাধা দিয়ে বলল রানা, তাকিয়ে রয়েছে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে। 'শুনেছি, পাগলা গারদে আটকে রাখা হয়েছে ওঁকে।'

সিলিং থেকে চোখ নামিয়ে রানার দিকে তাকালেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। কিছুই বললেন না, ধীরে ধীরে একবার শুধু মাথাটা নাড়লেন, যেন বলতে চাইলেন অনধিকার চর্চা করছে রানা। তবে এটা ওর বোঝার ভুলও হতে পারে।

খুক করে কেশে নিয়ে প্রফেসর টয়োমা বললেন, 'এখানে আপনার একটু ভুল হচ্ছে, মিস্টার রানা। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তার আগেই স্যানাটোরিয়ামে মারা গেছেন মিসেস ফাকুদা। সাততলা বিল্ডিঙের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন তিনি।'

'ওহ্ গড!' মৃদু একটা ঝাঁকি খেল রানা। 'আত্মহত্যা, নাকি খুন?' তাকিয়ে আছে দীর্ঘদেহী ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে।

এবারও কিছু বললেন না তাক লাগানো আবিষ্কারক ডক্টর

আশামুশি। শুধু রানার চোখে চোখ রেখে ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে শক্ত করে সেঁটে রাখলেন, ওর ব্যাপারে যেন কঠিন কোনও সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করছেন। তবে তা না-ও হতে পারে, রানার হয়তো বুঝতে ভুল হচ্ছে।

'আর ছেলেটা তো এখনও শিশু, মাত্র সাত বছর বয়স, বোর্ডিং স্কুলে পড়ে। আত্মীয় দুজন ছিলেন ডক্টর ফাকুদার চাচা ও চাচী।'

'কেন, তাঁর মা-বাবা?'

'ওঁরা তো দু'বছর আগে থেকেই নিখোঁজ,' মাথা নিচু করে জবাব দিলেন প্রফেসর টয়োমা।

'ভীষণ, ভীষণ খটকা লাগছে আমার,' বলল উর্বশী। 'একা শুধু ডক্টর ফাকুদাকে ঘিরেই এত অমঙ্গলের ঘনঘটা কেন?'

সবাই চুপ করে থাকল।

এ প্রশ্নের উত্তর এঁদের কারও কাছ থেকে পাওয়া যাবে না, বুঝতে পারছে রানা। হাতের তালু দিয়ে চিবুক ডলছে ও। 'দুর্ঘটনার এক হপ্তা পর? মাছেরা সনাক্ত করার মত কিছু রেখেছিল?' মাথা নাড়ল ও। 'লাশটা যেখানে পাবেন বলে আশা করছিলেন, সেখানেই পাওয়া গিয়েছিল?'

মাথা ঝাঁকালেন রিসার্চ ডিরেক্টর। 'ডিফেন্স ফোর্স অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তদন্ত করে, ওঁদের মনেও সন্দেহ জেগেছিল।'

'নিজের কাজের কোনও রেকর্ড সঙ্গে করে নিয়ে যাননি তিনি?'

'না। সবই ধ্বংস করা হয়।'

'প্রতিটি নমুনা? প্রতিটি বীজ?' পুরানো প্রশ্নটাই আবার করছে রানা।

'হ্যাঁ, স-ব।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর উর্বশীর দিকে তাকাল। উর্বশী ওর দিকেই তাকিয়ে। তবে মুখ খুললেন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ইঙ্গিতে কন্টেইনারটা দেখালেন তিনি। 'তা হলে এই নমুনার অস্তিত্ব কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন আপনি, প্রফেসর টয়োমা?' ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইলেন ওকিনাওয়া আশামুশি।

মাথা নাড়লেন ডক্টর টয়োমা, হতাশায় প্রায় মুষড়ে পড়ার অবস্থা তাঁর। 'আমি জানি না, সার।'

'ওগুলো বিপজ্জনক, এটা আপনারা জানার আগেই হয়তো কিছু নমুনা চুরি হয়ে যায়? সম্ভবত আমেরিকায়? স্পেস শাটলে?' জানতে চাইলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন ডক্টর টয়োমা। 'না, সার। মহাশূন্যে পাঠাবার আগে প্রতিটি নমুনাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বোতলে ভরে নম্বর দেয়া হয়। শাটলে থাকার সময় একা শুধু ডক্টর ফাকুদার অধিকার ছিল ওগুলো নাড়াচাড়া করার। শাটল্ থেকে প্রতিটি নমুনা নম্বর অনুসারে ঠিকভাবেই ফিরে পাই আমরা।'

'ড্যাম ইট!' অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 'কন্টেইনারের এই নমুনা কোথাও থেকে তো এসেছে! আপনারা কি বলতে চাইছেন অন্য কোথাও এই একই এক্সপেরিমেন্ট ডুপ্লিকেট হচ্ছিল?'

'আমার কাছে কোনও জবাব নেই,' ধীরে ধীরে বললেন ডক্টর টয়োমা, সঙ্গী গবেষকদের দিকে তাকালেন। 'আমি কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ব্যাখ্যা একটা সব সময়ই থাকতে হবে,' বলল রানা, 'যতই অসম্ভব আর অপ্রত্যাশিত হোক না কেন। সেটা শুধু খুঁজে নিতে হয়। প্রাথমিক কাজগুলো যেখানে সেরেছেন, সেই ল্যাবরেটরিটা আমরা একবার দেখতে পারি? আর ডক্টর ফাকুদার ল্যাবটা?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললেন প্রফেসর টয়োমা। 'তবে একটা ল্যাবেই সব কাজ সারি আমরা। ডক্টর ফাকুদার নিজের ল্যাবে।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর আঁশামুশির দিকে তাকাল রানা। 'ল্যাবটা আমরা তৃতীয় কারও উপস্থিতি ছাড়াই সার্চ করতে চাই, সার। আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?'

কী কারণে বোঝা গেল না, রিসার্চ ডিরেক্টরের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। পরিষ্কার ধরা পড়ল রানার চোখে, টলে উঠলেন রিসার্চ ডিরেক্টর। গোটা ব্যাপারটা লক্ষ করে গবেষকদের কেউ কেউ অনেক কষ্টে ঢোক গিলল।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করছি না,' রানার দিকে ফিরে ভারী গলায় বললেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 'এমনিতেও এঁদের সঙ্গে বসতে হবে আমাকে, কথা বলতে হবে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে।'

উর্বশী আর রানাকে মেইন বিল্ডিং থেকে বের করে আনলেন ডক্টর টয়োমা। ছায়াঘেরা ছোট বাগান পার হয়ে ছোট আকারের একটা দালানে ঢুকল ওরা। ভিতরে একটাই মাত্র বড় কামরা, তার অর্ধেকটা কাঁচ দিয়ে ঘেরা ল্যাবরেটরি। জায়গাটা নির্জন, খালি পড়ে আছে।

'প্রাইম মিনিস্টার বলেছিলেন, বছর কয়েক ল্যাবটা যেন বন্ধ রাখা হয়,' বললেন ডক্টর টয়োমা। 'তা ছাড়া, কেউ এখানে কাজ করতে আগ্রহও দেখায় না। একমাত্র ম্যানেজিং ডিরেক্টরই এ-ধরনের কুসংস্কার দূর করতে পারেন।'

'আপনাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে গুরুতর একটা অভিযোগ আছে,' ভদ্রলোককে একা পেয়ে প্রসঙ্গটা তুলল রানা। 'ডক্টর ফাকুদার সমস্ত আবিষ্কার নিজের বলে চালানোর অভিযোগ। এ-ব্যাপারে আপনার মতামত কী?'

'ন্-না! ন্-না!' তোতলাতে শুরু করলেন ডক্টর টয়োমা। চেষ্টা করছেন চেহারায় যাতে ভয়ের ছাপ না ফোটে। 'আমার আবার মতামত কী! আমি কী জানি!'

'কাউকে যদি ভয় পান, আমাদেরকে বলতে পারেন,' অভয়

দিয়ে বলল রানা। 'আমরা আপনার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব।'

'কী আশ্চর্য! কেন কাউকে ভয় পেতে যাব আমি?' অহেতুক গলা চড়াচ্ছেন ডক্টর টয়োমা।

প্রসঙ্গ বদলে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ল্যাবটা ঠিক যেভাবে ডক্টর ফাকুদা রেখে গেছেন সেভাবেই আছে, তিনি মারা যাবার পর কেউ এখানে আসেনি?'

'না, ঠিক তা নয়। তিনি মারা যাবার পর ডিফেন্স ট্রুপ এসে সার্চ করে ল্যাব, যা কিছু পায় সব ধ্বংস করে ফেলে।'

উর্বশী আর রানা ধন্যবাদ জানাল ডক্টর টয়োমাকে। চেহারায় উদ্বেগ আর অসন্তোষ নিয়ে বিদায় নিলেন তিনি।

'বেশি কিছু আশা করছি না,' বলল উর্বশী।

'না।' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা। 'তবু একবার দেখি এসো। তবে তার আগে অন্য একটা প্রসঙ্গ, উর্বশী।'

'অন্য প্রসঙ্গ?'

কয়েক মুহূর্তের জন্য দু'বছর আগে ফিরে গেল রানা, সিয়াটল ভার্সিটির সেমিনারে যা ঘটেছিল তার সার-সংক্ষেপ জানাল ও উর্বশীকে।

সব শুনে চিন্তিত হয়ে পড়ল উর্বশী। বলল, 'তার মানে, কোনও প্রমাণ না থাকলেও, এই জগদ্বিখ্যাত ভদ্রলোককে আমরা সন্দেহের বাইরে রাখতে পারছি না?'

'না।'

'তোমার ধারণা ডক্টর ফাকুদাকে খুন করা হয়েছে?' জানতে চাইল উর্বশী।

'আপাতত তাই ধরে নিতে হবে,' বলল রানা।

'একটা পরিবারের দুজন নিখোঁজ হয়ে গেলেন, একজন পাগল হবার পর আত্মহত্যা করলেন, একজন লঞ্চ দুর্ঘটনায় মারা গেলেন– বিশ্বাস হয় না।'

সার্চ করল ওরা। কিছুই পাওয়া গেল না।

'ডিফেন্স ট্রুপস ধুলো পর্যন্ত রেখে যায়নি,' মন্তব্য করল রানা।

'না,' বলল উর্বশী, বড়সড় একটা নটিকাল চার্টের দিকে তাকিয়ে আছে। চার্টটা টাঙানো রয়েছে ডক্টর ফাকুদার ল্যাবে, ডেস্কের ঠিক উপরের দেয়ালে। ওটার চারদিকের দেয়ালে বেশ কয়েকটা ফটোগ্রাফও সাঁটা রয়েছে। ওগুলোয় দেখা যাচ্ছে মাঝারি আকৃতির একটা সেইলবোট চালাচ্ছেন দুজন হাসি-খুশি ভদ্রলোক, তাঁদের একজন ডক্টর ফাকুদা।

উর্বশীর দৃষ্টি অনুসরণ করে রানাও দেখল চার্টটা। ওর জানা আছে এ-ধরনের চার্ট সাধারণত ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়ে-তে সেইল করবার সময় ইয়টম্যানরা ব্যবহার করে।

'আরিয়াকেনো-উমির চার্ট,' বলল উর্বশী। 'পানির কোথায় কী আছে সব এতে দেখানো হয়েছে। সেইলিং-এর নেশা আমারও একটু-আধটু আছে, তাই জানি, এ-ধরনের চার্ট খুব কাজে লাগে। কারণ গোটা এলাকার প্রতিটি রিফ, প্রতিটি ডুবো পাথর দেখানো থাকে এতে।'

'ফটোগুলো বলছে ডক্টর ফাকুদা অভিজ্ঞ নাবিক ছিলেন,' বলল রানা। 'এদিকের পানিতে ঘোরাফেরাও করেছেন তিনি। পানির কোথায় কী আছে সবই তাঁর জানা ছিল।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল উর্বশী। 'তা হলে কী লাগল ওঁর মাথায়? কেন লাগল?'

'মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন।'

'চলো, ওঁর চাচা-চাচীর সঙ্গে কথা বলি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। উর্বশীকে নিয়ে ল্যাব বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল ও, গাছপালার ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ ধরে কনফারেন্স রুমে ফিরছে। দূর থেকেই ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যের মারাত্মক অভাব থাকায় কড়া ভাষায় তিরস্কার করছেন উপস্থিত বিজ্ঞানীদের। ভাবা যায় না, তিনি এতটা কঠোর ভাষা ব্যবহার

করতে পারেন। তথ্য গোপন করায় খুবই রেগে গেছেন তিনি।

উর্বশী আর রানাকে কনফারেন্স রুমে ঢুকতে দেখে একসঙ্গে তিনটে জিনিস বদলে ফেললেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর–ভাষা, কণ্ঠস্বর আর মুখের ভাব।

বাঘের মুখে হঠাৎ যেন কোকিলের বুলি, গর্জন ভুলে ছাগলের ডাক ধরল সিংহ, আর সোনালি অবয়ব থেকে মুছে গেল সবটুকু হিংস্রতা।

গবেষকদের দ্রুত বিদায় করে দিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তবে জানাতে ভুললেন না যে দিন কয়েক এখানে থাকবেন তিনি, তাঁদের সমস্ত কাজ ও আচরণ খুঁটিয়ে লক্ষ করবেন।

'আরে, আপনারা ফিরে এসেছেন! বেশ, বেশ! মিশন সফল?' অমায়িক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মুখ।

'না,' শ্রাগ করে বলল উর্বশী।

'তবে জানা গেছে ডক্টর ফাকুদা এদিকের পানিতে ঘোরাফেরা করতেন,' বলল রানা। 'চার্টে তো ছিলই, ওঁর মাথাতেও ছিল পানির নীচে কোথায় কী আছে। লঞ্চটা তা হলে কেন কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খাবে? এমন প্রচণ্ড ধাক্কা যে মাথায় আঘাত পেয়ে পানিতে পড়ে গেলেন তিনি? ব্যাপারটা বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।'

'তা হলে?' ভারী গলায় প্রশ্ন করলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

'ডক্টর ফাকুদার চাচা-চাচীর সঙ্গে কোথায় আমরা দেখা করব?'

ঝট্ করে ঘুরলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 'প্রফেসর টয়োমা!'

কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন রিসার্চ ডিরেক্টর, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের গর্জন শুনে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এলেন টেবিলের কাছে। 'ইয়েস, সার?'

'আমি আপনাকে গুলি করব, না ফাঁসি দেব?' জিজ্ঞেস করলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 'এভাবে ঠকঠক করে কাঁপছেন কেন?'

'ও কিছু না, সার,' তাড়াতাড়ি বললেন প্রফেসর টয়োমা, দৃষ্টি নামিয়ে রেখেছেন, যাতে চোখাচোখি না হয়। 'হঠাৎ আমার জ্বর এসেছে।'

'অ,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তারপর জানতে চাইলেন, 'ডক্টর ফাকুদার চাচা-চাচী কোথায় থাকেন জানেন আপনি?'

'ওরা আরাও-এ থাকে, সার।'

'মিস্টার রানা আর মিস দাসাকে ওঁদের কাছে নিয়ে যান,' নির্দেশের সুরে বললেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

'জী, সার। ফোনে এখনই সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।' কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর টয়োমা।

উর্বশী আর রানার দিকে ফিরে যতদূর সম্ভব মাথাটা নোয়ালেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর আশামুশি। 'ফিরে এসে দেখবেন গেস্ট হাউসে আপনাদের জন্যে রুম খুলে দেয়া হয়েছে,' বললেন তিনি। 'আমাদের অতিথি হিসেবে যতদিন খুশি এখানে থাকতে পারবেন আপনারা।'

একটু পরেই ফিরে এসে রিপোর্ট করলেন প্রফেসর টয়োমা, ডক্টর ফাকুদার চাচা-চাচী সাক্ষাতের জন্য সময় দিতে রাজি হয়েছেন।

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। রানা লক্ষ করল, সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর টয়োমার চেহারায় রঙ ফিরে এল। সম্পূর্ণ অন্য একজন মানুষে পরিণত হলেন তিনি—সপ্রতিভ, আত্মবিশ্বাসী, দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন।

'ডকে বোট রেডি, এখন আপনারা রেডি হলেই আমরা রওনা দিতে পারি।'

প্রফেসর টয়োমার পিছু নিয়ে ডকে ফিরে এল ওরা, তারপর ওঁদের একটা বোটে চড়ে আরিয়াকেনো-উমির উপর দিয়ে এগোল। ছোট

একটা দ্বীপে ছোট্ট একটা গ্রাম। দ্বীপে নেমে ওদেরকে খানিকটা হাঁটিয়ে একটা হোন্ডা সিডান-এর কাছে নিয়ে এলেন প্রফেসর টয়োমা।

ড্রাইভিং সিটে বসলেন প্রফেসর। তাঁর পাশে রানা। ব্যাক সিটে উর্বশী।

কয়েক মাইল ছুটল গাড়ি। হঠাৎ রানা বলল, 'গাড়িটা রাস্তার ধারে একবার থামান প্লিজ, প্রফেসর টয়োমা।'

বিস্মিত হলেও, কোনও প্রশ্ন না করে গাড়ি থামালেন ভদ্রলোক, তারপর জানতে চাইলেন, 'ইয়েস? কোনও সমস্যা?'

'হ্যাঁ সমস্যা, বলল রানা। 'তবে সেটা আমাদের নয়, আপনার'।

'জী?' রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন প্রফেসর টয়োমা।

'রিসার্চ সেন্টারে আপনার আচরণ ডক্টর আশামুশিকে ভয়ানক অসন্তুষ্ট করেছে,' বলল রানা। 'আমাদের মনে হয়েছে, তিনি আপনাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর প্রফেসর বললেন, 'আমি নিয়তির ওপর বিশ্বাসী, মিস্টার রানা। কপালে যদি থাকে তো ভোগ করব শাস্তি।'

'চেষ্টা করলে নিয়তি বদলানো যায়,' নরম সুরে বলল রানা। 'আপনি যদি মুখ খুলতে চান, এটাই সবচেয়ে ভাল সময়, প্রফেসর টয়োমা।'

'ফ্যামিলিতে কেউ না থাকলে আত্মহত্যা করাটা সহজ, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ডক্টর টয়োমা। 'কিন্তু আমার সংসারে আমি একা নই।'

'আমরা আপনার ফ্যামিলিকেও প্রোটেকশন দেব,' ব্যাক সিট থেকে আশ্বাস দিল উর্বশী।

'বলছেন প্রোটেকশন দেবেন, কিন্তু কীভাবে? আপনাদের ধারণা আছে, কার বিরুদ্ধে মখ খুলতে হবে আমাকে?'

'তার বুঝি অনেক শক্তি?' জানতে চাইল উর্বশী।

'নানা বিষয়ে গবেষণা করার জন্যে দেশী-বিদেশী অনেক প্রতিষ্ঠান তাকে প্রতি বছর গোপনে মোটা টাকা দেয়,' বললেন প্রফেসর টয়োমা। 'সাগরের তলায় কী করছেন না করছেন কাউকে কিছু না জানালেও, তাদেরকে ঠিকই জানায় সে। রাজপরিবারে তার অবাধ আসা-যাওয়া। মন্ত্রীরা তার বন্ধু। পুলিশ, মিলিটারি সব তার হাতে। নুমা তার বিরুদ্ধে কী করতে পারবে, বলুন?'

'অশুভ, ক্ষতিকর একটা কাজে সবাই তাকে সাহায্য করছে, এটা সম্ভব নয়, প্রফেসর টয়োমা,' বলল রানা। 'প্রয়োজনে আমরা প্রাইম মিনিস্টার আর ইন্টারপোলকে সব কথা জানিয়ে সাহায্য চাইব।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে প্রফেসর টয়োমা বললেন, 'একটা ভেড়াকে আপনারা বাঘ হতে বলছেন। সাহস সঞ্চয়ের জন্যে দয়া করে খানিকটা সময় দিন তাকে।'

'বেশ,' বলল রানা। 'তবে অন্তত একটা প্রশ্নের জবাব দিন আমাকে। সত্যি কি পাঁচ রকম চারাই ধ্বংস করা হয়েছিল?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে প্রফেসর টয়োমা বললেন, 'না। আমরা শুধু চার রকম চারা ধ্বংস করার সুযোগ পাই। পাঁচ নম্বর নমুনা চুরি হয়ে যায়।'

'আমার ধারণা আপনি অন্তত জানেন কে সেটা চুরি করেছিল,' বলল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রফেসরকে দেখছে।

'জানি,' বললেন প্রফেসর টয়োমা। 'তবে এখনই তার নামটা আমি মুখে আনতে চাইছি না। তবে আপনারা যাকে সন্দেহ করছেন, সে-ই।'

'ওহ্ গড!' উর্বশী ও রানা একযোগে বলল।

'কিন্তু...' শুরু করল রানা।

ওকে থামিয়ে দিয়ে প্রফেসর টয়োমা বললেন, 'পাপ করলে

ভুগতে হবে না! শুনতে পাচ্ছি কাছেপিঠে কেউ না থাকলে সরাক্ষণ নিজের চুল ছিঁড়ছে সে।'

'মানে?' উর্বশী হতভম্ব। 'কেন?'

'কেন আবার, একে একে সব নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, তাই! সব কথা পরে জানাব,' বলে গাড়ি ছেড়ে দিলেন প্রফেসর টয়োমা।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'ফেরার পথে, কেমন?'

মাথা ঝাঁকালেন প্রফেসর।

'এটা ওঁদের লিজ নেয়া দ্বীপ, চোদ্দো-পুরুষের বসতভিটা নয়,' এক সময় বললেন তিনি, তারপর স্টিয়ারিং হুইল থেকে হাত তুলে দেখালেন। পাহাড়ের নীচে বেশ বড় একটা বাড়ি। চারদিকে ছোট-বড় অসংখ্য বোল্ডার দেখল ওরা। 'তবে যদি জিজ্ঞেস করেন এরকম একটা আস্ত দ্বীপ লিজ নেয়ার টাকা কোথায় পেলেন তাঁরা, কিংবা এত বিলাসিতার মধ্যে কীভাবে জীবন কাটান, আমি কোনও জবাব দিতে পারব না।'

উর্বশী আর রানা দৃষ্টি বিনিময় করল।

বাড়ির সামনে বিরাট উঠান, মজবুত একটা গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। গেটে দাঁড়িয়ে কলিং বেল বাজালেন প্রফেসর টয়োমা।

কিমোনো পরা বাটলার গেট খুলে দিল। উঠানে ঢুকল ওরা। চারদিকে সযত্নলালিত বাগান দেখল রানা। দামি দুটো গাড়ি রয়েছে উঠানের একপাশের খোলা গ্যারেজে। ডক্টর ফাকুদার চাচা-চাচী বেশ ধনী, ভাবল রানা। ওদের পিছনে বন্ধ হচ্ছে ভারী গেট, এই সময় বিনা মেঘে যেন বজ্রপাত হলো– কড়াৎ! কড়াৎ!

আওয়াজ শুনেই বুঝে নিল রানা, পাহাড়ের কোথাও পজিশন নিয়ে হাই ক্যালিবার রাইফেল থেকে গুলি করছে কোনও স্নাইপার।

ওর সামনে দাঁড়ানো প্রফেসর টয়োমার মাথাটা লাল টকটকে

রসালো তরমুজের মত বিস্ফোরিত হলো। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল তাঁর শরীর, তারপর সটান পড়ে গেল, অর্ধেকের বেশি উড়ে যাওয়া মাথার জখম থেকে গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে।

ঘুরে গেটের দিকে লাফ দিল রানা, জ্যাকেটের ভিতর হাত গলিয়ে পিস্তলটা বের করে আনছে।

ওর পিছু নিল উর্বশী, তার হাতেও বেরিয়ে এসেছে পিস্তল।

ষোলো

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসে গেটের আড়ালে গা ঢাকা দিল উর্বশী ও রানা। পাহাড়ের ঢালে চড়ে স্নাইপারকে ধরতে হলে বাড়ির পিছন দিকে যেতে হবে ওদেরকে। দুজন দু'দিক থেকে এগোবার সিদ্ধান্ত নিল ওরা।

বোল্ডারের কোনও অভাব নেই, সেগুলোর আড়াল নিয়ে দুজন প্রায় একই সঙ্গে বাড়িটার পিছনে পৌঁছাল। দুজনের কাঁধেই ব্যাগ আছে, বিনকিউলার বের করে বোল্ডারের আড়াল থেকে উঁকি দিল, তারপর যতদূর দেখা যায় চোখ বুলাল পাহাড়ী ঢালে।

গুলি হচ্ছে না। কাউকে কোথাও দেখাও যাচ্ছে না।

'পালিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল উর্বশী।

'সন্দেহ করছিলাম পালাবে,' বলল রানা। 'কারণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে গুলি করেনি।

'তা করেনি। কেন?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জানি না।'

'তোমার কথাই সত্যি হলো?' জিজ্ঞেস করল উর্বশী। 'নার্ভাস হয়ে পড়ার অপরাধে কঠিন শাস্তি পেলেন প্রফেসর টয়োমা?'

'বোধহয়।'

'ছোট দ্বীপ, আততায়ীরা পালাবে কোথায়?' বলল উর্বশী। 'চলো পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখি...

'কান পাতো, তুমিও শুনতে পাবে।'

রানার কথামত কান পাতল উর্বশী। অস্পষ্ট হলেও শুনতে পেল পাহাড়ের ওদিক থেকে একটা বোট-ইঞ্জিনের ভট ভট আওয়াজ ভেসে আসছে। 'ও, আচ্ছা, পাহাড়ের ওপাশেই সাগর। হ্যাঁ, লোকটা পালাচ্ছে।'

ফিরে এসে আবার বাড়িটার উঠানে ঢুকল ওরা। পানি আর হাড় ছাড়া কী আছে মানুষের মধ্যে, হঠাৎ প্রফেসর টয়োমাকে দেখে দার্শনিকসুলভ একটা চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়। এরইমধ্যে মাছির ঝাঁক ছেঁকে ধরেছে তাঁকে, সার বেঁধে ছুটে আসছে পিঁপড়ের দল, চোখে ধরা না পড়লেও শুরু হয়ে গেছে পচনক্রিয়া; শক্তি, সাহস, শয়তানি, মহত্ত্ব, পাপ, পুণ্য, দম্ভ, ভালমানুষি—কোনও কিছু দিয়েই ওগুলোকে ঠেকাবার ক্ষমতা নেই তাঁর।

মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভুবনে! এরচেয়ে বড় আকুতি আর হয় না। এরচেয়ে অসার প্রার্থনাও কি হয়?

কিমোনো পরা সেই বয়স্ক বাটলার ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল বাড়ির ভিতর। এরকম পরিস্থিতিতে তার স্বাভাবিক আচরণ দৃষ্টিকটু ও সন্দেহজনক। একজন মানুষ খুন হয়েছে, অথচ একটুও অবাক হয়নি সে।

ডক্টর ফাকুদার চাচা-চাচী ড্রইং রুমে ওদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁদের আচরণও ওদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হলো না।

কুশল বিনিময় না, বসতে বলা না, নরম সোফায় আরও একটু

ডুবে গিয়ে প্রৌঢ় ভদ্রলোক খনখনে গলায় বললেন, 'ওই লোক আর মরার জায়গা পেল না? এত থাকতে আমার বাড়ির উঠানে!'

আরেক সোফা থেকে প্রবীণ ভদ্রমহিলা বললেন, 'পচা দুর্গন্ধ ছড়াবার আগেই কেউ বাপু ওটাকে সরাবার ব্যবস্থা করুক!'

মুহূর্তেই রানা সিদ্ধান্ত নিল, এদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করবে না। 'আপনারাই ডক্টর ফাকুদার চাচা-চাচী? নাম কী?'

'হ্যাঁ, আমরাই,' জবাব দিলেন প্রৌঢ়। 'আমি হাসিকি ফাকুদা। উনি আমার স্ত্রী, নিশা ফাকুদা। কেন, সন্দেহ আছে নাকি?'

জবাব না দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'আপনারাই ডক্টর ফাকুদার লাশ সনাক্ত করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমরাই,' বললেন হাসিকি। 'কেন জানতে চাইছেন?'

এবারও জবাব না দিয়ে আবার প্রশ্ন করল রানা, 'আপনারা যে ওঁর আসল চাচা-চাচী, কর্তৃপক্ষ সেটা যাচাই করেছিল?'

'কী?' হাঁ হয়ে গেলেন হাসিকি, ঝট করে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। 'এই, শুনছ, বিদেশী এক লোক এ-সব কী বলছে?'

'আপনাদের ডিএনএ টেস্ট করে ডক্টর ফাকুদার ডিএনএ-র সঙ্গে মেলানো হয়েছিল?' আরও স্পষ্ট করে জানতে চাইল রানা।

নিশা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, এরা তো লোক ভাল মনে হচ্ছে না! নিশ্চয়ই ব্ল্যাকমেইল করতে এসেছে! ওগো, তাড়াতাড়ি পুলিশে খবর দাও না!

'তার দরকার হবে না,' কঠিন সুরে বলল রানা, ব্যাগ থেকে কয়েক প্রস্থ কর্ড বের করল। 'আমরা প্রাইভেট পুলিশ, আপনাদেরকে অ্যারেস্ট করছি।'

উর্বশীও নিজের ব্যাগ খুলে সেল ফোনটা বের করল। রিয়ার অ্যাডমিরাল পল মাইলামের নাম্বারে ডায়াল করছে ও।

'অ্যারেস্ট করছেন?' ঢোক গিললেন প্রৌঢ়, ভয়ে মুখ থেকে রক্ত নেমে গেছে। 'ডিএনএ টেস্ট না করেই?'

'ওটা পুলিশ হসপিটালে করা হবে,' বলল রানা।

'তারচেয়ে একটা রফা করলে হয় না?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কী রকম?'

সেল ফোনে পল মাইলামকে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে যাচ্ছিল উর্বশী, অপরপ্রান্ত থেকে মাঝপথে থামিয়ে দেওয়া হলো ওকে। কী শুনছে কে জানে, রানা শুধু আবছাভাবে লক্ষ করল ওর সঙ্গিনীর চোখ-মুখ দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে।

'নিজেদের অপরাধ স্বীকার করছি আমরা,' বলল প্রৌঢ় লোকটা। 'লাশটা আমাদের নিশিকাওয়া ফাকুদার কি না সত্যি আমরা বুঝতে পারিনি। সাতদিন সাগরে ভেসেছে, মাছেরা কিছু বাকি রাখে সেই লাশের! কিন্তু তারপরও সেটাকে নিশিকাওয়ার লাশ বলে সনাক্ত করি আমরা, নেহাতই অভাবের তাড়নায়।

'লোভ দেখিয়ে বলা হয় একটা লাশকে নিশিকাওয়া ফাকুদার লাশ বলে সনাক্ত করলে এই বাড়িতে বিনা পয়সায় থাকতে দেয়া হবে, ব্যবহারের জন্যে দেয়া হবে দুটো গাড়ি, আরও পাব পুরস্কার হিসেবে নগদ এক লাখ মার্কিন ডলার। টাকাটা ব্যাংকে আছে, এখনই চেক লিখে দিচ্ছি। আমাদেরকে ছেড়ে দিন, এলাকা ছেড়ে চলে যাব। জীবনে আর কখনও এরকম কাজ করব না।'

'ঠিক আছে, চেকটা আমি নেব,' বলল রানা।

আলমারি খুলে চেকবই বের করল লোকটা। তার স্ত্রী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

লোকটার বাড়ানো হাত থেকে চেক নিল রানা। 'ডক্টর ফাকুদার ছেলে পাবে এই টাকা,' একবার চোখ বুলিয়ে পকেটে রেখে দিল সেটা। 'উর্বশী, পুলিশ ডেকেছ?'

'আবার পুলিশ কেন!' হকচকিয়ে গেল প্রৌঢ় লোকটা। 'আপনার সঙ্গে আমার একটা রফা হলো না?'

'কীসের রফা?' ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'আমি শুধু বলেছি চেকটা নেব। এই টাকা তো আপনার নয়, কাজেই আপনার কাছে থাকবে কেন? উর্বশী?'

মাথা ঝাঁকাল উর্বশী, হতচকিত দেখাচ্ছে ওকে। 'হ্যাঁ, পুলিশ আসছে। তবে পৌঁছাতে একটু সময় নেবে ওরা। রানা, দুঃসংবাদ! ওরা বোট নিয়ে আসতে পারবে না!'

'মানে?'

'এদিকের পানিতেও আগাছা ছড়াতে শুরু করেছে...

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল রানা, তারপরই জানতে চাইল, 'এদিকের পানিতে মানে?'

'আরিয়াকেনো-উমি বে-তে,' একটা ঢোক গিলে বলল উর্বশী। 'উশি-শিমা সহ আশপাশের সবগুলো দ্বীপের চারপাশে।'

'আরাও-এর কাছে, যেখানে রাইজিং সানের আন্ডারওয়াটার ফার্মিং আছে?'

'হ্যাঁ!' মাথা ঝাঁকাল উর্বশী।

'কিন্তু আমরা তো ওদিক থেকেই এলাম, কই, তখন তো কিছু দেখিনি!'

'কাল রাতে জেলেরা নাকি দেখেছে একটা বেঢপ সাবমারসিবল থেকে ফ্লেয়ার ছোঁড়া হয়েছে আকাশে,' বলল উর্বশী। 'একজোড়া কপ্টার ওই ফ্লেয়ার দেখে সারারাত পানিতে সাদা পাউডার ছড়িয়েছে।'

'তার মানে...' চিন্তা করছে রানা, ...অ্যান্টিডোট ব্যবহার করা হয়েছে। আগাছা যাতে পানির নীচ থেকে সারফেসে উঠে না আসে।' হঠাৎ ওর হাতে পিস্তল বেরিয়ে এল, তাক করল প্রৌঢ় লোকটার দিকে।

'তাতে হয়তো সাময়িক কাজ হয়,' বলল উর্বশী, রানার হাত থেকে কর্ড নিয়ে সিঙ্গেল একটা সোফায় বসা প্রৌঢ়া মহিলার দিকে এগোল। 'সকালের দিকে উশি-শিমার কাছাকাছি কয়েকটা দ্বীপের তীরে প্রথমে দেখা যায় ওই সবুজ লতা-সাপ। দুপুরের পর থেকে গোটা ইনল্যান্ড সি-র সারফেসে উঠে আসতে শুরু করেছে।' মহিলার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধল ও, ওকে কাভার দিচ্ছে

রানা। 'সব ধরনের নৌ-যানকে চলাচল করতে নিষেধ করেছে নৌ-চলাচল দফতর। গোটা এলাকায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, পরে আর অ্যান্টিডোট কাজ করেনি,' চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা। 'কারা, উর্বশী, সারারাত ধরে পাউডার ছড়াল?'

মহিলার পা বাঁধা শেষ করে লোকটার হাত বাঁধছে উর্বশী। 'সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ভেবেছিল কাজটা করেছে রাইজিং সান রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজের বিজ্ঞানীরা, কারণ এদিকটায় তারাই শুধু আন্ডারওয়াটার ফার্মিং করছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তারা এ-ব্যাপারে কিছুই জানে না। আরেকটা অদ্ভুত খবর হলো, ডক্টর ওকিনাওয়া আশামুশিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।'

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। 'এই তো মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগে তাঁকে আমরা উশি-শিমা রিসার্চ সেন্টারে দেখে এলাম! এরমধ্যে যাবেন কোথায়!'

'ওখানে ফেরার পর জানা যাবে কী হয়েছে,' বলল উর্বশী। 'কিন্তু ভাবছি জেটিতে পৌঁছে যদি দেখি আমাদেরকে ফেলেই চলে গেছে বোট?'

বয়স্ক বাটলারকে ডেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিল রানা। সাবধান করে দিয়ে বলল, জেল খাটতে না চাইলে বন্দিদের বাঁধন যেন না খোলে। সর্পলতা সম্পর্কেও সাবধান করে দিল, ভুলেও যেন পানিতে না নামে।

হোন্ডা চালিয়ে জেটির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল ওরা।

রাস্তাটা দু'এক জায়গায় সাগর ঘেঁষে এগিয়েছে। দূর থেকেই দেখতে পেল রানা পানির সারফেসে মাথা তুলে রয়েছে লক্ষ-কোটি সবুজ সাপের ফণা—আজব লতা। যতদূর চোখ যায়, একটাও জলযান নেই বে-তে।

'এই অবস্থায় ক্রুরা কি বোট ছাড়বে?' উর্বশীর গলায় সংশয়।

কথা না বলে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল রানা। এই সময়

ওদের মাথার উপর দিয়ে একটা কপ্টার উড়ে গেল, ওটার গায়ে জাপানি ভাষায় লেখা রয়েছে: পুলিশ।

দূর থেকে দেখা গেল জেটির শেষ মাথায় রাইজিং সানের মোটর ক্রুযার ছোট ছোট ঢেউয়ের তালে দুলছে। এদিকের পানিতে সর্পলতার পরিমাণ এখনও বেশ কম, এদিক সেদিক আসা-যাওয়া করছে দু'চারটে বোট।

বেশ কিছু লোককে দেখা গেল জেটির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে। তাদের মধ্যে মোটর ক্রুযারের ক্রুদের কাউকে দেখল না রানা।

বোটটার ডেকেও কেউ নেই।

জেটির শেষ মাথায় এসে রেইলিং টপকাল রানা, বোটের ডেকে পা দিয়ে ক্রুদের ডাকল: 'কোথায় সব?' ওর পিছু নিয়ে রেইলিং টপকাল উর্বশীও।

'চলে আসুন, সার,' কেবিন থেকে সাড়া দিল একজন। 'আমরা এখানে।'

কেবিনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রানা, এই সময় গ্যালির দিক থেকে কালো জিনসের ট্রাউজার আর হালকা নীল শার্ট পরা দুজন জাপানি তরুণকে হাসিমুখে এগিয়ে আসতে দেখল ওরা, দুজনের হাতেই সাব-মেশিনগান। নলগুলো লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রানা ও উর্বশীরে দিকে।

ধরা পড়ে গেছে ওরা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায়।

এক সেকেন্ড পর আরও দুজন বেরুল হুইলহাউস থেকে। এরাও বয়সে তরুণ, একই কাপড় পরা, হাতে অটোমেটিক মেশিনপিস্তল।

স্থির হয়ে গেছে রানা। চোখের কোণ দিয়ে উর্বশীর নড়াচড়া দেখে বুঝল পিস্তল বের করতে যাচ্ছে সে। 'না,' অস্ফুটে মানা করল ও।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে উর্বশী দেখল আরও দুই তরুণ

কেবিনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের অস্ত্রও ওদের দিকে তাক করা। লাইন-অভ-ফায়ার এড়িয়ে ওদের পিছনে চলে গেল দুজন।

পিঠে মাজলের মৃদু গুঁতো দিয়ে কেবিনের ভিতর ঢোকানো হলো ওদেরকে। সামনে দাঁড়িয়ে বিনীত ভঙ্গিতে মাথা নত করে ওদেরকে সম্মান জানাল জাপানি এক তরুণ।

'আমরা শত্রুতা করতে আসিনি, সার, বিপদে পড়ে সাহায্য চাইতে এসেছি,' জাপানি উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল সে। 'চোখ বেঁধে এক জায়গায় নিয়ে যাব আপনাদেরকে, দয়া করে বাধা দেবেন না।'

রানার কপালে চিন্তার রেখা। 'অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে সাহায্য চাও? কে পাঠিয়েছে?' জানতে চাইল ও, অনুভব করল মোটর ক্রুযার স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করেছে।

'একটু পরেই সেটা জানতে পারবেন,' বলল তরুণ লিডার, তার ইঙ্গিতে দুটো কালো রুমাল নিয়ে এগিয়ে এল দুজন তরুণ, উর্বশী আর রানার পিছনে পৌঁছে থামল।

'ক্রুদের কী হাল করেছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কিছুই করিনি,' বলল তরুণ। 'ওরা ভাল আছে।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' জানতে চাইল রানা।

'বেশি দূরে নয়, কাছেই একটা দ্বীপে।' ওর চোখে পট্টি বাঁধা হয়ে গেলে বলল লোকটা।

'কেন, কী আছে সেখানে?'

'ওখানে গেলে বিপদের বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারবেন,' বলল তরুণ লিডার। 'জানতে পারবেন কী ধরনের সাহায্য দরকার আমাদের।'

ব্যাপারটা এখনও রানার কাছে দুর্বোধ্য লাগছে। 'তোমরা জানলে কীভাবে আমরা সাহায্য করতে পারব?'

'আমাদেরকে বলা হয়েছে, যেভাবে পারো মাসুদ রানাকে

খুঁজে নিয়ে এসো, একমাত্র তিনিই শুধু আমাদেরকে বাঁচাতে পারবেন।'

'রাবিশ!' ধমকে উঠল রানা। 'একমাত্র আমিই যদি সাহায্য করতে পারব, তা হলে আমার সঙ্গিনীকে নিয়ে যাচ্ছ কেন?' বলল ও। 'ওকে নামিয়ে দিয়ে যাও।'

'আমাদের ওপর নির্দেশ আছে, দুজনকেই নিয়ে যেতে হবে।'

'আমরা যদি যেতে না চাই?' জাপানি ভাষায় জানতে চাইল উর্বশী, সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করল প্রশ্নটা তার মুখে এখন একেবারেই বেমানান, বিশেষ করে যার চোখ বাঁধা হয়ে গেছে।

উর্বশী আর রানা দুজনেই সচেতন, এখনও ওদেরকে সার্চ করা হয়নি।

বেশি দূরে নয় বললেও, একটানা তিন ঘণ্টা ছুটল ওদের মোটর ক্রুযার। তবে শেষদিকে আগাছার পুরু স্তর ঠেলে শম্বুকগতিতে এগোল বোট।

তরুণ জাপানিদের কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল ইতিমধ্যে সন্ধে হয়ে গেছে। একটু পর ওদের চোখ খুলে দিয়ে স্যান্ডউইচ আর কোক খেতে দেওয়া হলো। দু'দিক থেকে দুজন করে চারজন তরুণ পাহারায় রয়েছে, কারও চোখে যেন পলক পর্যন্ত পড়ছে না।

বোঝা বহন করাটা কষ্টকর, একথা বলে ওদের দুজনের ব্যাগ আর পিস্তল চেয়ে নিয়েছে জাপানি তরুণরা।

কেবিনে বসেই টের পেল রানা, স্পটলাইটের আলোয় পথ দেখে এগোচ্ছে মোটর ক্রুযার।

'আর কতদূর?' তরুণ লিডারকে কেবিনে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করল রানা।

হাসল তরুণ। 'পৌঁছে গেছি। আসুন আপনারা।'

পিঠে আগ্নেয়াস্ত্রের শক্ত স্পর্শ নিয়ে ক্রুযার থেকে জেটি হয়ে

একটা দ্বীপে নামল রানা। ওর পাশেই রয়েছে উর্বশী। সরু পথ, সাদা পাথর দিয়ে বাঁধানো, তিন-চারটে বাঁক নিয়ে এগিয়েছে, দু'পাশে বাগান।

একসময় নাক বরাবর সামনে দু'একটা জানালায় আলো দেখে একতলা একটা বাড়ির আভাস পাওয়া গেল, তা ছাড়া চারদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। বিভিন্ন আকারের টালির তৈরি বেশ কয়েকটা ছাদও চোখে পড়ল ওদের।

বাড়িটার সামনে পৌঁছাচ্ছে ওরা, এই সময় এক জোড়া পাথুরে স্তম্ভের মাথায় দুটো ফ্লাডলাইট জ্বলে উঠল। এক মুহূর্ত পর খুলে গেল বাড়ির দরজা।

অস্ত্রের মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে উর্বশী ও রানা। ধীরে ধীরে চোখে সয়ে আসছে ফ্লাড লাইটের তীব্র আলো।

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কিমোনো পরা দশ-বারোজন তরুণ, প্রত্যেকের হাতে স্পিয়ার গান।

এরপর বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলেন লাল আর সোনালি ডোরা কাটা, ঢোলা গাউন পরা ডক্টর ওকিনাওয়া আশামুশি।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ভদ্রলোককে চিনতে পারছে না রানা। যাঁকে পঞ্চাশ বছরের তরুণ বলা যেত, এখন তাঁকে অশীতিপর বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। ওর মনে হলো, শুধু ক্লান্তি আর হতাশা একজন মানুষকে এতটা বিধ্বস্ত করতে পারে না। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ থাকতে বাধ্য।

'আসুন, মিস্টার রানা। আসুন, মিস দাসা,' বলে সরু আরেকটা পথ ধরে হাঁটা ধরলেন ডক্টর আশামুশি। নিঃশব্দ দ্রুততার সঙ্গে দশ-বারোজন দেহরক্ষী ঘিরে ফেলল তাঁকে, তাঁর সঙ্গে এগোচ্ছে সবাই।

'এক মিনিট,' পিছন থেকে কঠিন সুরে বলল রানা। 'এ-সব কী হচ্ছে আমাকে বলবেন না, ডক্টর আশামুশি? আমাদেরকে এভাবে ধরা হলো কেন? এখন আবার কোথায় নিয়ে চললেন?'

'আসুন, প্লিজ, মিস্টার রানা,' প্রায় মিনতির সুরে বললেন ডক্টর আশামুশি, হাঁটা থামাননি। 'বিলিভ মি, নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের হাতে।'

অগত্যা আবার তাঁর পিছু নিল রানা।

ওদের বাম দিকে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে এল ফ্লাড লাইটের আলো। সামনে অন্ধকার।

রানা আর উর্বশীর পিছু নিয়ে আসছে আরও কিছু সশস্ত্র তরুণ, তাদের পরনে জিনস্, হাতে অটোমেটিক রাইফেল। এরাই ওদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে।

দুটো মাটির টিলাকে পাশ কাটিয়ে সাগরের তীরে পৌঁছেছে সরু পথটা। বিশ-পঁচিশটা ধাপ দেখল রানা, নেমে গেছে পানির দিকে।

চাঁদ-তারা ছাড়া অন্য কোনও আলো নেই কোথাও, তা সত্ত্বেও রানা দেখতে পেল খোলা সাগরের সারফেসে, যতদূর দৃষ্টি যায়, মাথা তুলে রয়েছে সর্পলতার মাথা– কোটি কোটি, অসংখ্য।

ধাপগুলোর মাথায় পৌঁছে থামলেন ডক্টর আশামুশি। 'বাম পাশে তাকান, মিস্টার রানা, মিস দাসা। এক আর দু'নম্বর কেবিনে আপনাদের ওয়েট সুট আছে। যান, প্লিজ, পরে নিন।'

রানা দেখল তরুণ প্রহরীরা তাদের পরনের কিমোনো খুলে ফেলল। ডক্টর ফাকুদাও নিজের গাউন খুলে ফেললেন। কিমোনো আর গাউনের নীচে ওয়েট সুট পরে আছে সবাই।

ধাপগুলোর বাম পাশে কয়েক সারিতে বেশ কয়েকটা কাঠের কেবিন রয়েছে। যে যার নিজের পরিত্যক্ত কিমোনো ওখানে রেখে এসে ধাপ বেয়ে নীচে নামল প্রহরীরা, একে একে লতা ভর্তি আরিয়াকেনো-উমির বিষাক্ত পানিতে ডুব দিল ওরা। একজনের সঙ্গেও এয়ার ট্যাংক নেই।

এক আর দু'নম্বর কেবিনে ঢুকল ওরা দুজন।

'মিস্টার রানা, মিস দাসা,' পাঁচ মিনিট পর সিঁড়ির শেষ ধাপে

নেমে গিয়ে ওদেরকে ডাকলেন ডক্টর আশামুশি, কালো একটা ছায়ার মত লাগছে তাঁকে। 'এবার আপনারা নামুন, প্লিজ।'

ইতিমধ্যে ওয়েট সুট পরা হয়ে গেছে উর্বশী ও রানার। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। ধাপগুলো বেয়ে নেমে নীচে। ভয়-ভয় করছে, সর্পলতার বিষে মরতে দেখেছে ওরা মানুষকে। কিন্তু অকুতোভয় একটা ভঙ্গি নিয়ে নেমে গেল বুক-পানিতে, তারপর ডুব দিল। শ্বাস-প্রশ্বাসে কোনও সমস্যাই হচ্ছে না ওদের। স্পেশাল ওয়েট সুট পরে আছে ওরা, বিল্ট-ইন স্পেশাল ব্রিদিং অ্যাপারেটাস থেকে অক্সিজেন সাপ্লাই পাচ্ছে।

প্রহরীদের হাতে স্পিয়ার গান রয়েছে। চারজন প্রহরী ডক্টর আশামুশিকে নিয়ে সামনে থাকল। তাদের পিছনে চারজন থাকল উর্বশী আর রানাকে নিয়ে। সবার পিছু নিয়ে আসছে আরও চারজন। গভীর থেকে গভীরতর পানিতে নেমে যাচ্ছে।

ছোট একটা মিছিলের মত সাগরের গভীরে নামছে ওরা। নামার গতিপথ দেখে রানা ধারণা করল, আরিয়াকেনো-উমির ঠিক মাঝখানটাই বোধহয় ওদের গন্তব্য।

বিশ মিনিট পর হঠাৎ সরাসরি সামনে ওটাকে দেখতে পেল রানা: একটা ট্র্যান্সপারেন্ট গম্বুজ, দুটো স্টেডিয়ামকে এক করলে এরকম আকার পাওয়া যেতে পারে; সাগরের সারফেস থেকে কম করেও ষাট ফুট নীচে নিজস্ব কোমল নীল আলোয় ঝলমল করছে।

'কোনও প্রশ্ন না করে প্রথমে আমার কথাগুলো ধৈর্য ধরে শুনুন,' এভাবে শুরু করলেন ডক্টর ওকিনাওয়া আশামুশি। 'আমরা, জাপানিরা, বহু যুগ আগে থেকেই শিখছি কীভাবে সাগরের তলায় বসবাস করা যায়। এটা খুব ছোট একটা গম্বুজ, বড় জোর দু'তিনটে পাড়া-মহল্লার জায়গা হবে। প্রশান্ত মহাসাগরের নীচে, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি যে গম্বুজটা আছে তাতে গোটা একটা কসমোপলিটান শহর ঢুকে যাবে। এখানে বা ওখানে

দু'জায়গাতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ আমরা–নিজেরাই নিজেদের এয়ার অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করি, নিজস্ব ওয়েস্ট ফ্যাসিলিটিজ অ্যান্ড রিসাইক্লিং প্রোসেস আছে, ঠিক একটা স্পেসশিপে যেমন থাকে।'

কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা ল্যাবে বসে রয়েছে ওরা তিনজন–ডক্টর আশামুশি, উর্বশী ও রানা। কাছেপিঠে কোনও গার্ড দেখা না গেলেও, দুজনেই জানে, ওরা আশপাশেই কোথাও আছে।

গম্বুজে ওরা ঢুকেছে এয়ার লক-এর ভিতর দিয়ে। গম্বুজের পরিবেশটা এমন, মনেই হচ্ছে না যে সাগরের নীচে রয়েছে ওরা। বাতাস স্বাভাবিক, কোমল হলদেটে আলো সকালবেলার প্রথম রোদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ভূমিকা শেষ, কথা আর না বাড়িয়ে এবার কাজের কথায় এলেন বিজ্ঞানী।

'ওয়াশিংটনের কনফারেন্সে সেদিন আপনি ঠিকই বলেছিলেন, ইয়াংম্যান,' সরল স্বীকারোক্তি দিয়ে বক্তব্য শুরু করলেন ডক্টর ওকিনাওয়া আশামুশি। 'সাগরের নীচে পশু প্রতিপালন ব্যবস্থাই বলুন, বা জলজ ধান, শাক-সবজি, ফল-মূল উৎপাদন পদ্ধতি–মোটকথা, আজ পর্যন্ত যত বড়বড় চমক সৃষ্টি করে আমি জগতের সবার প্রশংসা, সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেছি–সবই আসলে আমার সহকারী ডক্টর নিশিকাওয়া ফাকুদার আবিষ্কার। এবং অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করছি, সত্যিই নির্লজ্জের মত তাঁর সমস্ত আবিষ্কার মেরে দিয়েছি আমি, এবং ওকে দাবিয়ে রেখে সবকিছু নিজের বলে চালিয়ে মানুষের বাহবা কুড়িয়েছি।

'আপনারা যে স্পেশাল ওয়েট সুট পরে এখানে এলেন, ম্যাগনেটিক ফোর্সের কল্যাণে প্রশান্ত মহাসাগরের নীচে যে কিম্ভূত সাবমারসিবল আপনাদেরকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, এইমুহূর্তে সাগর তলের যে গম্বুজে রয়েছেন, এ সবই এবং এরকম আরও ডজন ডজন আবিষ্কার আছে ওঁর।

'মানুষটা বড় বেশি সরল, দুনিয়ার হিসাব আর ঘোরপ্যাঁচ বোঝেন না, তারই সুযোগ নিয়ে ওঁর এ-সব বিস্ময়কর আবিষ্কার

কেড়ে নিয়েছি আমি। কেড়ে তো নিলামই, তারপর সাবধানের মার নেই ভেবে একটা কাগজে ওঁকে দিয়ে এমন কিছু কথা লিখিয়ে নিলাম, যার সারমর্ম হলো: আজ পর্যন্ত যা কিছু তিনি উদ্ভাবন আর আবিষ্কার করেছেন—সব আমার মাথা থেকে বেরিয়েছে, ওঁর কোনও কৃতিত্ব বা অবদান নেই।

'কথায় আছে—চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ো ধরা। যাতে ধরা না পড়ি তার জন্যে সম্ভাব্য সব ব্যবস্থাই করেছিলাম, কিন্তু হায়, তাতেও কি শেষরক্ষা হলো?

'আপনাদের কৌতূহল হচ্ছে—কী ব্যবস্থা? আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট যাতে বেঁকে না বসেন, ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে তাঁর মা-বাবাকে জিম্মি করলাম, তারপর তাঁদেরকে দিয়ে টেলিফোন করালাম—*বাবা ফাকুদা, ডক্টর আশামুশি যা চায় দিয়ে দাও, তা না হলে আমাদেরকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে সে।*

'ফাকুদা লক্ষ্মী ছেলের মত আমাকে ওঁর সমস্ত থিসিস, লিটারেচার, নোট, রেফারেন্স ইত্যাদি যেখানে যা কিছু ছিল ঝেড়েমুছে দিয়ে দিলেন। কিন্তু মুশকিল হলো, কিছু একটার গন্ধ পেয়ে ওই গুণ্ডাগুলোর পেছনে লাগল পুলিশ। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে ফাকুদার মা-বাবার গলায় ছুরি চালাতে হলো আমাকে।

'ভেবে দেখুন, আপনাদের সামনে কত বড় নরাধম বসে আছি, কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনি বলে কাজটা নিজেই করি আমি। এরকম গুরুতর অপরাধ আরও অনেক করেছি। অসৎ ডাক্তারদের টাকা খাইয়ে ফাকুদার স্ত্রীকে পাগলাগারদে ভরি। কিন্তু তাঁর অসুস্থতা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে দেখে ওই অসৎ ডাক্তারদের আরও টাকা দিই, তারা ভদ্রমহিলাকে ছাদ থেকে নীচে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যার গল্প ফাঁদে।

'আমি এভাবে নিজের অপরাধ স্বীকার করায় জানি কী ভাবছেন আপনারা। ভাবছেন ডক্টর ওকিনাওয়া আশামুশি হয় পাগল হয়ে গেছে, নয়তো সাধু। না, দুটোর কোনওটাই সত্যি

নয়। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি, সাধুও হইনি। বিপদে পড়ে নিজের এতসব গুরুতর অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি আমি। সে যে কী বিপদ, যে শুনবে তারই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে।

'বিপদটা আসলে আমিই ডেকে আনি, মহাশূন্য থেকে ফেরত আসা পাঁচ নম্বর চারাটা চুরি করে। দুনিয়ার যার কাছে যত অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমা আছে সবগুলো দিয়ে যে ক্ষতি করা যাবে, নীরবে তারচেয়ে সহস্রগুণ বেশি সর্বনাশ করার ক্ষমতা রয়েছে ওই সর্পলতার।

শুরুতেই আমি বুঝেছিলাম, সর্পলতাকে যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, সে-ই হবে আগামী বিশ্বের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। ওটা আমাকে চুরি করতে হয়, কারণ আমার স্বপ্ন ছিল ডক্টর ফাকুদার আবিষ্কারগুলোকে কাজে লাগিয়ে জাপানকে পৃথিবীর একমাত্র সুপারপাওয়ারে পরিণত করব, আর আমি হব মধ্যমণি, সেই সুপারপাওয়ারের ক্ষমতার উৎস।

'শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র, ধীরে ধীরে সাতটা মহাসাগরই সর্পলতায় ভরাট হয়ে উঠবে। ওই বিষাক্ত আগাছার সংস্পর্শে সামুদ্রিক সমস্ত প্রাণী মারা যাবে। সর্পলতার বিষ সাগরের পানিকে দূষিত করবে, ফলে দূষিত হয়ে উঠবে বৃষ্টিও। তারপর, কয়েক বছরের মধ্যে—হয়তো মাত্র একবছরের মধ্যেই—ডাঙায়ও কোনও প্রাণী বেঁচে থাকবে না।

'আমি জানতাম সর্পলতা নিয়ে যে খেলায় আমি মেতেছি তার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। তবে এ-ও আমি জানতাম যে আমার হাতে একটা আলাদিনের চেরাগ আছে। সেই চেরাগের নাম ডক্টর ফাকুদা। তখন বুঝিনি যে...থাক, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

'স্বপ্নপূরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ডক্টর ফাকুদার কয়েকটা আবিষ্কার কাজে লাগিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ এলাকায়, পানির তলায় বড়সড় একটা গম্বুজ বানালাম আমরা।

ভবিষ্যতে ওই ধরনের গম্বুজে সপরিবারে আশ্রয় পাওয়ার আশায় প্রায় পাঁচ লক্ষ জাপানি ব্যবসায়ী আমাকে গোপনে পুঁজি দিয়ে সাহায্য করেছেন–যখন পৃথিবী নামক গ্রহে নিরাপদ জায়গা আর থাকবে না, তখন যেন একটু ঠাঁই পান আমার কাছে।

'দ্বিতীয় পদক্ষেপ, সর্পলতার অ্যান্টিডোট বানানো। ডক্টর ফাকুদাকে বললাম, আপনি আমাকে এই সর্পলতার বিষক্রিয়া থেকে বাঁচার অ্যান্টিডোট বানিয়ে দিন, তা হলেই আমার স্বপ্ন সফল হয়। আমার সেই স্বপ্নরাজ্যে আপনাকে আমি প্রধান বিজ্ঞানীর পদ দিয়ে সম্মানিত করব। বললাম, আপনার আছে আবিষ্কারের নেশা, আর আমি সুখ্যাতির কাঙাল–নিত্য নতুন আবিষ্কার করে যাবেন আপনি, আমি সেগুলো নিজের বলে চালিয়ে বিশ্বসমাজের প্রশংসা কুড়াব।

'আমার প্রস্তাবে ডক্টর ফাকুদা রাজি তো হলেনই না, উল্টে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার হুমকি দিলেন। আলটিমেটাম দিয়ে বললেন, আমি যেন ওঁর সব আবিষ্কার ফেরত দিয়ে দিই। ওঁর সাহস আর স্পর্ধা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কারণ আমার ধারণা ছিল অত্যন্ত ভীতু একজন মানুষ তিনি, নেহাতই কাপুরুষ, তা না হলে বছরের পর বছর ধরে এত সব অন্যায়-অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করছেন কীভাবে। কিন্তু না, দেখা গেল আমার সে ধারণা ভুল।

'আমার বিরুদ্ধে আবিষ্কার চুরির অভিযোগ এনে সম্রাট, প্রধানমন্ত্রী আর স্পিকারের কাছে চিঠি লিখলেন ডক্টর ফাকুদা। ভাগ্যিস, আমার গুপ্তচরেরা নজর রাখছিল ওঁর ওপর, তারা চিঠিগুলো সংগ্রহ করে সোজা আমার কাছে নিয়ে আসে, তা না হলে হয়তো ভাল বিপদেই পড়তে হত আমাকে।

'এরপর কঠিন সিদ্ধান্ত নিলাম। কাগজে-কলমে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করলাম ফাকুদাকে। লঞ্চ দুর্ঘটনার আয়োজন করলাম, মাথায় মুগুর মেরে সাগরের পানিতে ফেলে দিলাম আমার এক

বেয়াড়া শত্রুকে। মোটা টাকা আর নানান সুযোগ-সুবিধের বিনিময়ে শত্রুর লাশটাকে সাতদিন পর ডক্টর ফাকুদার লাশ বলে ওঁরই চাচা-চাচীকে দিয়ে সনাক্ত করালাম।

'ডক্টর ফাকুদা তা হলে বেঁচে আছেন?' এই প্রথম মুখ খুলল রানা।

'কোথায় তিনি?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল উর্বশী।

মাথা ঝাঁকাল ওকিনাওয়া আশামুশি। 'হ্যাঁ, বেঁচে আছেন ডক্টর ফাকুদা।' পরক্ষণেই তিক্ত হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'না, আমি জানি না এই মুহূর্তে তিনি কোথায় আছেন। জানলে কী আর আপনাদের সাহায্য দরকার হত আমার!'

'ওহ্, গড।' বিড়বিড় করল রানা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শুরু করল আশামুশি। 'অ্যান্টিডোট আমাকে পেতেই হবে। দুঃসাহস, কিংবা আমার প্রতি ঘৃণার বশে ডক্টর ফাকুদা যাতে কিছু করে না বসেন, সেজন্যে এরপর ওঁর সবচেয়ে দুর্বল জায়গাতে হাত দিলাম। সাত বছর বয়েসী একমাত্র ছেলেটিকে বোর্ডিং থেকে সরিয়ে এনে নিজের একটা বাড়িতে আটকে রাখলাম, ব্যবস্থা করলাম তার জায়গায় অন্য ছেলে যাতে প্রক্সি দেয়। ফাকুদাকে বললাম, আপনি আমার সঙ্গে গোলমাল করলেই ইমুনু বাছাধনের কল্লা কাটা পড়বে। ইমুনু ওঁর ছেলের নাম।

'আরও বললাম, এবার মন দিয়ে কাজ করুন, অ্যান্টিডোট বানাবার সাধনায় নিজের সমস্ত মেধা ঢেলে দিন। কারণ, অ্যান্টিডোট তৈরির সাফল্যের ওপর আপনার পুত্র ও আপনার নিজের জীবনও ঝুলে আছে।'

'প্রশান্ত মহাসাগরের ওই গম্বুজে একা শুধু ডক্টর ফাকুদা নয়, আমিও আলাদা একটা ল্যাবে চেষ্টা করে দেখছিলাম কিছু করতে পারি কি না। তখনই অ্যাক্সিডেন্টালি কয়েকটা লতা আবর্জনা ভেবে ফেলে দিই আমি। লক্ষ-কোটি গুণ হয়ে কোয়াজ অ্যাটলে সপলতা

ছড়িয়ে পড়ে সেগুলো, এমনকী ইন্দোনেশিয়ার ইরিয়ান জায়া হয়ে পৌঁছে যায় বাংলাদেশের সুন্দরবনেও।

'এত কিছুর মধ্যে চিনাদের সার্ভেইলান্স শিপটা কিছু না বুঝে আমাদের সি ফার্মিং এরিয়া আর গম্বুজের কাছে চলে এল। মাঝে মাঝে ডুবুরি পাঠায়। সন্দেহ হলো, আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে যাচ্ছে ওরা, কাজেই টর্পেডো ছুঁড়ে ওটাকে উড়িয়ে দিতে বাধ্য হলাম আমি।

'যাই হোক, প্রশান্ত মহাসাগরে সর্পলতা ছড়িয়ে পড়ছে দেখে ডক্টর ফাকুদাকে বললাম, কিছু একটা করুন! তিনি কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিলেন, আমার কিছু করার নেই। আমি ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম সর্পলতা কোত্থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে।

'বাংলাদেশ আর সুন্দরবনের নাম বলতেই ওঁর মধ্যে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। বললেন, একটা অ্যান্টিডোট বানিয়েছি, কাজ হয় কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে। বললাম, পরীক্ষা করুন। উত্তরে বললেন, পরীক্ষাটা তিনি করতে চান বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায়।

'কী থেকে কী হচ্ছে সবই টের পেলাম আমি। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার, মিস্টার রানা। সিয়াটল ভার্সিটির সেমিনারে কয়েকশো মানুষের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন আপনি, আমার বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ করেছিলেন –ডক্টর ফাকুদার আবিষ্কারগুলো আমি মেরে দিচ্ছি। জবাবে আমি বলেছিলাম, ডক্টর ফাকুদাকেই বলতে বলুন কথাটা সত্যি না মিথ্যে। ডক্টর ফাকুদা আপনার অভিযোগ সমর্থন করেননি। আসলে ওঁর বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্রকে মেরে ফেলব আমি, এই ভয়ে মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি তখন।

'মুখে যাই বলুন, অচেনা এক বিদেশি তাঁর পক্ষে কথা বলায় গোপনে খোঁজ নেন ফাকুদা–কে এই দুঃসাহসী মাসুদ রানা? কোথায় থাকেন? তারপর যখন শুনলেন বাংলাদেশের উপকূল

সংলগ্ন বনে ওই আগাছা ছড়াচ্ছে, নিজের আবিষ্কার করা অ্যান্টিডোট নিয়ে সেখানে ছুটতে চাইছেন।

'ডক্টর ফাকুদা গেলেন সুন্দরবনে। আমিও নিজের তৈরি একটা অ্যান্টিডোট কাজ করে কি না দেখার জন্য কুরুড্ডু দ্বীপ থেকে কয়েকজন ডুবুরিকে ধরে আনলাম গিনিপিগ হিসাবে। দুঃখের বিষয়, আমরা দুজনেই ব্যর্থ হই। তবে দুজনের ব্যর্থতার মাত্রা ছিল দু'রকম।

'ডক্টর ফাকুদার অ্যান্টিডোট প্রথমে ভালই কাজ করল, সুন্দরবন এলাকার সর্পলতা ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু কদিন পর আবার ফি-রে আসে ওগুলো। অর্থাৎ ওষুধটার প্রভাব স্থায়ী হয়নি। আর আমার অ্যান্টিডোট–একটা বিশেষ গাছের বাকল দিয়ে তৈরি পাউডার–মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে ঠেকিয়ে রাখতে পারল সর্পলতাকে। গিনিপিগগুলো শেষ পর্যন্ত মারা যায়–তাদের মধ্যে এক ডাচ ফাদার ছিলেন, উইলিয়াম লিন্ডসে। আমাকে তিনি অভিশাপ দিয়ে গেছেন...

'তারপর কী হলো?' জানতে চাইল উর্বশী।

'সুন্দরবন থেকে কোথায় গেলেন ডক্টর ফাকুদা?' রানার প্রশ্ন।

'সুন্দরবন থেকে ফিরে আমাকে বললেন, অ্যান্টিডোটটা নিখুঁত করার জন্যে রাইজিং সান রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজে আমার যে ব্যক্তিগত ল্যাব আছে সেটা একবার ব্যবহার করতে চান তিনি, এবং এই সুযোগে ইমুনুকেও একবার দেখতে চান,' বলল আশামুশি। 'আমি নিজে ওঁকে রিসার্চ সেন্টারে পৌঁছে দিলাম, ব্যবহার করতে দিলাম আমার প্রাইভেট ল্যাবটা। রিসার্চ ডিরেক্টর ডক্টর টয়োমাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে বললাম, আমার সহকারীর ওপর যেন কড়া নজর রাখা হয়। আর ইমুনুর ব্যাপারে ডক্টর ফাকুদাকে বললাম, আগে কাজ শেষ হোক, তারপর ছেলেকে দেখবেন।

'কদিন পর, মানে, গতকাল, রিসার্চ ল্যাব থেকে প্রফেসর

টয়োমা আমাকে টেলিফোন করে জানালেন, রিসার্চ সেন্টারে ডক্টর ফাকুদাকে পাওয়া যাচ্ছে না। জরুরি কী একটা কাজে রিসার্চ সেন্টারের বাইরে গিয়েছিলেন তিনি, দুপুরে ফিরে দেখেন সবাইকে কাঁচকলা দেখিয়ে ডক্টর ফাকুদা পালিয়ে গেছেন—ছেলের মায়া করেননি। কাউকে কিছু বলে যাননি তিনি, শুধু টেবিলে একটা চিরকুট পাওয়া গেছে।

'তখনই সিদ্ধান্ত নিই, কঠিন শাস্তি দেব প্রফেসর টয়োমাকে। কারণ তাঁর চরম গাফিলতি কিংবা প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া ডক্টর ফাকুদার পক্ষে কোনভাবেই পালানো সম্ভব হত না। তাঁকে যে শাস্তি দেয়া হবে, সেটা টের পেয়ে যান তিনি, সেজন্যেই আমাকে দেখে অমন নার্ভাস আচরণ করছিলেন।

'ডক্টর ফাকুদার লেখায় কোনও শিরোনাম নেই, কাউকে সম্বোধন করেও লেখেননি। এই নিন সেই চিরকুট,' বলে গাউনের পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করল আশামুশি, সেটার ভিতর থেকে এক প্রস্থ লম্বা কাগজ টেনে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে।

চিরকুটটা হুবহু এভাবে লেখা হয়েছে:

খেপে গেছি আমি! আমি এখন উন্মাদ!
এই পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষকে ঘৃণা করি!
কতভাবে কতজনকে বোঝাবার চেষ্টা
করলাম আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে,
কিন্তু কেউ আমার কথায় কান দিল না।
হায়, কেউ বুঝবে না বেঁচে থাকলে
আরও কত কী আমি দিতে পারতাম
তোমাদেরকে। সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই হীন
জীবন আর রাখব না। নিজে বাঁচব না,
আর কাউকে বাঁচতেও দেব না।

বিষাক্ত সর্পলতার অ্যান্টিডোট তৈরি করার
জন্যে নিজেকে গিনিপিগ বানিয়ে এক্সপেরিমেন্ট
করেছি। তারপরও বেঁচে আছি আমি! এর
মানে হলো, পৃথিবীটাকে একা শুধু আমিই
বাঁচাতে পারব। কিন্তু না, আমি দেখতে চাই
আমার চোখের সামনে একটু একটু করে ধ্বংস
হয়ে যাচ্ছে দুনিয়াটা! ঠিক যেভাবে তোমরা
আমাকে ধ্বংস করেছ। মরো সবাই!
পারলে মরার আগে আরও একবার আশামুশির
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হও! সে তো নিজেকে বিরাট
বিজ্ঞানী হিসেবে জাহির করে,
বলে দেখো, সে হয়তো তোমাদেরকে
বাঁচাতে পারবে! প্রশান্ত মহাসাগরের সর্বনাশ
করেছে আশামুশি, আমি সর্বনাশ করব জাপানের।
এখন দুপুর। ইনল্যান্ড সি আরিয়াকেনো-উমির
পানিতে সর্পলতা ছেড়ে যাচ্ছি। আশা করি
কাল দুপুর নাগাদ ভরাট হয়ে যাবে গোটা
ইনল্যান্ড সি। সামনে বর্ষা, বৃষ্টির পানি মাস
তিনেকের মধ্যেই গোটা এশিয়ার সবকিছু ধ্বংস
করে আমেরিকাকে বিষাক্ত করে তুলবে।
বছরও ঘুরবে না, পৃথিবীর সবগুলো জলাশয়
বিষাক্ত হয়ে যাবে। তখন এমনকী আমারও
সাধ্য হবে না দুনিয়াটাকে বাঁচানোর।
বিদায়, অকৃতজ্ঞ পৃথিবী, বিদায়!

আরও একবার পড়ে কাগজটা উর্বশীর হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'আপনি খবর পেলেন ডক্টর ফাকুদা পালিয়েছেন,' আশামুশিকে বলল ও। 'তারপর কী করলেন?'

'টোকিও থেকে দুটো নির্দেশ পাঠালাম,' বলল আশামুশি। 'প্রথম নির্দেশে বললাম–চারদিকে সার্চ পার্টি পাঠাও, যেভাবে হোক ডক্টর ফাকুদাকে খুঁজে বের করো। দ্বিতীয় নির্দেশে বললাম–রাতের অন্ধকারে ইনল্যান্ড সি-র সারফেসে আমার তৈরি অ্যান্টিডোট, অর্থাৎ পাউডার ছড়াও। আমি চেয়েছিলাম সর্পলতা যেন খুব তাড়াতাড়ি পানির ওপর উঠে আসতে না পারে।'

'এবার বলুন,' প্রশ্ন করল রানা, 'আমাদেরকে কেন আপনার দরকার হলো?'

'আপনাদেরকে নয়, দরকার একা শুধু আপনাকে,' বলল আশামুশি। 'আর দরকারটা আমার না, এই পৃথিবীর, এই সভ্যতার। তবে যেহেতু একসঙ্গে একটা মিশনে কাজ করছেন আপনারা, তাই দুজন মিলে কিছু করতে চাইলে আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'কী সাহায্য?'

'এই মহা বিপদ থেকে দুনিয়াটাকে আপনি বাঁচান, মিস্টার রানা!' আবেগে কেঁপে উঠল আশামুশির গলা। 'আমি জানি একমাত্র আপনিই তা পারেন।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল রানা।

'আমার স্থির বিশ্বাস, এই মুহূর্তে শুধু আপনার কথাই শুনবেন তিনি,' বলল আশামুশি। 'কারণ দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীদের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ওঁর পক্ষে কথা বলায় আপনার প্রতি আশ্চর্য একটা শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নিয়েছে ডক্টর ফাকুদার মনে। তার প্রমাণ, সর্পলতা দেখা গেছে শুনেই সুন্দরবনে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি। শুধু মাসুদ রানা যদি ওঁকে ফেরাতে পারেন, অন্য কারও কথা এখন আর ওঁর মগজে ঢুকবে না।'

এক মুহূর্ত পর জানতে চাইল রানা, 'কী করতে হবে আমাকে?'

'খুঁজে বের করুন ওঁকে,' বলল আশামুশি। 'অনুরোধ করুন

অ্যান্টিডোটটা যেন আপনার হাতে তুলে দেন।'

'কোথায় পাব ওঁকে, কোনও ধারণা দিতে পারেন?' জানতে চাইল রানা।

'না, কয়েকশো দ্বীপের যে-কোনওটায় লুকিয়ে থাকতে পারেন তিনি।' চিন্তিত দেখাচ্ছে আশামুশিকে। 'তবে আমাদের সার্চ পার্টির সঙ্গে আপনি যদি থাকেন, প্রতিটি দ্বীপ তন্নতন্ন করে সার্চ করার দরকার হবে না। আমার বিশ্বাস লাউডস্পিকারে আপনার গলার আওয়াজ পেলে তিনি নিজেই দেখা দেবেন।'

'আপনার আশা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে,' বলল রানা।

'এই মাত্রা ছাড়ানো আশাই এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে,' দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল আশামুশি।

উর্বশীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো রানার। দুজনের মধ্যে কী কথা হলো বোঝা গেল না। 'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'আপনাদের সার্চ পার্টির সঙ্গে থাকব আমি। তবে আমার তিনটি শর্ত আছে।'

পরম একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আশামুশি। 'আপনার যে-কোনও শর্তে রাজি আমি। শুধু মুখ ফুটে বলুন, প্লিজ।'

'সার্চ পার্টির নেতৃত্বে থাকব আমি,' বলল রানা। 'ইমুনুকে আমার হাতে তুলে দিতে হবে। আর...'

ভ্রূ কোঁচকাল আশামুশি। 'ইমুনুকে কেন দরকার আপনার?'

'নিজের ছেলেকে ফিরে না পেলে তিনি অ্যান্টিডোট দিতে রাজি হবেন কেন?' বলল রানা। 'শুধু তা-ই নয়, যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হবে ডক্টর ফাকুদাকে, স্বীকৃতি দিতে হবে তাঁর প্রতিভার।'

যুক্তিটা বাধ্য হয়ে মেনে নিল আশামুশি। 'ঠিক আছে, আমি রাজি।'

'আরও কথা আছে,' বলল রানা। 'এমনিতেই অনেক দেরি করে ফেলেছেন আপনি। তা ছাড়া, প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমারও কিছুটা সময় লাগবে। আমি কাজ শুরু করব আগামীকাল সকাল থেকে। ততক্ষণে সী-উইড যদি সমস্ত জলপথ জ্যাম করে ফেলে,

লঞ্চ নিয়ে এগোতে পারব?'

'আপনাকে সময় দিতে হবে কেন?'

'আপনার কাছ থেকে পাবার পর ইমুনুকে নিরাপদ জায়গায় সরাতে হবে না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনাকে কতটুকু বিশ্বাস করা যায়, তা তো আপনি নিজেই জানেন।'

'তা ঠিক,' অম্লানবদনে স্বীকার করল আশামুশি। 'তবে সার্চ পার্টির যাতে সমস্যা না হয়, আমরা আরও পাউডার ছড়াবার ব্যবস্থা করব।'

'আরও ব্যাপার আছে।'

বিচলিত দেখাল আশামুশিকে। 'আবার কী?'

'এখান থেকে ডাঙায় ফেরার পর আমাদের অস্ত্র আর ব্যাগদুটো দরকার হবে,' বলল রানা।

'পাবেন। আর?'

'ইমুনুকে কোথায়, কখন পাব?'

'আরাও শহরে,' বলল আশামুশি। 'বলছি, লিখে নিন ঠিকানাটা। আমি টেলিফোন করে দেব, ওরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

'গুড। আর কিছু না। 'ধন্যবাদ,' বলে অপেক্ষা করছে রানা। কিন্তু না, নিজের কোনও শর্তের কথা বলল না ডক্টর আশামুশি।

'আপনি সাহায্য করছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, ইয়াং ম্যান! আপনার এই ঋণ আমি কোনওদিন শোধ করতে পারব না।'

মনে মনে বলল রানা: হ্যাঁ, যেহেতু নিজেই তুমি স্বীকার করেছ সাধু হয়ে যাওনি। ফাকুদার অ্যান্টিডোটটা কীভাবে মেরে দেওয়া যায় সে পরিকল্পনাও নিশ্চয়ই তৈরি করা আছে তোমার। আর কাজ উদ্ধার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পরপারে পাঠানোর ব্যবস্থাও আশা করা যায় থাকবে।

প্রশ্ন হলো, কী সেই পরিকল্পনা?

সতেরো

আরাও শহরে পৌঁছে ট্যাক্সি নিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে ওরা দুজন, সেল ফোনে নুমার হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। ডায়াল করল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের ব্যক্তিগত নম্বরে। দু'বার রিং হওয়ার পর সাড়া দিলেন নুমা চিফ। 'ইয়েস?'

'আমি রানা, সার,' বলল ও, কথা বলছে দ্রুত। 'ওপেন লাইন, এয়ারে বেশিক্ষণ থাকতে চাইছি না। আপনি শুধু ইয়েস-নো বলে জবাব দেবেন, প্লিজ।'

'ইজ দিস অ্যান ইমারজেন্সি, রানা?' অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন অভিজ্ঞ মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির গুরুত্ব আন্দাজ করে নিয়েছেন।

'মোর দ্যান ইমারজেন্সি, সার,' বেসুরো গলায় বলল রানা। 'ইট'স অ্যান রেড অ্যালার্ট ফর দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, সার।'

'গুড গড!' অপরপ্রান্ত থেকে একটা ঢোক গেলার আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। 'ওকে। স্টার্ট!'

'একটা সুপারসনিক জেট নিয়ে এই মুহূর্তে রওনা হয়ে ওসাকা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করবেন আপনি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'সুপারসনিক, রানা?' অ্যাডমিরাল বোধহয় নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'সুপারসনিক, সার।'

'ইয়েস,' জবাব এল, এবার কোনও রকম কালক্ষেপণ ছাড়াই।

'প্লেন আকাশে থাকার সময় একটা কাজ করতে হবে আপনাকে—জাপানি প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে আমার একটা মিটিঙের ব্যবস্থা হওয়া দরকার; আপনার, তিন বাহিনীপ্রধান আর রেডক্রস-এর ডিরেক্টরের উপস্থিতিতে। সম্ভব?'

এবার ঝাড়া তিন সেকেন্ডের বিরতি। 'ইয়েস।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, সার,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে একটা প্লেন চার্টার করল ওরা, পাইলটকে টোকিওর ফ্লাইট-পাথ রেকর্ড করাতে বলল রানা। টোকিওতে নয়, ওসাকাতেই ল্যান্ড করবে ওরা, তবে পিছনে কোনও ক্লু রেখে যাবে না।

আশামুশির দেওয়া ঠিকানাটা এয়ারপোর্টের কাছাকাছি। রেন্ট-আ-কার থেকে একটা মার্সিডিজ নিয়ে রাত ন'টায় বেরিয়ে পড়ল ওরা। বেশি খুঁজতে হলো না, সহজেই পাওয়া গেল দোতলা বাড়িটা। কল বেলের বোতাম টিপল রানা।

'ইমপসিবল একটা সিচুয়েশন, রানা,' ফিসফিস করছে উর্বশী। 'কোনও শর্ত ছাড়াই সব মেনে নিল আশামুশি। তার নিজের কোনও স্বার্থই তো উদ্ধার হচ্ছে না।'

'তাই কি কখনও হয়?' মুচকি একটু হেসে বলল রানা। 'নিশ্চয়ই কোনও চাল চেলে রেখেছে সে।'

'তুমি হাসছ?' ভ্রূ কোঁচকাল উর্বশী।

'আন্দাজ করতে পারছি কী হতে পারে সেই চাল,' বলে আরেকবার বোতামে চাপ দিল রানা।

আরও প্রায় ষাট সেকেন্ড পর দরজা খুলে উঁকি দিল সুন্দরী এক তরুণী। 'কী চাই, প্লিজ?' জাপানি কায়দায় বার দুয়েক মাথা নত করে জানতে চাইল সে।

'আমি মাসুদ রানা, আমার সঙ্গে ইনি উর্বশী দাশা,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, ডক্টর আশামুশির টেলিফোন পেয়েছি আমরা। আসুন,

ভেতরে আসুন।'

মেয়েটির পিছু নিয়ে একটা লিভিং রুমে ঢুকল ওরা। সোফার উপর পা তুলে বসে সাত-আট বছরের একটা ছেলে টেলিভিশনে সুমো কুস্তি দেখছে, আর কোলের উপর রাখা প্যাকেট থেকে নিয়ে একটা-দুটো করে পটেটো চিপস্ চিবাচ্ছে। তার পাশে চিপসের আরেকটা প্যাকেট রয়েছে, খোলা হয়নি। হাফ প্যান্টের উপর মাঝে মধ্যে ডান হাত মুছছে সে। ঘরের ভিতর লোকজন ঢুকল, অথচ সেদিকে সে তাকালই না।

মাঝবয়েসী দুজন পুরুষ বসে আছে দরজার দু'পাশে ফেলা দুটো চেয়ারে। অল্প দু'একটা বাক্য বিনিময়ের পর ইমুনুকে তারা ওদের মার্সিডিজে তুলে দিতে চাইল।

'এই যে, খোকা, এদিকে একটু তাকাও,' বলল রানা। 'আমরা তোমাকে নিতে এসেছি।'

'জানি,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ছেলেটা, ঘাড় ফিরিয়ে উর্বশী আর রানাকে দেখল। 'আমাকে তোমরা বাবার কাছে নিয়ে যাবে।'

'ও, আচ্ছা, তুমি তা হলে জানো!' প্রশংসার সুরে বলল রানা। 'তা তোমার বাবার নামটা যেন কী, খোকা?'

'ডক্টর নিশিকাওয়া ফাকুদা।'

'ভেরি গুড। আর তোমার নাম তো কোকিয়ো, তাই না?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বলে চলেছে রানা, 'তা কোকিয়ো, কতদিন হলো তুমি স্কুলে যাচ্ছ না?'

লোক দুজনকে চট করে একবার দেখে নিয়ে জবাব দিল ছেলেটা, 'কাল থেকে।'

উর্বশী ও রানা, দুজনের হাতেই জাদুমন্ত্রের মত চোখের পলকে বেরিয়ে এল পিস্তল।

দুই পুরুষ আর তরুণী, তিনজনই মাথার উপর হাত তুলে কিচিরমিচির শুরু করল, বলছে তারা কোনও অপরাধের সঙ্গে জড়িত নয়, এখানে স্রেফ ডক্টর আশামুশির চাকরি করছে।

সেল ফোন অন করে ডক্টর আশামুশির সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। 'এটা নকল ছেলে, আশপাশের কোনও বস্তি থেকে ধরে এনেছে আপনার লোকজন, আমি তার নাম কোকিয়ো বলাতে প্রতিবাদ করছে না,' বলল ও। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে যদি আসল ইমুনুকে না পাই, আমরা এর মধ্যে নেই। পুলিশকেও সব জানাতে বাধ্য হব।'

সোফার উপর পা তুলে এত রাতে দুই প্যাকেট চিপস্ নিয়ে বসা, প্যান্ট হাত মোছা ইত্যাদি দেখে যে-কারও মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক; বোর্ডিং স্কুলে শেখানো শৃংখলার চিহ্নমাত্র নেই ছেলেটার আচরণে।

ফোন লাইন নীরব হয়ে আছে। দশ সেকেন্ড। বিশ সেকেন্ড।

'ঠিক আছে, বুঝেছি, কৌশলটা কাজে লাগল না,' অপরপ্রান্ত থেকে ডক্টর আশামুশির দীর্ঘশ্বাস ফেলার আওয়াজ ভেসে এল। 'মেয়েটার হাতে ফোন দিন।'

দোতলার একটা কামরায় ঘুমাচ্ছিল ইমুনু। একহারা গড়ন তার, প্রায় হুবহু বাপের চেহারা পেয়েছে। ঘুম থেকে তুলতেই প্রথমে নিজের চশমা খুঁজল সে। তাকে কাঁধে তুলে নিল উর্বশী, বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মার্সিডিজের ব্যাকসিটে শুইয়ে দিল।

ওদের চার্টার প্লেনের পাইলটকে একেবারে শেষ মুহূর্তে বলা হলো, হঠাৎ একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় টোকিওতে যাচ্ছে না ওরা, ল্যান্ড করবে ওসাকা বিমানবন্দরে।

আকাশে থাকতেই রানা দেখতে পেল, টারমাকের একপ্রান্তে একটা সুপারসনিক জেট দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্লেনের পাশে, সিঁড়ির সামনে, অস্থিরভাবে পায়চারি করছে খুদে একটা মূর্তি। নিশ্চয়ই নুমা চিফ জর্জ হ্যামিলটন, ভাবল ও।

নিরাপদেই ল্যান্ড করল ওরা। একটু পরেই চার্টার প্লেন নিয়ে ফিরে গেল পাইলট।

রানার ফোন পেয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছেছে ওর এজেন্সির টোকিও শাখার দুজন এজেন্ট। ইমুনুকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো, আপাতত তাকে নিজেদের একটা সেফহাউসে রাখবে ওরা।

রানাকে দেখামাত্র পায়চারি থামিয়ে দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে এলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'বলো, রানা, কী ব্যাপার?' উত্তেজনা আর উদ্বেগে টকটকে লাল হয়ে আছে তাঁর মুখ।

রানা তাঁর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জানতে চাইল, 'সার, প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা?'

'ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে কারণটা যদি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ না হয়, অন্তত তিনজনের চাকরি যাবে–তাঁদের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রীও আছেন। কাজেই সব কথা এখনই আমার জানা দরকার, রানা।'

'প্লেনে উঠি আসুন, সার, চলতে চলতে বলব সব,' বলল রানা। 'তাতে সময় বাঁচবে।'

ওদের মুখে বিপদটার বিস্তারিত বর্ণনা শুনে নুমা চিফের উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল।

'ওহ্ গড! সবগুলো সাগর ওই বিষাক্ত আগাছায় ভরাট হয়ে যাবে! বৃষ্টির পানি ডাঙাকেও দূষিত করে ফেলবে! মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে! রানা, এ তো পারমাণবিক থ্রেট-এর চেয়েও মারাত্মক!'

'আরও অনেক বেশি মারাত্মক, সার। একেকটা লতা একেকটা বিষ তৈরির কারখানা, প্রতি মুহূর্তে লক্ষ-কোটি নতুন কারখানা আর বিপুল পরিমাণে বিষ তৈরি হচ্ছে। এখন সবখানে ছড়াতে যেটুকু সময় লাগে। তারপর প্রাণী বলতে কোথাও আর কিছু থাকবে না।'

'তা হলে, রানা, মাই সান?' উদ্বেগে বিকৃত শোনাল নুমা

চিফের গলার আওয়াজ। 'কী হবে এখন?'

'এখন একটাই উপায়,' বলল রানা। 'ইনল্যান্ড সি আরিয়াকেনো-উমির কোনও একটা দ্বীপে লুকিয়ে আছেন ডক্টর ফাকুদা—ওঁকে খুঁজে বের করা। তিনি যদি অ্যান্টিডোট দিতে রাজি হন, তা হলেই শুধু শেষরক্ষা হতে পারে।'

'তাঁকে কি তোমরা খুঁজে বের করতে পারবে, রানা?'

এ প্রশ্নের উত্তর রানার জানা নেই, তবু বলল, 'আশা তো করি, সার।'

'কিন্তু মুখে বললেই তো হবে না, রানা, এ-সব অভিযোগ তোমাকে প্রমাণ করতে হবে। তা না হলে জাপান সরকার তোমাকে কোনও সাহায্য করতে রাজি হবে কেন!'

এবার রানার কণ্ঠস্বরে স্বভাবসুলভ দৃঢ়তা ফিরে এল। 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সার। আমার কাছে ওঁদের সন্তুষ্ট করার মত যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ আছে।'

ওদের আলাপও শেষ হলো, সুপারসনিক জেটও পৌঁছে গেল টোকিও এয়ারপোর্টে। ঘণ্টার কাঁটা ইতিমধ্যে রাত বারোটার ঘরে পৌঁছে গেছে।

সরকারী পুল-এর একটা মার্সিডিজ তুলে নিল ওদেরকে, একজন ডেপুটি সেক্রেটারি নিজের পরিচয় দিয়ে কী ব্যবস্থা করা হয়েছে সংক্ষেপে জানালেন।

রানা যেমনটি চেয়েছে, সশস্ত্র বাহিনীর তিন প্রধান এবং রেডক্রসের ডিরেক্টরকে নিয়ে নিজের সরকারী বাসভবনে ওদের জন্য অপেক্ষা করছেন প্রাইম মিনিস্টার।

'ধন্যবাদ,' বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। টিনটেড গ্লাস, ফলে মার্সিডিজের বাইরে থেকে ওদের কাউকে দেখতে পাবে না কেউ।

সরু চোখ আর চ্যাপ্টা নাক হলে কী হবে, সশস্ত্র বাহিনীর তিন

প্রধানের চোখে-মুখে ক্রোধ চেপে রাখা বাঘের গাম্ভীর্য ফুটে আছে। হ্যান্ডশেক করবার সময় যথেষ্ট সাবধান থাকলেন তাঁরা, তা সত্ত্বেও রানার মনে হলো, ওর হাতের হাড়গুলো একটুর জন্য ভাঙল না।

প্রাইম মিনিস্টার প্রথমে হ্যান্ডশেক করলেন জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে, তবে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে, কারণ ওর যোগ্যতা সম্পর্কে দু'এক কথায় তাঁকে ধারণা দিচ্ছেন নুমা চিফ।

মানুষটা ছোটখাট, মাথায় কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল, জাপানের ইতিহাসে এত কম বয়সে আর কেউ প্রধানমন্ত্রী হননি।

এরপর উর্বশীর সঙ্গে পরিচিত হলেন ভদ্রলোক। সবশেষে রানার সঙ্গে।

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, মিস্টার রানা,' রানার আহত হাতটা সামান্য একটু ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিলেন তিনি, এক পা পিছিয়ে বসে পড়লেন সোফায়। অ্যাডমিরাল ও উর্বশী বসতেই আবার ওর দিকে ফিরলেন তিনি, 'স্টার্ট, প্লিজ!'

রানাকে এমনকী বসতেও বললেন না।

তাতে কিছু মনে করেনি রানা। দাঁড়িয়েই শুরু করল ও।

ধীরে ধীরে, সংক্ষেপে, সব ওঁদেরকে জানাচ্ছে। সবশেষে ব্যাখ্যা করল কীভাবে এই বিপদ থেকে দুনিয়াটাকে বাঁচানো সম্ভব।

ওর কথা শেষ হওয়া মাত্র প্রাইম মিনিস্টার জানতে চাইলেন, অনেকটা বেসুরো কণ্ঠেই: 'আপনার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর, মিস্টার রানা। শুধু আমার নয়, ডক্টর ওকিনাওয়া আশামুশি মহামান্য সম্রাটেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শুধু জাপানে নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর সুখ্যাতি। তাঁর বিরুদ্ধে এত সব অসম্ভব কথা বলছেন, আপনার কাছে কোনও প্রমাণ আছে?'

রানার দিকে ফিরে দম বন্ধ করলেন জর্জ হ্যামিলটন।

'আছে,' শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল রানা, তারপর ওর জুতোর গোড়ালির ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে একটা খুদে টেপ রেকর্ডার বের

করে আনল। 'এটা বাজিয়ে শুনুন। এতে পাবেন ডক্টর আশামুশির স্বীকারোক্তি।'

'আর এটার ওপরও একবার চোখ বুলান,' বলে ডক্টর ফাকুদার নিজের হাতে লেখা চিরকুটটাও প্রাইম মিনিস্টারের দিকে বাড়িয়ে ধরল উর্বশী।

কাগজটাই প্রথমে পড়লেন প্রাইম মিনিস্টার। শেষ হতে তিন বাহিনীর প্রধানদের পড়তে দিলেন। ওঁদের পড়া হলে টেবিলে ফিরে এল কাগজটা।

ইতিমধ্যে খুদে টেপ রেকর্ডার চালাবার প্রস্তুতি শেষ করেছে রানা। পিন-পতন নীরবতার ভিতর আশামুশির বলা প্রতিটি কথা কান পেতে শুনলেন সবাই। মনে হলো, সামনে বসে কথা বলছেন সম্মানিত বিজ্ঞানী।

টেপ এক সময় থামল। তারপরও কামরার ভিতর ভৌতিক নীরবতা অটুট থাকল বেশ কিছুক্ষণ।

এই সুযোগে নিজের ক্ষোভটা প্রকাশ করল রানা। 'এ-সব কিছুই ঘটত না দু'বছর আগে যদি আপনারা আমার কথায় একটু গুরুত্ব দিতেন,' বলল ও। 'সিয়াটল ভার্সিটির সেই সেমিনারে জাপান সরকারের অনেক প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। নুমার প্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিলাম আমি। আমি যখন ডক্টর আশামুশির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললাম, তার পোষা গুণ্ডারা আমাকে কনফারেন্স হল থেকে গায়ের জোরে বের করে দিল, কেউ তখন টু-শব্দটিও করেননি...'

রানাকে বিহ্বল করে দিলেন প্রাইম মিনিস্টার। সোফা ছেড়ে উঠে এলেন তিনি, আপন বড় ভাইয়ের মত দু'হাত বাড়িয়ে নিজের বুকে টেনে নিলেন ওকে।

তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে রানা দেখল, তিন বাহিনী প্রধান ঘনঘন মাথা নত করে সম্মান জানাচ্ছেন ওকে—এখন আর ওঁদেরকে ক্ষুব্ধ বাঘের মত লাগছে না।

নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে রানাকে বসতে বলে ও কীভাবে কী করতে চায় জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী।

একটা ব্যাপার বুঝতে পেরে গলাটা শুকিয়ে গেল রানার। জাপানি কর্মকর্তারা ধরে নিয়েছেন এই বিপদ থেকে মাসুদ রানা পৃথিবীর সবাইকে উদ্ধার করতে পারবে।

কিন্তু তা সত্যি নয়! ও কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারে না! ডক্টর ফাকুদাকে আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে কি না তারই যেখানে ঠিক নেই, সেখানে...

তবু নিজের প্ল্যান জানাল রানা। জাপান সরকারের কাছ থেকে ঠিক কী সাহায্য চায় তা-ও জানাল স্পষ্ট ভাষায়। একবাক্যে রানার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন সবাই।

হঠাৎ জাপানিদের একটা বৈশিষ্ট্যের কথা মনে পড়ে গেল রানার, একেবারে যাকে বলে জাতিগত বৈশিষ্ট্য: কোণঠাসা হয়ে পড়লে, কিংবা যে-কোনও চরম অবস্থায়, আত্মহত্যার মাধ্যমে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করে জাপানিরা।

ডক্টর ফাকুদা আত্মহত্যা করেননি তো?

হঠাৎ প্রাইম মিনিস্টারের গলা শুনে সংবিৎ ফিরল ওর।

'আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, মিস্টার রানা,' বললেন তিনি। 'আজ রাত শেষ হবার আগেই অ্যাকশনে যাব আমরা...'

প্রাইম মিনিস্টারের বাড়ির সবুজ লন থেকে সামরিক বাহিনীর একটা কপ্টার মাত্র পাঁচ মিনিটে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল ওদেরকে। নুমা চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন টোকিওতেই থাকবেন ভাল-মন্দ যে-কোনও খবরের অপেক্ষায়, তাই উর্বশী ও রানা শুধু চড়ল সুপারসনিক জেটে।

বিদায় জানাবার মুহূর্তে খানিকটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন অ্যাডমিরাল, কারণ তাঁর জানা আছে রানার মিশনটা কী রকম বিপদসঙ্কুল আর অনিশ্চয়তায় ঘেরা। হ্যান্ডশেক করতে গিয়ে বুকে

টেনে নিলেন ওকে। বললেন, 'তোমাকে আমার কিছু বলার নেই, মাই বয়! আমি তোমার এই কাজটার নাম দিয়েছি, মিশন ইমপসিবল। আই উইশ ইউ গুড লাক। গড ব্লেস ইউ, মাই সান!'

তারপর উর্বশীর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবার সময় নিচু গলায় বললেন, 'কিপ অ্যান আই অন হিম, মাই ডিয়ার লেডি!'

যদিও উর্বশীর কাছে পরিষ্কার হলো না ঠিক কী বোঝাতে চাইলেন তিনি।

শব্দের চেয়ে দ্রুতবেগে ছুটল সুপারসনিক জেট। অবিশ্বাস্য কম সময়ের মধ্যে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আরাওয়ে পৌঁছাল রাত আড়াইটার সময়। ওখান থেকে রেন্ট-আ-কার কোম্পানির মার্সিডিজ চালিয়ে আরিয়াকেনো-উমি বে-তে চলে এল উর্বশী আর রানা।

নির্দিষ্ট জেটিতে রাইজিং সান-এর লঞ্চ অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। সার্চ পার্টির সদস্যরা প্রায় সবাই তরুণ। চেহারাই বলে দেয় গুণ্ডা-পাণ্ডা। তবে ওদেরকে সমীহের সঙ্গেই স্বাগত জানাল তারা। রানা ধারণা করল, বিপদের গুরুত্বটা ডক্টর আশামুশি তাদেরকে ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ওদের লিডার তোমিযাওয়া দেমোকি রানাকে জানাল, মাত্র ঘণ্টাখানেক হলো তাদের প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। রানা জানতে চাইল, এত সময় লাগল কেন?

'ছয় ড্রাম অ্যান্টিডোট তোলা হয়েছে লঞ্চে,' বলল দেমোকি। 'তার মধ্যে তিন ড্রাম আজ রাতেই তৈরি করা হয়েছে। সাগরের যা অবস্থা, ডক্টর আশামুশিকে বলতে বাধ্য হই যে মাত্র তিন ড্রাম অ্যান্টিডোট নিয়ে লঞ্চ ছাড়তে রাজি নই আমি।'

'এখন তা হলে আমরা রওনা হতে পারি তো?' জিজ্ঞেস করল উর্বশী।

'হ্যাঁ, অবশ্যই, ম্যাডাম!'

'গুড। দেন লেট'স গো!'

দু'মিনিটের মধ্যে ছাড়ল লঞ্চ। শুরু হলো মিশন ইমপসিবল।

আঠারো

রাত ভোর হয়ে এল, একের পর এক দ্বীপ খুঁজে বের করছে ওরা, কাছাকাছি পৌঁছে মুখের সামনে লাউড হেইলার তুলে নিজের পরিচয় দিচ্ছে রানা, তারপর ডক্টর ফাকুদাকে সম্বোধন করে বলছে: ফর গড'স সেক, অ্যাক্নলেজ, ডক্টর ফাকুদা! আই বেগ অভ ইউ!'

কিন্তু যতই আবেদন-নিবেদন করুক রানা, এখন পর্যন্ত কেউ সাড়া দেয়নি। হতে পারে দ্বীপগুলোয় ডক্টর ফাকুদা নেই, কাজেই সাড়া দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

কিংবা হয়তো কোনও একটা দ্বীপে আছেন উনি, রানার অনুরোধ পরিষ্কার শুনতে পেয়েছেন, কিন্তু ইচ্ছে করেই সাড়া দেননি। তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, ডক্টর ফাকুদার কাছ থেকে ক্রমশ আরও দূরে সরে যাচ্ছে ওদের লঞ্চ, সেই সঙ্গে তাঁর আবিষ্কার করা অ্যান্টিডোট পাওয়ার আশাটাও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠছে।

তবে ধরে নিতে হবে ডক্টর ফাকুদা রানার কথা এখনও শুনতে পাননি, তিনি আছেন সামনের কোনও দ্বীপে, যে-দ্বীপের কাছে এখনও পৌঁছায়নি ওদের লঞ্চ। এটা শুধু একটা আশা। আর এখন শুধু এই আশাটুকু লালন করেই এগিয়ে যেতে হবে ওদেরকে।

তা না হলে থেমে যাবে জীবনের স্পন্দন। বিলুপ্ত হবে প্রাণ।

এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপের দিকে এগোতে গলদঘর্ম হয়ে

যাচ্ছে সার্চ পার্টির কর্মীরা। ডক্টর আশামুশির উদ্ভাবিত অ্যান্টিডোট পাউডারে ক্ষারের মাত্রা খুব বেশি, তাই হাতে চামড়ার দস্তানা পরতে হয়েছে। লঞ্চের নাকের কাছে বসে মুঠো মুঠো পাউডার ছড়াতে হচ্ছে সারাক্ষণ।

মিহি পাউডারের স্পর্শে হঠাৎ নেতিয়ে পড়ে দশ-পনেরো সেকেন্ড নিস্তেজ থাকছে সর্পলতা, তারপর আবার ধীরে ধীরে মাথা তুলতে শুরু করছে। মাথা তোলার আগে যে সময়টা পাওয়া যাচ্ছে সেটুকু কাজে লাগিয়ে লঞ্চ চালাচ্ছে ক্রুরা।

ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ত্রিশটা দ্বীপের চারপাশে ঘুরে লাউড হেইলারে ডাকল রানা ডক্টর ফাকুদাকে। যত সময় পার হচ্ছে ততই এই মিশনের অবাস্তব দিকটা পরিষ্কার হচ্ছে রানার কাছে। ইনল্যান্ড সি আরিয়াকেনো-উমিতে ছোট ছোট অসংখ্য দ্বীপ আছে। তার সঙ্গে ধরা উচিত জাপান সাগরের কয়েক হাজার দ্বীপকেও, কারণ কেউ তো জানে না ঠিক কোথায় আছেন ডক্টর ফাকুদা।

এত দ্বীপে খোঁজ করা কি সম্ভব? সর্পলতা কি অত সময় দেবে ওদেরকে?

সকাল ছ'টার দিকে হঠাৎ করে পরিস্থিতি বদলে গেল। ডেকের কিনারায় রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। পাশেই উর্বশী।

পাশাপাশি এক জোড়া দ্বীপ কাভার করবার পর ইউ টার্ন নিল লঞ্চ, অথচ ওই দুই দ্বীপের মাঝখানে, যদিও খানিকটা দূরে, আরও একটা ছোট দ্বীপ দেখতে পাচ্ছে রানা।

সার্চ পার্টির লিডার তোমিযাওয়া দেমোকির নাম ধরে ডাকল ও। 'ওহে, দেমোকি, কোথায় তুমি! সারেং লঞ্চ ঘোরাল কী কারণে? ওই ছোট দ্বীপটার কাছেও যেতে বলো তাকে।'

শুধু যে দ্বীপটা বাদ পড়ে যাওয়ায় অস্থিরতা অনুভব করছে রানা, তা নয়; একটু আড়ালে থাকা ত্রিভুজ আকৃতির ছোট্ট দ্বীপটা

কী কারণে কে জানে ভীষণ টানছেও ওকে। মনে হচ্ছে হয়তো ওখানেই আছেন ডক্টর ফাকুদা!

কানে সেল ফোন নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল দেমোকি। কী কারণে যেন সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে কুৎসিত হয়ে উঠেছে তার চেহারা। তার পিছু নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল আরও পাঁচজন। রানা টের পেল কীভাবে যেন বদলে গেছে অবস্থা।

'এই, কাজ-কাম ফালা তরা! এদিকে আয় সব!' বেসুরো গলায় হাঁক ছাড়ল পাঁচজনের একজন, প্রত্যেকের হাতে সাব মেশিনগান, উর্বশী ও রানার দিকে তাক করা।

রানা ও উর্বশীর কাছে, ব্যাগের ভিতর, পিস্তল আছে। সেগুলো এখন বের করা সম্ভব নয়। আর বের করা গেলেও, এতগুলো সাব মেশিনগানের বিরুদ্ধে বিশেষ কাজে লাগত না।

যে যার কাজ ফেলে ডেকে জড়ো হলো গুণ্ডারা।

দেমোকি এখনও সেল ফোনে কথা বলছে। উর্বশী আর রানার পাঁচ ফুটের মধ্যে এসে থামল সে। তার কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রানা।

'আর কার কী হলো আমি জানতে চাই না, ডক্টর মুশি কোথায়?...জানো না কেন?...কী বাজে বকছ, রিসার্চ সেন্টার ঘিরে ফেলেছে!...হ্যাঁ, সেটাই আমার জানা দরকার... ঠিক জানো? ডক্টর মুশি অ্যারেস্ট?... কী বলো, পালানো বললেই কি...আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, বুঝলাম তো, আপাতত গা ঢাকা দিতে হবে...'

সেল ফোন বন্ধ করে পকেটে রেখে দিল দেমোকি। 'গুডবাই, মাসুদ রানা, গুডবাই উর্বশী দাশা! তোমাদের মনের সাধ পূরণ হয়েছে, ডক্টর মুশি অ্যারেস্ট। এবার আমাদের মনের সাধ আমরা পূরণ করব। এই, ধর ওদের! দে ফেলে পানিতে! দেখি আগাছার বিষ থেকে কোন্ শালা বাঁচায় ওদেরকে!'

প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে স্বাভাবিক রাখছে রানা। 'ডক্টর আশামুশি অ্যারেস্ট হলেও তোমাদের কোনও ভয় নেই,' আশ্বাস

দিয়ে বলল ও। 'আমি বললে পুলিশ তোমাদেরকে অ্যারেস্ট করবে না। তোমাদের পক্ষেই বলব আমি...'

জবাবে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল সাত-আটজন গুণ্ডা। ওদের কোনও কথাই শুনছে না তারা, দুজনকে একসঙ্গে চ্যাংদোলা করে তুলল, লঞ্চের ডেক থেকে ছুঁড়ে দিল সাগরে।

ঝপাৎ করে আগাছা ভর্তি পানিতে পড়ল দুজন। রানার মাথায় প্রথম যে চিন্তাটা খেলে গেল—একটু পরেই বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে, চেষ্টা করি তার আগেই যদি পৌঁছানো যায় দ্বীপটায়।

'এসো!' উর্বশীর উদ্দেশে গলা চড়াল রানা, জোর করে হাসছে। 'সাঁতরাই! বাঁচতে হলে ওই দ্বীপটায় পৌঁছাতে হবে!'

আগাছার বাধা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সাঁতার শুরু করল রানা, দেখাদেখি ওর সঙ্গিনীও। দুজনেই দেখল ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে লঞ্চটা।

হি-হি-হি, হেসে উঠে উর্বশী বলল, 'ইস্, যেন ছেলের হাতের মোয়া, চাইলেই বাঁচা যাবে!'

সাবাস, ভাবল রানা, এরকম বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করে কটা মেয়ে রসিকতা করতে পারে!

জোড়া দ্বীপের মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছে ওরা। ওই দ্বীপ দুটো রানার মন খারাপ করে দিল। একদম নির্জন ওগুলো, তীরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এগুলোয় যদি লোকজন না থাকে, অত ছোট দ্বীপটায় তো আরও কেউ থাকবে না।

পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক, সব সময় আশাবাদী থাকতে অভ্যস্ত রানা। যেমন: এই মুহূর্তে ভাবছে, ওয়াটার প্রুফ ব্যাগে সেল ফোন আছে, নুমা চিফকে ফোন করে একটা কপ্টার আনাতে পারবে, তাতে চড়ে পৌঁছাতে পারবে কাছাকাছি কোনও হসপিটালে। ব্যাগে পিস্তলও আছে...

হঠাৎ আতঙ্ক জাগল বুকে! শ্বাসকষ্ট হচ্ছে! শরীরে জ্বালা-পোড়া ভাব? তা হলে কি শুরু হয়ে গেল বিষক্রিয়া?

আরে, নাহ্! জোর করে হেসে উঠল রানা। 'আর বেশি দূরে নয়!' বলল ও। 'আরও জোরে, উর্বশী!'

'ও, ইয়া!' উর্বশীর ভাব দেখে মনে হলো ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে আছে ও। 'লাউড হেইলারটা দেখছি ছাড়োনি তুমি!'

যেন উর্বশী বলাতেই ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল রানা। গলায় ঝুলছে এখনও। ভালই হলো, দ্বীপটায় পৌঁছতে পারলে ডক্টর ফাকুদাকে ডাকবে।

এই সময় পরিষ্কার অনুভব করল রানা, ওর সারা শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ভয় নয়, অসুস্থতা ওর সমস্ত শক্তি শুষে নিচ্ছে। কেউ যেন ফুসফুস দুটোকে চেপে ধরেছে। বাতাস ছাড়া বা নেওয়া, দুটো কাজই ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে।

'ডক্টর ফাকুদা! ডক্টর ফাকুদা! আমি মাসুদ রানা!'

ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেল রানার। নিজের গলা নিজেই চিনতে পারছে না, ডক্টর ফাকুদা চিনবেন কীভাবে?

দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ছে উর্বশীও। রানার বেসুরো, কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, রানার মত সে-ও একই কথা ভাবছে।

'ডক্টর ফাকুদা!' তারপরও, যেন জেদ করেই, ডাকছে রানা, 'ডক্টর ফাকুদা!'

'এই ছেলেমানুষির কোনও মানে হয় না!' চিঁচিঁ করে বলল উর্বশী, রানার পাশে কোনও রকমে সাঁতরাচ্ছে। 'আমরা কি জানি এই দ্বীপে ভদ্রলোক আছেন?'

মুখের সামনে লাউড হেইলার তুলতে গেল রানা, পারল না। হাত থেকে খসে পড়ল ওটা, তলিয়ে গেল পানির নীচে।

ছোট দ্বীপ। নির্জন সৈকত। কেউ কোথাও নেই।

উর্বশী দেখল পিছিয়ে পড়ছে রানা। হিহি করে হাসল সে, কথা বলছে নিজের সঙ্গে। 'আমার প্রলাপ বকতে ইচ্ছে করছে। এটাও বিষক্রিয়ার একটা লক্ষণ। নুমা চিফ আমাকে বলেছেন ওর

ওপর আমি যেন একটা চোখ রাখি। রাখছি তো! রাখছি বলেই তো দেখতে পাচ্ছি পিছিয়ে পড়ছে রানা।'

একটু পিছিয়ে এসে রানাকে ধরল উর্বশী।

মৃদু ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। 'আমার পায়ের তলায় বালি! আমাকে হাঁটতে দাও! দ্বীপটা আমি তন্নতন্ন করে সার্চ করব... ডক্টর ফাকুদা! ডক্টর ফাকুদা!'

লাউড হেইলার ছাড়াই রানার গলার আওয়াজ অনেক দূর থেকে শোনা যাবে, এত জোরালো। 'ডক্টর ফাকুদা!' হামাগুড়ি দিয়ে সৈকতে উঠে পড়ল ও, তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়াল। ওর সারা শরীরে সবুজ সর্পলতা সেঁটে রয়েছে। দু'একটা খসে পড়লেও, বাকিগুলো অলসভঙ্গিতে ঢেকে ফেলছে ওকে।

এই সময় হঠাৎ এক সারি ঝোপের মাথার উপর একজোড়া চোখ দেখতে পেল রানা। পুরু লেন্স লাগানো মোটা ফ্রেমের চশমা রয়েছে সেই চোখে। শিশুর সারল্যে ভরা বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া চোখ। দেখেই চিনতে পারল রানা, ডক্টর ফাকুদার চোখ!

'হ্যালো, ডক্টর ফাকুদা। আমাকে চিনতে পারছেন না?' বলল রানা। 'আমি মাসুদ রানা,' বলে চলেছে ও, যেন কতকালের চেনা একজন মানুষ তিনি। 'আরে ভাই, দুনিয়ার ব্যবস্থা পরে করবেন, আগে আমাদেরকে তো বাঁচান! দেখছেন না কী অবস্থায় পৌঁছেছি...' হঠাৎ থেমে গেল রানা, বুঝতে পারল প্রলাপ বকছে ও, একই সঙ্গে দৃষ্টিভ্রমেরও শিকার।

একজোড়া নয়, নির্জন সৈকতের ঝোপগুলোর উপর অসংখ্য চোখ দেখতে পাচ্ছে ও। সেই চোখ জোড়ায় জোড়ায় বালি আর আকাশেও দেখা যাচ্ছে। হাজার হাজার, লাখ লাখ, অসংখ্য!

'ডক্টর ফাকুদা!'

কেউ সাড়া দিল না। দ্বীপের কোথাও কিছু নড়ল না।

রানা ভাবল: ও, বুঝেছি, আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা হচ্ছে! ঠিক আছে আমিও অভিনয় করব। মরে তো যাচ্ছিই, প্রকৃতির

সঙ্গে একটু অভিনয় করি। ভান করি আমি কিছু দেখতে পাইনি। ভান করি মরে যাচ্ছি। অবশ্য মরে আমি এমনিতেও যাচ্ছি, তবু ভান করলে যদি ফাঁকি দেয়া যায় নিশ্চিত মৃত্যুকে...

সৈকতের বালির উপর সটান পড়ে গেল রানা। ওর সারা শরীর হু-হু করে জ্বালা করছে, অসহ্য শ্বাসকষ্টে ভুগছে, দেখতে পাচ্ছে সারা শরীর বেগুনি হয়ে গেছে, তবু বালিতে মুখ থুবড়ে পড়বার পর ভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ডের মত দুর্বল গলা থেকে বেরিয়ে এল: 'ফর গড'স সেক, ডক্টর ফাকুদা, হেলপ আস! উই আর ডাইং!'

একটু পর ওর পাশে এসে স্থির হলো উর্বশী, হাপরের মত হাঁপাচ্ছে, বেগুনি হয়ে গেছে গোটা শরীর। মাথাটা বালিতে নামাল সে, তারপর আর তুলতে পারল না।

রানা যেন বালির সঙ্গে কথা বলছে। ওর ঠোঁট দুটো নড়ছে, আওয়াজও বেরুচ্ছে, অনেকটা দম দেওয়া পুতুলের মত একটাই শব্দ রিপিট করছে বারবার: 'ফাকুদা...ফাকুদা...ফাকুদা...'

এই সময় একটা চিল কালো ছায়া ফেলল ওদের গায়ে।

আরও কয়েক মিনিট পর সামান্য একটু ফাঁক হলো ঘন ঝোপ। সারল্যে ভরা বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া চোখ উঁকি দিল। পুরু লেন্স লাগানো মোটা ফ্রেমের চশমা রয়েছে সেই চোখে।

সৈকত পার হয়ে ঝোপগুলোর কাছে অস্পষ্ট ভাবে পৌঁছাচ্ছে রানার নিস্তেজ কণ্ঠস্বর: 'ডক্টর ফাকুদা! ডক্টর ফাকুদা...'

ঝোপ ভেঙে বেরিয়ে এলেন তিনি। একহারা গড়ন, তবে সারা শরীরে পাকানো রশির মত পেশি আছে। নাকটা একদম খাড়া, জাপানিদের মধ্যে সাধারণত যেটা দেখতে পাওয়া যায় না। সর্বকালের যদি না-ও হন, বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। ডক্টর নিশিকাওয়া ফাকুদা।

বিড়বিড় করছেন ডক্টর ফাকুদা। 'আরে! এ তো সেই মাসুদ

রানা! এত বড় দুনিয়ায় কেউ কোনদিন আমার হয়ে একটা কথা বলেনি। একা শুধু এই মানুষটাই সবার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়ে আমার পক্ষে বলেছিলেন!'

বালি থেকে মাথাটা একটু তুলল রানা, নিস্তেজ গলায় বলল, 'আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, ডক্টর ফাকুদা।' হাসতে চেষ্টা করায় আরও বিকৃত হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'একটা নয়, আমার সামনে অনেক ডক্টর ফাকুদা। তবে জানি, এদের মধ্যেই রক্ত-মাংসের আসল মানুষটাও লুকিয়ে আছেন!'

আরও কাছে চলে এসে রানার উপর ঝুঁকলেন ডক্টর ফাকুদা।

'আপনারা দেখছি সিরিয়াসলি ইনফেক্টেড!'

এবার কর্কশ শব্দে হেসে উঠল রানা। প্রচণ্ড উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল, পড়িমরি করে চেষ্টা করছে দাঁড়াবার। 'আমাদের কথা বাদ দিন ডক্টর, দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে!'

ডক্টর ফাকুদার ঠোঁটের কোণে শ্লেষ। 'তাই নাকি? তা হোক না। এটার ধ্বংস হয়ে যাওয়াই তো উচিত।'

রানার চোখের আলো ম্লান হয়ে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি আবার তিনি বললেন, 'আমার যুদ্ধ দুনিয়ার বিরুদ্ধে, আপনার বিরুদ্ধে নয়, মিস্টার রানা।'

'ডক্টর ফাকুদা, এটা মান-অভিমানের সময় নয়! ইনল্যান্ড সি ভরাট হয়ে গেছে! খোলা সাগরে ছড়াতে শুরু করছে সর্পলতা! খুব তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি এমন একটা পর্যায়ে চলে যাবে, চাইলেও আপনি তখন আর কিছু করতে পারবেন না...'

'কে বলল আমি কিছু করতে চাই?' তিক্ত হাসি ফুটল ডক্টর ফাকুদার ঠোঁটে। 'আমার চিরকুটটা ওরা দেখায়নি আপনাকে? ওতেই তো আমার সব কথা জানিয়ে দিয়েছি। আমার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আমাকে অকথ্য মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। তাই আমি এখন প্রতিশোধ নেব।'

'প্লিজ, ডক্টর ফাকুদা, মাথাটা ঠাণ্ডা করে আমার কথা একটু

শুনুন,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। 'ডক্টর আশামুশিকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। প্রাইম মিনিস্টার আর সশস্ত্রবাহিনীর তিন প্রধান এখন জানেন ওই লোকটা ভুয়া, আপনার সমস্ত আবিষ্কার চুরি করে নিয়ে নিজের বলে চালাচ্ছিল...

মন দিয়েই শুনছিলেন ডক্টর ফাকুদা, হঠাৎ প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলে উঠলেন, 'আমার মা-বাবাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে ওরা? আমার প্রাণাধিক স্ত্রীকে? কী লাভ আর বেঁচে থেকে? ওরা তো আমার একমাত্র ছেলেটাকেও কেড়ে নিয়েছে। আমি পালিয়ে আসায় নিশ্চয়ই এতদিনে মেরে ফেলেছে...'

'না, ইমুনু আমার কাছে,' বলল রানা। 'বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখুন তার ছবি,' বলে বেল্টের সঙ্গে আটকানো চামড়ার ছোট্ট ব্যাগটা খুলে ভিতর থেকে সেল ফোনটা বের করল রানা। কয়েকটা বোতাম টিপে সেটটা ডক্টর আশামুশির দিকে বাড়িয়ে ধরল।

রানার গায়ের রঙ কোথাও কোথাও আগুনে সেদ্ধ করা বেগুনের মত হয়ে যাচ্ছে।

কালার ডিসপ্লের উপর সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে তাকালেন ডক্টর ফাকুদা। নিজের ছেলেকে দেখতে পেয়ে স্থির হয়ে গেলেন তিনি।

'আরও ছবি আছে, দেখুন না!' উৎসাহ দিল রানা, অথচ তীব্র জ্বালাটা প্রতি মুহূর্তে আরও বাড়ছে ওর।

একের পর এক বোতাম টিপে ইমুনুর ছবিগুলো দেখছেন বিজ্ঞানী। কখনও রানা, কখনও বা উর্বশী রয়েছে ওর সঙ্গে।

'আ-পনার জন্যে আরও খ-খবর আছে,' বলল রানা, কিছু কিছু কথা মুখের ভিতর জড়িয়ে যাচ্ছে। 'রাইজিং সান রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজের চি-চিফ হিসেবে নি-নিয়োগ দেয়া হয়েছে আপনাকে। শুধু তাই নয়, সরকার সিদ্ধান্ত নি-নিয়েছে আপনার জন্যে নতুন একটা পদ সৃষ্টি করা হবে—রাষ্ট্রের জা-জাতীয় বিজ্ঞানী...'

'আমার ছেলে এখন কোথায় বললেন?'

রানা বুঝতে পারছে এই মুহূর্তে ওকে বা উর্বশীকে নিয়ে মোটেই চিন্তিত নন ডক্টর ফাকুদা। 'একটা প্রাইভেট সিকিউরিটি এজেন্সির সেফহাউজে আছে ইমুনু। ওকে নিয়ে চিন্তা করবেন না, ভাল আছে ও। ডক্টর, ডু সামথিং! দেখতে পাচ্ছেন না, আমরা মারা যাচ্ছি, দুনিয়ার সবাই মারা যাচ্ছে, আপনার ছেলেও বাঁচবে না...

টলে উঠল রানা, তারপর সটান আছাড় খেয়ে পড়ে গেল সৈকতের বালিতে।

রানার স্থির শরীরের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন ডক্টর ফাকুদা। তারপর ধীরে ধীরে ওর সেল ফোনটা নিজের পকেটে রেখে দিলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'নো, নেভার! মাসুদ রানা মরতে পারে না! কিছুতেই না!'

ঝুঁকলেন ডক্টর ফাকুদা। রানার পালস দেখলেন। কোনরকমে চলছে, ধরা যায় কি যায় না। দু'হাতে ওর হাত ধরে সামান্য উঁচু করলেন ওকে, তারপর ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চললেন ঝোপগুলোর দিকে।

ছোট্ট একটা বাড়ি, ঘরগুলো বাঁশ আর গাছের পাতা দিয়ে তৈরি। বাড়ির চারপাশে বৃত্তাকার গাছের সারিটাই পাঁচিলের কাজ করছে।

উঠানে পাকা একটা চৌবাচ্চা। তাতে কানায় কানায় ভরা পানি। রানাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে চৌবাচ্চার সেই পানিতে ছেড়ে দিলেন ডক্টর ফাকুদা। তারপর কিমোনোর ভিতর থেকে ছোট্ট একটা শিশি বের করে দুই কি তিন ফোঁটা তরল পদার্থ ঢাললেন চৌবাচ্চার পানিতে।

রানার নাকটা পানির উপর আছে, এটুকু নিশ্চিত হয়েই ঘুরে আবার সৈকতে ফিরে এলেন ডক্টর ফাকুদা। ঝুঁকে উর্বশীরও পালস্ দেখলেন। পাঁজাকোলা করে তুলে এনে ওকেও ছেড়ে

দিলেন চৌবাচ্চার পানিতে। দেখলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে চোখ মিট মিট করছে রানা।

'হাই!' বললেন ডক্টর ফাকুদা। 'এখন কেমন লাগছে, মিস্টার রানা?'

নিজের হাত দুটো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে রানা। বেগনি রঙ এরইমধ্যে দূর হয়ে গেছে। গায়ের ব্যথাও এখন না থাকার মত। মাথাটা ঠিকমত কাজ করছে।

'আপনার অ্যান্টিডোট দেখছি জাদুকেও হার মানায়!' বলল রানা। 'কিন্তু সর্পলতার ছড়িয়ে পড়াটা ঠেকাবেন কীভাবে? আর দূষিত সাগরের পানির কী ব্যবস্থা হবে?'

ডক্টর ফাকুদা হাসলেন। 'এ-সব নিয়ে কাউকে চিন্তা করতে হবে না। একই অ্যান্টিডোট ওই কাজগুলোও করবে–সর্পলতাকে মেরে ফেলবে, সেই সঙ্গে সাগরের সবটুকু পানিও নির্বিষ করবে। শুধু এক মাইল পর পর এক আউন্স করে ছড়াতে হবে। এক ঝাঁক কপ্টার লাগবে, আর লাগবে কিছু কেমিকেল, আর...'

লাফ দিয়ে চৌবাচ্চা থেকে উঠে এল রানা। 'আগে বলবেন তো! দিন, ডক্টর ফাকুদা, সেল ফোনটা আমাকে একবার দিন...'

'এই দাঁড়াও!' পিছন থেকে গলা চড়িয়ে বলল উর্বশী। 'আমাকে একটু সাহায্য করো...'

ঘাড় ফেরাতে রানা দেখল চৌবাচ্চা থেকে উঠে আসবার চেষ্টা করছে উর্বশী।

রানার কথায় একটু লজ্জাই পেলেন আপনভোলা ডক্টর ফাকুদা। 'না, মানে, ইমুনুর ছবি আছে দেখে ওটা আমি পকেটে রেখে দিয়েছি। না-জানি কী মনে করলেন আপনি...' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সেটটা বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি।

'দূর ছাই, আমি আবার কী মনে করব!' বলে বোতাম টিপতে ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। 'অল্পক্ষণেই পৌঁছে যাবে আপনার হেলিকপ্টার,' কথা শেষ

করে বলল রানা। 'এবার চট-জলদি কয়েক গ্যালন ওষুধ বানিয়ে ফেলুন দেখি?'

'মিস্টার রানা,' ম্লান গলায় বললেন ডক্টর ফাকুদা, 'শুধু আপনার কাছে স্বীকার করছি, এরকম একটা বিশ্রী কাজ করা উচিত হয়নি আমার। দুনিয়ার কাছে নয়, আমি জাস্ট আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। প্লিজ ফরগিভ মি!'

দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরল ওঁকে মাসুদ রানা।

***

মাসুদ রানা

সর্পলতা

কাজী আনোয়ার হোসেন

হঠাৎ সাগরে আশ্চর্য এক ধরনের লতা দেখা দিল। দ্রুত বাড়ছে। কেউ জানে না জিনিসটা কী বা কোত্থেকে এল। কেনই বা ডুবুরিদের টার্গেট করা হচ্ছে। চিনকে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে আমেরিকার, তেমনি আমেরিকাকে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ চিনেরও আছে। দুই পরাশক্তির চাপে পড়তে হয়েছে মাসুদ রানাকে। নিজের চোখে না দেখলে বুঝতে পারবেন না কীভাবে পরিস্থিতিটা সামলে নিল ও। নীরব সাধনায় মগ্ন, সহজ-সরল, অথচ বিরল প্রতিভার অধিকারী একজন জাপানি বিজ্ঞানী নিশিকাওয়া ফাকুদার গল্প এটা। অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস, কেউ এক পয়সা দাম দেয় না ওঁকে। সব হারানোর বেদনা যখন খেপিয়ে তুলল বিজ্ঞানীকে পৃথিবী আর আমাদের সাধের সভ্যতা পড়ে গেল মহা সংকটে। কিন্তু এখানে মাসুদ রানা সত্যি অসহায়। দুনিয়াকে বাঁচাবে কী, আগে নিজে বাঁচুক তো!

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০